Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

মুহাম্মদ (সা:) আমাদের নবি ও নেতা

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওলানা রাহাত আহমাদ

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

মো: জাহিদ হাসান

রোলঃ 228012004

২০ মে, ২০২৫ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

মুহাম্মদ (সা:) আমাদের নবি ও নেতা

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওলানা রাহাত আহমাদ
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

মো: জাহিদ হাসান
রোলঃ 228012004

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, " মুহাম্মদ (সা:) আমাদের নবি ও নেতা " বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে মো: জাহিদ হাসান, আইডিঃ 228012004 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওলানা রাহাত আহমাদ
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মুফতি: মুজিবুর রহমান
আকিদাহ ও ফিকহ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " মুহাম্মদ (সা:) আমাদের নবি ও নেতা " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাওলানা রাহাত আহমাদ উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

মো: জাহিদ হাসান

(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

২০ মে, ২০২৫ ইং

মো: জাহিদ হাসান

আইডিঃ 228012004

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

ভূমিকা

বিশ্বমানবতার শ্রেষ্ঠ নেতা, মানবজাতির মুক্তির দিশারি, আল্লাহর সর্বশেষ রাসূল মুহাম্মদ (সাঃ) শুধু মুসলিমদের নবী নন, তিনি সকল যুগ, সকল জাতি ও সব মানুষের জন্য আদর্শ। তাঁর জীবনের প্রতিটি দিক আমাদের জন্য অনুসরণীয়। তিনি একাধারে আদর্শ পরিবারপ্রধান, বিচারক, প্রশাসক, শিক্ষক, দার্শনিক ও সুশাসক ছিলেন।

لَّقَدْ كَانَ لَكُمْ فِى رَسُولِ ٱللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا۟ ٱللَّهَ وَٱلْيَوْمَ ٱلْـَٔاخِرَ وَذَكَرَ ٱللَّهَ كَثِيرًا

"তোমাদের জন্য আল্লাহর রসূলের মধ্যে উত্তম আদর্শ রয়েছে যারা আল্লাহ ও শেষ দিনের আশা রাখে আর আল্লাহকে অধিক স্মরণ করে।"[1]

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া রাঃ বলেন, 'পূর্ববর্তী নবিগণের ইতিহাস মুমিনদের জন্য শিক্ষণীয় দৃষ্টান্ত। তারা আগের যুগের নবিদের চেয়েও কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন হবে। তবুও তারা নিরাশ হবে না। কেননা তারা জানে তাদের চেয়ে উত্তম লোকেরাও পরীক্ষার সম্মুখীন হয়েছিলেন। আর দিন শেষে মুমিনদের পরিণাম সর্বদা কল্যানকরই হয়। তাই সন্দিগদ্ধ লোকেরা যেন নিশ্চিন্ত হয়, গুনাহগারেরা যেন তওবা করে নেয় আর মুমিনদের ইমান সুদৃঢ় হয়। এই অর্থে পূর্ববর্তী নবিগনের অনুসরন সঠিক।'[2]

মুহাম্মদ (সা.)-কে একজন নবী ও নেতা হিসেবে উপস্থাপন করার জন্য ১০টি গুরুত্বপূর্ণ দিক সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো।

---

[1] সুরা আল-আহযাব, ৩৩:২১

[2] মাজমুউল ফাতওয়া : ১৫/১৭৮

জন্ম, বংশ ও পারিবারিক পরিচয়

মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে আদম আলাইহিস সালাম পর্যন্ত ঊর্ধতন বংশপরম্পরা:

পিতা আবদুল্লাহ, তদীয় পিতা আবদুল মুত্তালিব (আবদুল মুত্তালিবের প্রকৃত নাম শায়বা), তদীয় পিতা হাশিম (হাশিমের প্রকৃত নাম আমর), তদীয় পিতা আবদে মানাফ (আবদে মানাফের প্রকৃত নাম আল মুগীরা), তদীয় পিতা কুসাই (কুসাই-এর প্রকৃত নাম যায়েদ), তদীয় পিতা কিলাব, তদীয় পিতা মুররাহ, তদীয় পিতা কা'ব, তদীয় পিতা লুয়াই, তদীয় পিতা গালেব, তদীয় পিতা ফিহির, তদীয় পিতা মালেক, তদীয় পিতা নাদার, তদীয় পিতা কিনানা, তদীয় পিতা খুযাইমা, তদীয় পিতা মুদরিকা (মুদরিকার প্রকৃত নাম আমের), তদীয় পিতা ইলিয়াস, তদীয় পিতা মুদার, তদীয় পিতা নিযার, তদীয় পিতা মা'আদ, তদীয় পিতা 'আদনান, তদীয় পিতা উদ্, তদীয় পিতা মুকাওয়াম, তদীয় পিতা নাহুর, তদীয় পিতা তাইরাহ্, তদীয় পিতা ইয়া'রুব, তদীয় পিতা ইয়াব, তদীয় পিতা নাবেত, তদীয় পিতা ইসমাঈল (আলাইহিস সালাম), তদীয় পিতা ইবরাহীম (আলাইহিস সালাম), তদীয় পিতা তারেহ (তারেহের অপর নাম আযর), তদীয় পিতা নাহুর, তদীয় পিতা সারুগ, তদীয় পিতা রাউ, তদীয় পিতা ফালেখ, তদীয় পিতা উবায়ের, তদীয় পিতা শালেখ, তদীয় পিতা আরফাখশাদ, তদীয় পিতা সাম, তদীয় পিতা নূহ (আলাইহিস সালাম), তদীয় পিতা লামক, তদীয় পিতা মুত্তাওশালাখ, তদীয় পিতা আখ্খ (ঐতিহাসিকদের ধারণা, তিনি হযরত ইদ্রিস আলাইহিস্ সালাম), তদীয় পিতা ইয়ারদ, তদীয় পিতা মাহলীল, তদীয় পিতা কাইনান, তদীয় পিতা ইয়ানিশ, তদীয় পিতা শীস, তদীয় পিতা আদম আলাইহিস্ সালাম।[3]

পিতা আবদুল্লাহ ও মাতা আমেনা

কুরায়শ সর্দার আবদুল মুত্তালিবের ছিল দশ পুত্র। এঁদের সকলেই ছিলেন বিশিষ্ট ও খ্যাতিমান। তাঁর সকল পুত্রের মধ্যে আবদুল্লাহ খুবই প্রশংসনীয় গুণাবলী ও কেন্দ্রীয় মর্যাদার অধিকারী ছিলেন।[4] তাঁর পিতা তাঁর বিয়ে দিয়েছিলেন বন্ যুহরার সর্দার ওয়াহ্-এর কন্যা আমেনার সঙ্গে যাঁকে সে সময় উচ্চ বংশ, সম্মান ও প্রভাব-প্রতিপত্তির দিক দিয়ে কুরায়শদের ভেতর সবচেয়ে সম্মানিতা মহিলা মনে করা হত।[5] রাসূলুল্লাহ

---

3 সীরাতে ইবনে হিশাম

4 সীরাতে ইবনে হিশাম

5 সীরাতে ইবনে হিশাম

(সাঃ) মাতৃগর্ভে থাকাকালেই পিতা আবদুল্লাহ ইনতিকাল করেন। হযরত আমেনা তাঁর জন্মের পূর্বেই এমন বহু নিদর্শন দেখতে পান যদ্দ্বারা বোঝা যেত যে, তাঁর সন্তানের ভবিষ্যত অত্যুজ্জ্বল ও মর্যাদাকর হবে।[6]

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) জন্ম:

সাইয়েদুল মুরসালীন নবীয়ে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরবের পবিত্র মক্কা নগরীতে বনু হাশিম গোত্রে হস্তবাহিনীর ঘটনার প্রথম বছর রবীউল আউয়াল মাসের নয় তারিখ সোমবার ভোরে জন্ম গ্রহণ করেন।[7]

এটা ছিল পারস্য সম্রাট কিসরা নওশেরওয়ার সিংহাসনে অভিষেকের চল্লিশতম বছর। ঈসায়ী তারিখ ছিল ৫৭১ খ্রিস্টাব্দের বিশ কিংবা বাইশে এপ্রিল। এটা বিশিষ্ট আলেমে দীন ও মুহাক্কিক মুহাম্মাদ সুলাইমান মানসূরপুরী র. এর গবেষণালব্ধফসল।[8]

ইবনে সাদ বর্ণনা করেন, রাসুলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সম্মানিত মাতা বলেন, আমি যখন তাকে প্রসব করি তখন আমার পেটের ভেতর থেকে এমন একটি আলোর ছটার বিচ্ছুরণ হয় যার দ্বারা সিরিয়ার বড় বড় প্রাসাদগুলো আলোকিত হয়ে উঠেছিল। আহমদ ও দারেমী থেকেও এর কাছাকাছি বর্ণনা পাওয়া যায়।[9] বর্ণিত আছে, রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর শুভ জন্মের সময় আরও অনেক আশ্চর্য ও বিস্ময়কর ঘটনা ঘটেছিল যেগুলোকে তাঁর নবুওত ও রিসালতের চিরন্তন সাক্ষী বলা যেতে পারে। পারস্য সম্রাট কিসরার প্রাসাদের চৌদ্দটি গম্বুজ ভেঙে পড়ে ভূমিসাৎ হয়ে গিয়েছিল। মাজুসীরা হাজার হাজার বছর ধরে যে আগুনের পূজা করত তা নিভে গিয়েছিল। সাওয়া হ্রদ শুকিয়ে গিয়েছিল এবং তার আশপাশের গির্জাগুলো ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। এগুলো তাবারী ও বাইহাকীর বর্ণনা।[10]

কিন্তু এগুলোর কোনো বর্ণনাসূত্র নেই। সে সকল জাতির ইতিহাস তন্নতন্ন করে খুঁজেও এর কোনো অস্তিত্ব বের করা যায়নি। অথচ, এ সকল ঘটনা সে সকল জাতির

---

6 সীরাতে ইবনে হিশাম

7 দেখুন মাহমূদ পাশা ফালাকী প্রণীত নাতাইজুল আফহাম ফী তাকওয়ীমিল আরবি কুবলাল ইসলাম পৃষ্ঠা ২৮-৩৫। বৈরূত।

8 পুরনো খ্রিস্ট ক্যালেন্ডার অনুসারে ২০ শে এপ্রিল আর নতুন গণণা অনুযায়ী ২২ শে এপ্রিল। বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন রহমাতুল্লিল আলামীন ১/৩৮, ৩৯; ২/৩৬০, ৩৬১।

9 মুসনাদে আহমদ ৪/১২৭, ১২৮, ১৮৫। ৫/২৬২। সুনানে দারেমী ১/৯। ইবনে সা'দ ১/১০২।

10 ইমাম বাইহাক্বী র. এর দালায়েলুন নবুওয়াহ ১/১২৬, ১২৭। তারীখে তাবারী ২/১৬৬, ১৬৭। আল বেদায়া ওয়ান নেহায়া ২/২৬৮, ২৬৯।

ইতিহাসের সর্বাগ্রে স্থান পাওয়াই যুক্তিযুক্ত ছিল ।রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন ভূমিষ্ঠ হলেন তখন আমিনা তাঁর দাদার কাছে পৌত্রের শুভ জন্মের সংবাদ পাঠালেন। আব্দুল মুত্তালিব যার পর আল্লাহকে ডাকলেন এবং তাঁর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করলেন।[11] আর পৌত্রের নাম নেই খুশি হয়ে ছুটে এলেন এবং আদরের পৌত্রকে নিয়ে কাবায় দাখিল হলেন। রাখলেন মুহাম্মাদ। ইতঃপূর্বে আরবে কোনো দিন কারও নাম মুহাম্মাদ রাখা হয়েছিল না। এরপরে আরবের প্রথা অনুযায়ী জন্মের সপ্তম দিনে তাকে খতনা করানো হয়।[12]

রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জন্মের এক সপ্তাহ পর্যন্ত নিজ মায়ের দুধ পান করলেন।[13] এরপর সর্বপ্রথম তাকে আবু লাহাবের বাদী সুওয়াইবা দুধ পান করান। এ সময় সুওয়াইবার কোলেও বাচ্চা ছিল। আর তার নাম ছিল মাসরূহ। সুওয়াইবা এর আগে হামযা বিন আব্দুল মুত্তালিবকে দুধ পান করিয়েছিলেন। এরপর করিয়েছিলেন আবু সালমা বিন আব্দুল আসাদ মাখযূমীকে।[14]

বনু সাদে তৎকালীন সময় নগরবাসী আরবদের নিয়ম ছিল, কোনো বাচ্চা জন্ম নেওয়ার পর গ্রামীণ এলাকার ধাত্রী খুঁজে বাচ্চাকে তার হাতে সমর্পণ করত। উদ্দেশ্য ছিল, যাতে বাচ্চার প্রবৃদ্ধি ও পুষ্টিসাধন সুন্দর হয়, তার শরীর শক্ত ও মজবুত হয়। তার কোষ ও গঠন সুসংহত হয় এবং ছোটবেলাতেই যেন বিশুদ্ধ আরবি ভাষা শেখা হয়ে যায়। এ কারণে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জন্যও আব্দুল মুত্তালিব ধাত্রীর খোঁজ নিলেন। বনু সাদ বিন বকর কবীলার হালীমা বিনতে আবু যুয়াইব আব্দুল্লাহ বিন হারেস নামের এক ধাত্রী মহিলা ও একই কবীলার তার স্বামী হারিস বিন আব্দুল উয্যা-তার কুনিয়ত ছিল আবু কাবশা- রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে দুধ পান করানো ও লালন পালনের যিম্মাদারি গ্রহণ করেন ।এই পরিবারে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দুধ ভাই বোন ছিলেন আব্দুল্লাহ বিন হারিস, আনীসা বিনতে হারিস এবং হুযাফা বা জুযামা বিনতে হারিস-তিনি শীমা নামে অধিক প্রসিদ্ধ ও পরিচিত ছিলেন। তিনি রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে

---

11 ইবনে হিশাম ১/১৫৯, ১৬০। তারীখে তাবারী ২/২/১৫৬, ১৫৭। ইবনে সা'দ ১/১০৩।

12 কারও কারও মতে, তিনি খতনাকৃত অবস্থায়ই জন্মগ্রহণ করেছিলেন- তালকীহে ফুহূমি আহলিল আসারি। আল্লামা ইবনুল কায়্যিম র. বলেন, এ মতের সমর্থনে নির্ভরযোগ্য কোনো হাদীস নেই। দেখুন যাদুল মাআদ ১/১৮।

13 ইত্তেহাফুল ওয়ালা ১/৫৭।

14 সহীহ বুখারী হাদীস নং ২৬৪৫, ৫১০০, ৫১০১, ৫১০৬, ৫১০৭, ৫৩৭২। তারীখে তাবারী ২/১৫৮। তবে তাঁর সনদ প্রশ্নসাপেক্ষ। আবু নাঈম প্রণীত দালায়েলুন নবুওয়্যাহ ১/১৫৭।

ছোট বেলায় কোলে নিয়ে ঘুরতেন। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর চাচাতো ভাই আবু সুফিয়ান বিন হারিস বিন আব্দুল মুত্তালিবও রা. হযরত হালীমা রা. এর সূত্রে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দুধ ভাই ছিলেন। তা ছাড়া নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর চাচা হামযা বিন আব্দুল মুত্তালিবও রা. রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দুধভাই ছিলেন। কারণ হামযা রা. কেও ছোট বেলায় বনু সাদ বিন বকরের এক মহিলার কাছে দুধ পান করতে দেওয়া হয়েছিল। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মাতা হালীমার কাছে থাকাকালে একদিন সেই মহিলা তাকে দুধ পান করান। এভাবে হামযা রা. দুই দিক দিয়ে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দুধভাই ছিলেন। প্রথমত সুওয়াইবার দিক দিয়ে আর দ্বিতীয়ত বনু সাদের সেই মহিলার দিক দিয়ে।[15]

শৈশব ও কৈশোর জীবন

মাতা আমেনা ও দাদা আবদুল মুত্তালিবের ওফাত:

তাঁর বয়স যখন ছয় বছর তখন মা আমেনা তাঁর দাদার মাতৃকুলকে দেখাবার নিমিত্ত তাঁকে ইয়াছরিব নিয়ে যান। তিনি তাঁর প্রিয়তম স্বামী আবদুল্লাহ ইবন 'আবদুল-মুত্তালিবের কবর যিয়ারতেও ইচ্ছুক ছিলেন।[16] মক্কা প্রত্যাবর্তনের পথে আল-আবওয়া[17] নামক স্থানে বিবি আমেনার ইনতিকাল হয়। এখন একদিকে মাতৃবিয়োগের শোক, অপরদিকে সফরের নিঃসঙ্গতা ও একাকিত্ব। জন্মের পর থেকেই আগাগোড়া তাঁর সঙ্গে এ ধরনেরই ব্যাপার সংঘটিত হয়েছে। এ ছিল তরবিয়তে ইলাহী তথা খোদায়ী প্রশিক্ষণের সেই গূঢ় রহস্য যা একমাত্র আল্লাহ ছাড়া অন্য কেউ জানেন না। উম্মে আয়মান বারাকা হাবশিয়া নামক একজন দাসী তাঁকে নিয়ে মক্কায় আসেন এবং আল্লাহ্ এই আমানত দাদা আবদুল মুত্তালিবের নিকট সোপর্দ করেন। এরপর তিনি দাদার স্নেহ ছায়ায় অবস্থান করেন যিনি তাঁকে মনপ্রাণ দিয়ে চাইতেন, ভালবাসতেন এবং ক্ষণিকের তরেও তিনি তাঁর এই য়াতীম পৌত্র সম্পর্কে গাফিল হতেন না। কা'বা শরীফের ছায়ায়

---

15 যাদুল মাআদ ১/১৯

16 রাসূলুল্লাহ (স) এই সফরের কিছু কিছু ঘটনা বয়ান করতেন। হিজরতের পর তিনি বনী নাজ্জারের ঘরবাড়ি দেখে বলেন, আমার মা এখানেই অবতরণ করেছিলেন এবং বনী 'আদী ইবনু'ন-নাজ্জারের বাওলীতে (সিড়িযুক্ত বড় কুয়া) আমি খুব লাফালাফি করেছিলাম (শারহ আল-মাওয়াহিবু'ল-লাদুন্নিয়া, ১ম খণ্ড, ১৬৭-১৬৮ পৃ.

17 জায়গাটি মঞ্জুরার নিকটবর্তী যা এখন মক্কা ও মদীনার মাঝখানে মশহুর মনযিল এবং অর্ধেক রাস্তায়।

স্বীয় ফরাশের ওপর সাথে নিয়ে বসতেন এবং নানাভাবে স্নেহ ও ভালবাসার প্রকাশ ঘটাতেন ।তাঁর বয়স যখন আট বছর তখন দাদা আবদুল-মুত্তালিবও[18] ইনতিকাল করেন ফলে তাঁকে পুনরায় পিতৃহীনতার স্বাদ গ্রহণ করতে হয় যা পূর্বের তুলনায় ছিল অনেক বেশি তিক্ত ও কঠিন। তিনি তাঁর পিতাকে কখনো দেখেন নি । পিতার স্নেহ ও ভালবাসার স্বাদ সম্পর্কেও তিনি অনবহিত ছিলেন। এ জন্য পিতার বিয়োগ ব্যথা স্বাভাবিকের বেশি কিছু ছিল না, কিন্তু দাদার স্নেহ-যত্ন ও আদর-ভালবাসা থেকে বঞ্চিত হবার অনুভূতি ছিল উপলব্ধিসঞ্জাত ও অভিজ্ঞতালব্ধ। আর এতদুভয়ের মধ্যকার পার্থক্য সকলেই বুঝতে পারেন।

চাচা আবূ তালিবের সঙ্গে:

দাদার ইনতিকালের পর তিনি চাচা আবূ তালিবের সঙ্গে থাকতে লাগলেন। তিনি ছিলেন পিতা আবদুল্লাহ্ সহোদর।আবদু'ল-মুত্তালিব তাঁকে তাঁর দেখাশোনা ও তাঁর সঙ্গে উত্তম আচরণের নিমিত্ত বরাবর উপদেশ দিতেন। এ জন্য তিনি একাগ্র চিত্তে তাঁর দিকে মনোযোগ দেন এবং আপন সন্তান আলী, জা'ফর ও আকীল (রাঃ)-এর চেয়েও বেশী কোমল, স্নেহপরবশ, যত্ন-তদবীর ও প্রতিপালন প্রবণ হয়ে রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে সাথে রাখেন।[19] বলা হয়ে থাকে যে, একবার আবূ তালিব বাণিজ্য উপলক্ষে একটি কাফেলার অন্তর্ভুক্ত হয়ে সিরিয়া যাচ্ছিলেন। এ সময় রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর বয়স ছিল নয় বছর। তিনি চাচাকে রওয়ানা হতে দেখেই জড়িয়ে ধরেন। আবূ তালিব এতে খুব অভিভূত হয়ে পড়েন এবং ভাতিজাকে সফরসঙ্গী হিসাবে গ্রহণ করেন।[20] এই বাণিজ্য কাফেলা 'বুসরা' নামক স্থানে পৌঁছল এবং সেখানে ছাউনি ফেলল। এটি সিরীয় এলাকায় অবস্থিত। এখানে বুহায়রা নামক একজন রাহেব (খৃষ্টান সাধু-সন্ন্যাসী)-এর সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ ঘটে। রাহেব তাঁর খানকাহতে বসবাস করতেন। সাধু বুহায়রা অভ্যাসের বিপরীত এই কাফেলাকে দাওয়াত করেন, উষ্ণ আন্তরিকতা সহকারে সকলকে অভ্যর্থনা জানান এবং ভূরিভোজে আপ্যায়িত করেন এজন্য যে, তিনি এই কাফেলার সঙ্গে আল্লাহ বিশেষ রকমের আচরণ ও অস্বাভাবিক ঘটনাবলী দেখতে পাচ্ছিলেন। যখন তিনি রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে দেখতে পেলেন তখন তিনি আরও বেশি খাতির-যত্ন করেন এবং নিশ্চিত হন যে, বালকের ভেতর নবুওয়াতের লক্ষণসমূহ বিদ্যমান। তিনি আবূ তালিবকে

---

18 সীরাত ইবনে হিশাম, ১ম খণ্ড, ১৬৮-৫৯ পৃ.।

19 সীরাত ইবনে হিশাম, ১ম খণ্ড, ১৭৯ পৃ.।

20 অধিকতর বিশুদ্ধ বর্ণনা মুতাবিক।

তাঁর সমুন্নত মর্যাদা ও 'আলীশান সম্পর্কে তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করেন এবং বলেন, আপনি আপনার ভাতিজাকে নিয়ে ঘরে ফিরে যান এবং ইয়াহুদীদের হাত থেকে তাঁকে বিশেষভাবে হেফাজত করবেন। কেননা আপনার ভাতিজা ভবিষ্যতে বিরাট মর্যাদার অধিকারী হবেন। এরপর আবূ তালিব তাঁকে নিয়ে নিরাপদে মক্কায় ফিরে আসেন।[21]

ফিজার যুদ্ধ

---

21 এই ঘটনা সীরাত ইবন হিশাম ও সীরাতের অন্যান্য গ্রন্থে খুব বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হয়েছে এবং এই ঘটনার বিশুদ্ধতার ব্যাপারে মুহাদ্দিছ সমালোচকগণ বিষয়বস্তু ও বর্ণনাগত উভয় দিক নিয়ে কথা বলেছেন। আল্লামা শিবলী নুমানী সীরাতুন্নবী"তে লিখেছেন যে, ইমাম তিরমিযী এই হাদীছ উদ্ধৃত করার পর লিখছেন :

حديث حسن غريب لا نعرفه الامن هذا الوجه হাদীছ হাসান গরীব; এটি উক্ত সূত্র ব্যতিরেকে অন্য কোন সূত্রে বর্ণিত হয়েছে বলে জানি না। হাদীছের বর্ণনাকারী রাবীদের মধ্যে 'আবদুর রহমান ইবন গাযওয়ানের নাম পাওয়া যায়, যাঁর সম্পর্কে আপত্তি উত্থাপিত হয়েছে। 'আল্লামা যাহাবী বলেন যে, সে মুনকার হাদীছ বর্ণনা করে থাকে এবং সেগুলোর মধ্যে সর্বাধিক মুনকার হাদীছ সেটি যার ভেতর বুহায়রার কিসসা বর্ণিত হয়েছে (১ম খণ্ড, ৮০ পৃ)। আরেকটি কথা ধর্তব্য। এতে আরও উল্লেখ রয়েছে যে, আবু তালিব রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে বেলালের সাথে পাঠিয়ে দেন। 'আল্লামা ইবনুল কায়্যিম তদীয় "যাদুল মাআদ" গ্রন্থে লিখেছেন, তিরমিযী ও অন্যান্য গ্রন্থে এ কথা বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি (আবূ তালিব) তাঁর সঙ্গে বেলালকে পাঠিয়ে দেন যা একেবারেই ভ্রমাত্মক এজন্য যে, সে সময় বেলাল উপস্থিত ছিলেন না। আর যদি থেকেও থাকেন তবুও তাঁর চাচা কিংবা হযরত আবূ বকরের সঙ্গে ছিলেন না কখনোই (যাদুল মা'আদ, ১ম খণ্ড, ১৮ পৃ.)।প্রাচ্যবিদ ও অসৎ উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ঐতিহাসিকগণ সব সময় এ ধরনের সুযোগের সন্ধানে ওঁৎ পেতে থাকেন। অতএব, বুহায়রা সাধুর সঙ্গে তাঁর এই চৌরাস্তার প্রকাশ্য মোলাকাত (যে সাধুর আকীদা-বিশ্বাস ও বিদ্যাবত্তা সম্পর্কে কোন নাম-নিশানা পর্যন্ত আমরা পাই না)-কে তারা বিন্দু থেকে সিন্ধুতে পরিণত করে ছেড়েছেন এবং এর ওপর কল্পনার দুর্গ নির্মাণ করেছেন এবং প্রমাণ করতে চেষ্টা করেছেন যে, তাওহীদী 'আকীদার এই স্বচ্ছ ও নিষ্কলুষ শিক্ষামালা তিনি (রসূলুল্লাহ) আসলে একজন খৃষ্টান পণ্ডিত থেকে লাভ করেছিলেন। এর চেয়েও বেশি আশ্চর্যজনক বিষয় হল এই যে, একজন ফরাসী প্রাচ্যবিদ CARRA DE VAUX এ বিষয়ের ওপর একটি গ্রন্থ পর্যন্ত রচনা করে ফেলেছেন এবং এর নাম দিয়েছেন "কুরআন প্রণেতা" । তিনি এতে দাবি করেছেন যে, এই সংক্ষিপ্ত সাক্ষাতের সময় "বুহায়রা" সমগ্র কুরআন মুহাম্মাদ (সা)-কে dictation দেন।যদি রাহেব বুহায়রার সঙ্গে রসূলুল্লাহ (সা)-এর সাক্ষাৎকারের কথা সঠিক বলে মেনেও নেওয়া হয় তবুও কোন বুদ্ধিমান ও বিচক্ষণ মানুষ, যার জ্ঞান-বুদ্ধি এখনও লোপ পায়নি এবং যার ভেতর ইনসাফ ও ন্যায়নীতির ছিটেফোঁটাও বর্তমান আছে, সে এ ধরনের কথা কল্পনায় ঠাঁই দিতেও চাইবে না। এধরনের কথা কোন সুস্থ বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের মাথায় ঢুকতে পারে যে, একজন অল্প বয়স্ক বালক যার বয়স সবচেয়ে বিশুদ্ধ বর্ণনা মুতাবিক নয় বছর আর বেশি থেকে বেশি বার বছর বলা হয়েছে, এমন একজন বয়স্ক প্রবীণ মানুষের কাছ থেকে যাঁর ভাষার সাথেও তাঁর কোন সংযোগ নেই, যাঁর সঙ্গে কেবল একবেলা খাবার গ্রহণের সময় একত্রে বসার সুযোগ হয়েছে, তিনি এরূপ সূক্ষ্ম ও গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা ও নাযুক বিস্তারিত বিষয়াবলী নিয়ে মত বিনিময় করবেন এবং তিনি (রসূলুল্লাহ) খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে খৃষ্ট ধর্মের বাতিল শিরকমূলক আকীদা-বিশ্বাস ও ধ্যান-ধারণার সেই সব সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিষয়াদি সম্পর্কে অবহিত হয়ে যাবেন যেখানে প্রটেস্ট্যান্ট ধর্মের বড় বড় পাদরী ও পণ্ডিত প্রবেশ করতে হিমশিম খাচ্ছেন। অতঃপর তিরিশ-চল্লিশ বছর পর (যখন বুহায়রা সাধুর হাড়-হাড্ডি পর্যন্ত মাটির সঙ্গে মিশে গেছে) কুরআন আকারে সে সবগুলোকে বিন্যস্ত ও সংকলিত আকারে পেশ করে দেবেন ? এ ধরনের কথা কেবল তারাই বলতে পারে ঈর্ষা ও বিদ্বেষ যাদেরকে অন্ধ করে দিয়েছে অথবা কল্পনা- বিলাস, মনগড়া ও উদ্ভট কথা সৃষ্টিতে যাদের জুড়ি মেলা ভার। যদি সীরাত গ্রন্থগুলোতে এসব না থাকত তাহলে এ ধরনের কথা আলোচনা করবার এখানে প্রয়োজন পড়ত না।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বয়স যখন বিশ বছর তখন উকা মেলায় কুরাইশ -তাদের সঙ্গে ছিল কেনানা- ও কায়স আয়লানের মাঝে এক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ শুরু হলো। ইতিহাসে এটা ফিজার যুদ্ধ নামে পরিচিত।[22] যুদ্ধের কারণ ছিল এই যে, বনু কেনানার বাররাজ নামের এক ব্যক্তি কায়স আয়লানের তিন ব্যক্তিকে হত্যা করেছিল। যখন উকায মেলায় এ সংবাদ পৌঁছল উভয় পক্ষ প্রচণ্ড যুদ্ধের সীমাহীন উত্তেজনায় মেতে উঠল। এ যুদ্ধে কুরাইশ ও বনু কেনানার সরদার ছিল হরব বিন উমাইয়্যা। কারণ সে বয়স ও শারাফাত উভয় দিক দিয়েই তাদের সকলের চেয়ে শ্রেষ্ঠ ছিল। দিনের শুরুভাগে যুদ্ধের পাল্লা ভারী ছিল বনু কায়সের দিকেই। এর বিপরীতে বনু কেনানা হয়ে পড়েছিল কোণঠাসা। কিন্তু দিনের মধ্যভাগে যুদ্ধের পাল্লা হেলে পড়ার উপক্রম হলো বনু কেনানার দিকে। সঙ্গে সঙ্গে কয়েক জন কুরাইশের পক্ষ থেকে সন্ধির রব উঠালো। সন্ধির শর্ত দেওয়া হলো উভয় পক্ষের নিহতদের সংখ্যা হিসাব করা হবে। এরপর যে পক্ষের নিহতের সংখ্যা বেশি হবে অপর পক্ষ থেকে সেই বেশিটুকুর দিয়ত নেওয়া হবে । এভাবে সন্ধির মধ্য দিয়ে রক্তক্ষয়ী এক লড়াইয়ের সমাপ্তি ঘটল। তাদের দুশমনি আর শত্রুতার দিন শেষ হয়ে এলো। আরবিতে ফিজার অর্থ হলো লঙ্ঘন করা। যেহেতু এই যুদ্ধে হারাম মাসের সম্মান ও ইয্যতকে লঙ্ঘণ করা হয়েছিল, সে কারণে একে হারবুল ফিজার বলে নামকরণ করা হয়েছে। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও এ যুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন। তিনি তাঁর চাচাদেরকে তীর কুড়িয়ে দিয়েছিলেন।[23]

হিলফুল ফুযূল

এই যুদ্ধের পরপরই আরবের কুরাইশের কয়েকটি গোত্র যথা বনু হাশিম, বনু মুত্তালিব, আসাদ বিন আব্দুল উয্যা, যুহরা বিন কিলাব ও তাইম ইবনে মুররা ফুল কা'দ মাসে

---

22 এ দুই দলের মধ্যে মোট চারটি ফিজার যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল। প্রথম তিনটি কোনো যুদ্ধ বিগ্রহ ছাড়াই সন্ধির মাধ্যমে শেষ হয়েছিল। কেনানার জনৈক ব্যক্তির কাছে বনু কায়সের এক ব্যক্তির পাওনা ছিল। কিন্তু সে তার পাওনা নিয়ে টালবাহানা করছিল। দুই. এক কেনানী উকায বাজারে গর্ব আর বড়াই করেছিল। তিন. মক্কার কয়েকটি বখাটে যুবক কায়সের এক সুন্দরী রমণীর সঙ্গে উৎকট ফাযলামীর চেষ্টা করছিল। আর কিতাবে উল্লিখিত এটা হলো ফিজারুল বারায। বিস্তারিত দেখুন মুনমিক ফী আখবারি কুরাইশ পৃষ্ঠা ১৬০-১৬৪। ইবনুল আসীর প্রণীত কামিল ১/৪৬৭। আর তিনি প্রথম তিনটিকে একটি হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

23 ইবনে হিশাম ১/১৮৪-১৮৭। মুনমিক ফী আখবারি কুরাইশ পৃষ্ঠা ১৬৪-১৮৫। ইবনুল আসীর প্রণীত আল কামিল ১/৪৬৮-৪৭২। তারা বলেছেন, এটা ছিল শাওয়াল মাসের ঘটনা। কিন্তু সেটা বিশুদ্ধ নয়। কেননা শাওয়াল হারাম মাসের অন্তর্ভুক্ত কোনো মাস নয়। আর উকায মেলাও ছিল হারামের বাইরে। তাহলে আর এ যুদ্ধে লজ্জিত হওয়ার মতো হারাম থাকেই বা আর কী? তা ছাড়া প্রতি বছর উকায বেলা বসত গিয়ে শাওয়াল মাস শেষে ফুল কা'দ মাসের গোড়ার দিকে

হিলফুল ফুযূল গঠনের প্রস্তাব দেয়। এরপর তারা সকলেই এ লক্ষ্যে তাদের বয়োবৃদ্ধ ও সম্ভ্রান্ত সরদার আব্দুল্লাহ বিন জুদআন তাইমীর ঘরে সমবেত হয়। তারা হিলফুল ফুযূল গঠন করে এবং অঙ্গীকার ব্যক্ত করে যে, গোটা মক্কায় যে কোনো মযলুমের পাশে গিয়ে তারা দাঁড়াবে। আর যে অন্যের ওপর যুলুম করবে তার কাছ থেকে যুলুমের দায় আদায় করে ছাড়বে। রাসূলে কারীমও সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই মৈত্রীচুক্তিতে উপস্থিত ছিলেন। রিসালতের মহা সম্মানে ভূষিত হওয়ার পরে একদিন তিনি বলেছিলেন, 'আব্দুল্লাহ বিন জুদআনের ঘরে আমি এমন একটি মৈত্রীচুক্তির মধ্যে শরীক ছিলাম যে এর বিনিময়ে আমি লাল উটও গ্রহণ করা পছন্দ করতাম না। যদি ইসলাম আসার পরেও এমন কোনো চুক্তিতে আমাকে ডাকা হতো তবে আমি সে ডাকে সাড়া দিতাম।[24] এই মৈত্রীচুক্তির প্রাণ জাহেলিয়াতের হিংসা-বিদ্বেষ আর আত্মম্ভরিতার দাউ দাউ আগুনে ঠাণ্ডা পানি ঢেলে দিয়েছিল সাম্প্রদায়িকতা আর জাত্যভিমান যে আগুন আরবীয় দুনিয়ার সর্বত্র উস্কে দিয়েছিল। এই মৈত্রীচুক্তির পেছনে সক্রিয় কারণ সম্পর্কে বলা হয়: যুবায়দ গোত্রের এক ব্যক্তি কিছু পণ্য নিয়ে মক্কায় এলো । আস বিন ওয়ায়েল সাহমী তার থেকে তা কিনে নিলো। কিন্তু তাকে সে বিনিময় দিতে টাল বাহানা শুরু করল। সে তার মিত্র কবীলা আব্দুদ্দার, মাখযূম, জুমাহ, সাহম, আদীর নিকট সাহায্য প্রার্থনা করল। কিন্তু তারা তার দিকে ফিরেও তাকাল না। এরপর সে আবু কুবাইস পাহাড়ে আরোহণ করল। সুউচ্চ নিনাদে সে কয়েকটি কবিতায় তার দুঃখ আর কষ্টের অন্ধকার দাস্তান বলে চলল। তার আওয়াজ শুনে যুবাইর বিন আব্দুল মুত্তালিব সামনে এসে বলল কী ব্যাপার ! কেউ তার সাহায্যে এগিয়ে আসছে না কেন ? এরপর পেছনে উল্লিখিত গোত্রগুলি হিলফুল ফুযূল গঠনের ওপর ঐকমত্যে পৌঁছে। চুক্তি গঠনের পরে তারা আস বিন ওয়ায়েলের কাছে আসে এবং তার কাছ থেকে যুবায়দীর অধিকার আদায় করেনেয়।[25]

---

24 ইবনে হিশাম ১/১৫৪, ১৫৫।

25 তাবাকাতে ইবনে সা'দ ১/১২৬-১২৮। যুবাইরী প্রণীত নসৰু কুরাইশ পৃষ্ঠা ২৯১।

পারিবারিক জীবন

মুহাম্মাদ (সা:) এর স্ত্রীগণ বলতে ইসলামের নবী মুহাম্মদ (সা:) সাথে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হওয়া নারীদের বোঝায়। মুসলিমরা মুহাম্মাদের স্ত্রীগণের আগে বা পরে সম্মানার্থে "উম্মাহাতুল মুমিনীন" শব্দটি ব্যবহার করে, যার অর্থ "বিশ্বাসীগণের মাতা" বা "মুমিনদের মাতা"।[26] এই শব্দটি কুরআন থেকে উদ্ভূত।[27]

সর্বাধিক স্বীকৃত কাহিনী অনুযায়ী, মুহাম্মাদ(সাঃ) ২৫ বছর বয়সে তার প্রথম স্ত্রী খাদিজা বিনতে খুওয়াইলিদের(রাঃ) সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। সে সময় খাদিজার(রাঃ) বয়স ছিলো ৪০ বছর। তিনি তার সাথে ২৫ বছর সংসার করেছিলেন। খাদিজাকে(রাঃ) বিয়ের ১৫ বছর পর (আনু. ৬১০ খ্রিস্টাব্দ) মুহাম্মাদ(সাঃ) নবুয়ত লাভ করেন। ৬১৯ খ্রিস্টাব্দে খাদিজা(রাঃ) যখন মৃত্যুবরণ করেন তখন মুহাম্মাদ(সাঃ) এর বয়স ছিল ৫০ বছর।[28] মুহাম্মাদ(সাঃ) তার জীবনের অবশিষ্ট বছরগুলিতে মোট ১২ জন নারীকে বিয়ে করেন। মুহাম্মাদ(সাঃ) এর ১৩ জন পত্নী ও উপপত্নীর মধ্যে খাদিজা(রাঃ) ও মারিয়া আল-কিবতিয়া(রাঃ) মাত্র এই দুজন তাকে সন্তান জন্ম দেয়। তার ১৩ জন পত্নী ও উপপত্নীর মধ্যে একমাত্র আয়িশা(রাঃ) ছিলেন কুমারী।

মুহাম্মাদ(সাঃ) এর জীবনকে সাধারণত দুটি যুগে ভাগ করা হয়ঃ হিজরতের পূর্বে, পশ্চিম আরবের একটি শহর মক্কায় (৫৭০—৬২২), এবং হিজরতের পরবর্তীতে মদিনায় (৬২২—৬৩২)। হিজরত বলতে মক্কায় মুসলমানদের উপর নির্যাতনের কারণে মুহাম্মাদ(সাঃ) ও তার অনুসারীদের মদিনায় গণ-অভিবাসনকে বোঝায়। এই অভিবাসনের পরে মুহাম্মাদ(সাঃ) এর দুটি বিবাহ ব্যতীত বাকি সবগুলোই চুক্তিবদ্ধের দ্বারা হয়েছিল।

খাদিজা বিনতে খুওয়াইলিদ(রাঃ)

প্রায় ২২-২৫ বছর বয়সে মুহাম্মাদ(সাঃ) তার ধনাঢ্য ও সম্ভ্রান্ত নিয়োগকর্তা, ২৮ বা ৪০ বছর বয়সী বিধবা এবং এক ব্যবসায়ীর কন্যা খাদিজার(রাঃ) সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন।[29] এই বিবাহই ছিল তার প্রথম বিবাহ। বিবাহের পর উভয় সুখী এবং একগামী হয়। মুহাম্মাদ(সাঃ) অনেক দিক থেকে খাদিজার উপর নির্ভরশীল ছিলেন, ২৫ বছর

---

26 Prophet Muhammad(s) and His Family: A Sociological Perspective (ইংরেজি ভাষায়)। ২০০৭। পৃষ্ঠা ৮৫

27 "নবী মুমিনদের নিকট তাদের নিজেদের অপেক্ষা অধিক ঘনিষ্ঠ এবং তাঁর স্ত্রীগণ তাদের মাতা"[**কুরআন ৩৩:৬**]

28 The Sealed Nectar (Biography of the Prophet)

29 al-Nīsābūrī, Muḥammad ibn ʻAbd Allāh Ḥākim (১৯৭৩)। al-Mustadrak ala al-Sahihayn

পরও তার মৃত্যুর আগ পর্যন্ত। তাদের দুই ছেলে কাসিম ও আব্দুল্লাহ (যাদের ডাকনাম যথাক্রমে আল-তাহির ও আল-তাইব),[30] উভয়েই অল্প বয়সে মারা যায় এবং চার মেয়ে ছিল — জয়নব, রুকাইয়া, উম্মে কুলসুম এবং ফাতিমা(রাঃ)। যদিও শিয়া পণ্ডিতরা খাদিজার কন্যাদের পিতৃত্ব নিয়ে বিতর্ক করেন, কারণ তারা তাদের মধ্যে প্রথম তিনজনকে পূর্ববর্তী বিবাহের কন্যা হিসাবে দেখেন এবং কেবল ফাতিমাকে(রাঃ) মুহাম্মাদ(সাঃ) ও খাদিজার(রাঃ) কন্যা হিসাবে দেখেন।[31] তাদের বিয়ের সময় খাদিজা(রাঃ) যায়েদ ইবনে হারেসাকে(রাঃ) দাস হিসেবে কিনে নেন, তারপর মুহাম্মাদ(সাঃ) এর অনুরোধে যুবকটিকে তার পুত্র হিসেবে গ্রহণ করেন।[32] আবু তালিব ও খাদিজা(রাঃ) একই বছরে মারা যান। মুহাম্মাদ(সাঃ) এই বছরটিকে আম উল-হুজন (দুঃখের বছর) হিসেবে বর্ণনা করেন।

সাওদা বিনতে জামআ(রাঃ)

মদিনায় রওনা হওয়ার আগে খাওলা বিনতে হাকিমের পরামর্শ ছিল যে, তিনি সাওদাহ বিনতে জামআকে(রাঃ) বিয়ে করবেন, যিনি মুসলিম হওয়ার পর অনেক কষ্ট ভোগ করেছিলেন। এর আগেও, সাওদা আস-সাকরান ইবনে আমর নামে তার এক পৈতৃক চাচাতো ভাইয়ের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন এবং তার পূর্ববর্তী বিবাহ থেকে পাঁচ বা ছয়টি সন্তানও ছিল। তিনি তার স্বামীর সাথে মক্কাবাসীদের দ্বারা মুসলমানদের নিপীড়নের কারণে আবিসিনিয়ায় চলে যান। তার স্বামী আবিসিনিয়ায় মারা যান এবং তাই সাওদাহকে(রাঃ) মক্কায় ফিরে আসতে হয়েছিল। মুসলিম ঐতিহ্যে মতবিরোধ রয়েছে যে মুহাম্মাদ(সাঃ) প্রথমে সাওদাকে বিয়ে করেছিলেন নাকি আয়িশাকে, কিন্তু সাওদাকে(রাঃ) সাধারণত তার দ্বিতীয় স্ত্রী হিসাবে গণ্য করা হয় এবং আইশা(রাঃ) পরিবারে যোগ দেওয়ার আগে তিনি তার সাথে থাকতেন।[33] একটি বিবরণে, তিনি শাওয়ালের সাওদাকে(রাঃ) বিয়ে করেছিলেন, যখন সাওদা(রাঃ) প্রায় ৫৫ বছর

---

30 Gwynne, Paul (২০১৩-১২-২৩)। Buddha, Jesus and Muhammad: A Comparative Study (ইংরেজি ভাষায়)

31 "THE SHIA: THE REAL FOLLOWERS OF THE SUNNAH 229 – 248"। www.rafed.net। ২০০৬-০৫-০৪ তারিখে মূল থেকে আর্কাইভ করা। সংগ্রহের তারিখ ২০২১-১১-২২।

32 "Life of Muhammad (pbuh) – Haykal"। web.archive.org। ২০০৭-০৮-০৯ তারিখে মূল থেকে আর্কাইভ করা। সংগ্রহের তারিখ ২০২১-১১-২২।

33 "Sawda bint Zama – Oxford Islamic Studies Online"। www.oxfordislamicstudies.com। ২০১৮-০৯-১০ তারিখে মূল থেকে আর্কাইভ করা। সংগ্রহের তারিখ ২০২১-১১-২২।

বয়সী ছিলেন, নবীত্বের দশম বছরে, খাদিজার(রাঃ) মৃত্যুর পরে। প্রায় একই সময়ে, আইশা(রাঃ) তার সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন।[34]

সাওদার বয়স বাড়ার সাথে সাথে এবং উম্মে সালামার[35] সাথে মুহাম্মাদ(সাঃ) এর বিয়ের কিছু সময় পরে কিছু সূত্র দাবি করে যে মুহাম্মাদ(সাঃ) সাওদাকে(রাঃ) তালাক দিতে চেয়েছিলেন।[36] আবার কিছু সূত্র এটাও বলে যে মুহাম্মাদ(সাঃ) তাকে তালাক দিতে চাননি, বরং সাওদা(রাঃ) ভয় পেয়েছিলেন বা ভেবেছিলেন যে তিনি তা করতে পারেন।[37] ইবনে কাসির বলেন যে মুহাম্মাদ(সাঃ) চিন্তিত ছিলেন যে সাওদা(রাঃ) অনেক ছোট স্ত্রীর সাথে প্রতিযোগিতা করার জন্য বিরক্ত হতে পারেন, এবং তাকে তালাক দেওয়ার প্রস্তাব দেন।[38] সাওদা(রাঃ) তাকে ইশার কাছে মুহাম্মাদ(সাঃ) এর দাম্পত্য সফরের পালা দেওয়ার প্রস্তাব দিয়েছিলেন, যার প্রতি তিনি খুব অনুরাগী ছিলেন,[39] তিনি বলেছিলেন যে "তিনি বৃদ্ধ ছিলেন, এবং পুরুষদের যত্ন করতেন না; তার একমাত্র ইচ্ছা ছিল বিচার দিবসে তার স্ত্রীদের একজন হিসাবে উত্থান হওয়া"।[40] যদিও কিছু মুসলিম ইতিহাসবিদ এই কাহিনীর প্রকাশের কারণ হিসেবে, কুরআনের ৪:১২৮ আয়াত উল্লেখ করেছেন, রশিদ রিদার মতো অন্যরা এই পুরো বিবরণকে "দুর্বলভাবে সমর্থিত" বা মুরসাল বলে বিতর্ক করেছেন।[41]

আয়িশা বিনতে আবু বকর

আয়িশা মুহাম্মাদ(সাঃ) এর ঘনিষ্ঠ বন্ধু আবু বকরের কন্যা ছিলেন। প্রাথমিকভাবে তাকে জুবাইর ইবনে মুত'ইমের সাথে বিবাহ হওয়ার কথা ছিল, একজন মুসলিম যার বাবা যদিও মুসলমানদের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ পৌত্তলিক ছিলেন। যখন খাওলা বিনতে

---

34 Watt, W. Montgomery (২০১২-০৪-২৪)। "ʿĀʾisha Bint Abī Bakr"। Encyclopaedia of Islam, Second Edition (ইংরেজি ভাষায়)। Brill।

35 al-Shāṭi', Bint (২০০৬)। The Wives of the Prophet (ইংরেজি ভাষায়)। Gorgias Press। পৃষ্ঠা ৫২।

36 Bearman, Peri J. (১৯৯৭)। The Encyclopaedia of Islam, New Edition: Index of subjects (ইংরেজি ভাষায়) (২ সংস্করণ)। E.J. Brill। পৃষ্ঠা ৮৯–৯০।

37 Wessels, Antonie (১৯৭২)। A Modern Arabic Biography of Muḥammad: A Critical Study of Muḥammad Ḥusayn Haykal's Ḥayāt Muḥammad (ইংরেজি ভাষায়)। Brill Archive। পৃষ্ঠা ১০৫-০৬

38 "Wives of the Prophet Muhammad"। www.angelfire.com। সংগ্রহের তারিখ ২০২১-১১-২২।

39 "Wives of the Prophet Muhammad"। www.angelfire.com। সংগ্রহের তারিখ ২০২১-১১-২২।

40 Bearman, Peri J. (১৯৯৭)। The Encyclopaedia of Islam, New Edition: Index of subjects (ইংরেজি ভাষায়) (২ সংস্করণ)। E.J. Brill। পৃষ্ঠা ৮৯–৯০।

41 Wessels, Antonie (১৯৭২)। A Modern Arabic Biography of Muḥammad: A Critical Study of Muḥammad Ḥusayn Haykal's Ḥayāt Muḥammad (ইংরেজি ভাষায়)। Brill Archive। পৃষ্ঠা ১০৫-০৬

হাকিম মুহাম্মাদ(সাঃ) এর প্রথম স্ত্রীর (খাদিজা) মৃত্যুর পর মুহাম্মাদকে(সাঃ) আইশাকে(রাঃ) বিয়ে করার পরামর্শ দেন, তখন ইবনে মুতাইমের সাথে আইশার(রাঃ) বিবাহ সম্পর্কিত পূর্ববর্তী চুক্তিটি সাধারণ সম্মতিতে একপাশে রাখা হয়েছিল।[42]

মুহাম্মাদ(সাঃ) বিবাহের মাধ্যমে তার চার বন্ধুর বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ককে পারিবারিক সম্পর্কে রূপান্তরিত করেন, যারা পরে চার জন ইসলামের শাসক বা উত্তরসূরি হন। তিনি আবু বকর(রাঃ) ও উমরের(রাঃ) কন্যা আয়িশা(রাঃ) ও হাফসাকে(রাঃ) বিয়ে করেন এবং তিনি তার কন্যাদের উসমান(রাঃ) ও আলীকে(রাঃ) দেন।[43] আইশা(রাঃ) একমাত্র কুমারী যাকে মুহাম্মাদ(সাঃ) বিয়ে করেছিল।[44] অধিকাংশ ঐতিহ্যবাহী সূত্র জানায় যে আইশা(রাঃ) ছয় বা সাত বছর বয়সে মুহাম্মাদ(সাঃ) এর সাথে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন, কিন্তু তিনি নয় বছর বয়স পর্যন্ত বা ইবনে হিশামের মতে দশ বছর বয়স পর্যন্ত তার পিতামাতার বাড়িতে ছিলেন, যখন মদিনায় মুহাম্মাদ(সাঃ) এর সাথে বিবাহ সম্পন্ন হয়, তখন মুহাম্মাদ(সাঃ) ৫৩ বছর বয়সী। আলীর(রাঃ) মতো কিছু সূত্রে এবং পণ্ডিত বিতর্ক করেন যে আইশার(রাঃ) বয়স ১০ বছরেরও বেশি ছিল। অন্যান্য সূত্র এটাও বলছে যে আইশাকে(রাঃ) ১৬ বা ১৭ বছর বয়সে বিবাহ করা হয়েছিল এবং ১৯ বছর বয়সে শেষ হয়েছিল।

জাকির নায়েক, ওমর সুলেইমান, খালিদ ইয়াসিন, এবং ইয়াসির ক্বাদির মতো পণ্ডিতরা ইঙ্গিত দিয়েছিলেন যে আইশা এই বয়সে বয়ঃসন্ধিতে পৌঁছেছিলেন কারণ মরুভূমিতে আজকাল দ্রুত পরিপক্কতায় পৌঁছানো স্বাভাবিক ছিল, খাদ্যাভ্যাসের কারণে, এবং অল্প বয়সে বিয়ে করা সেই সময় অস্বাভাবিক ছিল না। আসলে, শিল্প বিপ্লব পর্যন্ত বাল্যবিবাহ সাধারণ ছিল।[45][46][47][48][49]

---

[42] Watt, W. Montgomery (২০১২-০৪-২৪)। "ʿĀʾisha Bint Abī Bakr"। Encyclopaedia of Islam, Second Edition (ইংরেজি ভাষায়)। Brill।

[43] Mubarakpuri, Safiur Rahman (২০২১-০২-০৩)। When The Moon Split: A Biography of Prophet Muhammad (ইংরেজি ভাষায়)। Independently Published।

[44] The Sealed Nectar (Biography of the Prophet) (ইংরেজি ভাষায়)। ২০০২।

[45] "The truth about Muhammad and Aisha | Myriam François-Cerrah"। the Guardian (ইংরেজি ভাষায়)। ২০১২-০৯-১৭।

[46] "Hazrat Aisha was 19, not 9 at marriage time by Dr Zakir Naik"

[47] "Ending the Debate on Aisha (ra)'s Age – Sh. Omar Suleiman | Lecture"

[48] "Why did Prophet Muhammad marry Aishah at a young age? - Q&A – Sh. Dr. Yasir Qadhi"

[49] "Why did Muhammad (pbuh) marry Aisha at a young age? - Q&A – Sh. Khalid Yasin"

আইশার(রাঃ) বিবাহের বয়স বিতর্ক ও বিতর্কের উৎস হয়ে দাঁড়িয়েছে, এবং কিছু ইতিহাসবিদ, ইসলামি পণ্ডিত এবং মুসলিম লেখকরা তার জীবনের পূর্বে গৃহীত সময়রেখাকে বাজি করেছেন।[50] আইশা(রাঃ) এবং সাওদাহ(রাঃ), দুই স্ত্রী উভয়কেই মুহাম্মাদ(সাঃ) আল-মসজিদ আল-নাবাউইর সংলগ্ন প্রাঙ্গণ দিয়েছিলেন।

সুন্নি বিশ্বাস অনুযায়ী, আইশা(রাঃ) অত্যন্ত পণ্ডিত এবং অনুসন্ধিৎসু ছিলেন (শিয়া বিশ্বাস কিছুটা ভিন্ন, আলির বিরুদ্ধে উটের যুদ্ধে তার ভূমিকা বিবেচনা করে, অন্যান্য বিষয়ের সাথে)। মুহাম্মাদের বার্তা ছড়িয়ে দেওয়ার ক্ষেত্রে তার অবদান অসাধারণ ছিল এবং তিনি তার মৃত্যুর পর ৪৪ বছর ধরে মুসলিম সম্প্রদায়ের সেবা করেছিলেন।[51] তিনি শুধু মুহাম্মাদের(সাঃ) ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কিত বিষয়েই নয়, অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে বিবাহ, ইসলামিক উত্তরাধিকার, হজ্জ ও ইসলামি পরকালবিদ্যার মতো বিষয়েও ২২১০টি হাদিস বর্ণনা করার জন্য পরিচিত।[52] তিনি কবিতা ও চিকিৎসাসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে বুদ্ধি ও জ্ঞানের জন্য অত্যন্ত সমাদৃত ছিলেন, যা বিশিষ্ট ইতিহাসবিদ আল-জুহরি এবং তার ছাত্রী উরওয়া ইবনে আল-জুবায়েরের কাছে প্রচুর প্রশংসা পেয়েছে।[53]

হাফসা বিনতে উমর(রাঃ) ও জয়নব বিনতে খুযায়মা(রাঃ)

মক্কার সাথে মুসলিম যুদ্ধের সময় বিধবা ও এতিমদের রেখে অনেক পুরুষ নিহত হয়। উমর ইবনে আল-খাত্তাবের(রাঃ) কন্যা হাফসা বিনতে উমর(রাঃ) বদরের যুদ্ধে বিধবা হন, যখন তার স্বামী খুনাইস ইবনে হুজাইফা কর্মে নিহত হন। মুহাম্মাদ(সাঃ) তাকে ৩ হিজরী অর্থাৎ ৬২৫ সালে বিয়ে করেন। বদরের যুদ্ধে জয়নব বিনতে খুযায়মা(রাঃ) ও বিধবা হয়েছিলেন। তিনি ছিলেন উবাইদাহ ইবনে হারিসের স্ত্রী, একজন বিশ্বস্ত মুসলিম এবং আল-মুত্তালিব গোত্রের, যার জন্য মুহাম্মাদ(সাঃ) এর বিশেষ দায়িত্ব ছিল। ৪ হিজরীতে যখন তার স্বামী মারা যায়, মুহাম্মাদ(সাঃ) তার জন্য ব্যবস্থা করার লক্ষ্য নিয়ে তাকে বিয়ে করেন। তার দয়া এবং দাতব্য কাজের কারণে তাকে **"উম্মু**

---

50 Ali, Kecia (২০১৬-০২-০৯)। Sexual Ethics and Islam: Feminist Reflections on Qur'an, Hadith, and Jurisprudence (ইংরেজি ভাষায়)। Oneworld Publications। পৃষ্ঠা ১৭৩–৮৬।

51 Aleem, Shamim (২০০৭)। Prophet Muhammad(s) and His Family: A Sociological Perspective (ইংরেজি ভাষায়)। AuthorHouse। পৃষ্ঠা ১৩০।

52 Sayeed, Asma (২০১৩-০৮-০৬)। Women and the Transmission of Religious Knowledge in Islam (ইংরেজি ভাষায়)। Cambridge University Press। পৃষ্ঠা ২৭-২৯।

53 Sayeed, Asma (২০১৩-০৮-০৬)। Women and the Transmission of Religious Knowledge in Islam (ইংরেজি ভাষায়)। Cambridge University Press। পৃষ্ঠা ২৭-২৯।

আল-মাসাকিন" (সাধারণত *দরিদ্রদের মা* হিসাবে অনুবাদ করা হয়) উপাধি দেওয়া হয়েছিল।

আয়িশার(রাঃ) বয়সের কাছাকাছি, দুই ছোট স্ত্রী হাফসা(রাঃ) এবং জায়নাবকে(রাঃ) পরিবারে স্বাগত জানানো হয়েছিল। সাওদা(রাঃ), যিনি অনেক বড় ছিলেন, তার মাতৃত্বের পরোপকার ছোট মহিলাদের কাছে বাড়িয়ে দিয়েছিলেন। আইশা(রাঃ) এবং হাফসার(রাঃ) মধ্যে দীর্ঘস্থায়ী সম্পর্ক ছিল। জায়নাবের ক্ষেত্রে, তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং বিয়ের প্রায় তিন মাস পরে মারা যান।

উম্মে সালামা

আবু সালামাহ(রাঃ), একজন ধর্মপ্রাণ মুসলিম এবং মুহাম্মাদ(সাঃ) এর পালক ভাই, উহুদের যুদ্ধে মৃত্যু বরণ করেন। তার বিধবা উম্মে সালামা, যিনি একজন নিষ্ঠাবান মুসলিমও ছিলেন, তার ছোট সন্তান ছাড়া আর কেউ ছিল না। জানা গেছে, একজন পুরুষ ছাড়া থাকার কারণে তার দুর্দশা মুসলমানদের দুঃখিত করেছে এবং তার ইদ্দতের পর কিছু মুসলমান তাকে বিয়ের প্রস্তাবও দিয়েছে; কিন্তু তিনি প্রতিটি প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। তিনি খালিদ ইবনে আল ওয়ালিদের পৈতৃক চাচাতো বোন ছিলেন, সামরিক কমান্ডার যিনি অনেক যুদ্ধে মুহাম্মাদ(সাঃ) এর বিরুদ্ধে লড়াই করেছিলেন।[54] তার বিয়ে খালিদকে উহুদের যুদ্ধে একটি সিদ্ধান্তহীন মনোভাব নিতে বাধ্য করেছিল। মুহাম্মাদ(সাঃ) যখন তার বিয়ের প্রস্তাব দেন, তখন তিনি তিনটি কারণে অনিচ্ছুক ছিলেন: তিনি ঈর্ষায় ভুগছিলেন বলে দাবি করেছিলেন এবং একটি অসফল বিবাহের সম্ভাবনা, তার বার্ধক্য এবং তার তরুণ পরিবারের দিকে ইঙ্গিত করেছিলেন যার সমর্থনের প্রয়োজন ছিল। কিন্তু মুহাম্মাদ(সাঃ) উত্তর দিয়েছিলেন যে, তিনি আল্লাহর কাছে দোয়া করবেন যেন তিনি তাকে ঈর্ষা থেকে মুক্ত করেন, তিনিও বার্ধক্যজনিত এবং তার পরিবারের মতো।[55] অবশেষে ৪ই হিজরীর শেষের দিকে তিনি মুহাম্মাদ(সাঃ) কে বিয়ে করেন।[56]

54 The Sealed Nectar (Biography of the Prophet) (ইংরেজি ভাষায়)। ২০০২।

55 Hamid, Abdul Wahid (১৯৯৫)। Companions of the Prophet (ইংরেজি ভাষায়)। MELS। পৃষ্ঠা ১৩৯।

56 "Umm Salamah: Story of an Immigrant Family"। About Islam (ইংরেজি ভাষায়)। ২০২১-০৮-০৯।

রায়হানা বিনত যায়েদ(রাঃ)

রায়হানা বিনত যায়েদ(রাঃ) বানু নাদির উপজাতির একজন ইহুদি মহিলা ছিলেন। ৬২৭ সালে বনু কুরাইজা উপজাতির পরাজয়ের পর তিনি অন্যদের সাথে দাসে ত্বরান্বিত হন।[57]

জয়নব বিনতে জাহশ(রাঃ)

জায়নাব বিনতে জাহশ(রাঃ) ছিলেন মুহাম্মাদ(সাঃ) এর চাচাতো বোন, তার বাবার এক বোনের মেয়ে। প্রাক ইসলামি যুগে, আরবরা উত্তরাধিকার এবং পবিত্রতার মতো অধিকারের ক্ষেত্রে, তাদের জৈবিক সন্তানদের মতো ঠিক একই পৃষ্ঠপোষকতা করা শিশুদের বিবেচনা করত।[58] যাইহোক, বিয়ের পরে পৃষ্ঠপোষক করা শিশুরা তাদের উত্তরাধিকারের অধিকার হারায় এবং তখন থেকে তাদের জৈবিক পিতামাতার সন্তান হিসাবে পরিচিত হয়। বয়ঃসন্ধিলাভের পর, তারা পৃষ্ঠপোষকীয় পরিবারের সাথে থাকতে পারেনি কিন্তু এখনও ভর্তুকি দেওয়া হয়েছিল। এটি পৃষ্ঠপোষক করা শিশুদের প্রতি জৈবিক শিশুদের শত্রুতা হ্রাস করা এবং প্রাপ্তবয়স্ক পৃষ্ঠপোষক মহিলাদের সাথে পুরুষ পৃষ্ঠপোষকদের মিশ্রণ রোধ করার কারণে।[59]

মদিনায় মুহাম্মাদ(সাঃ) তার দত্তক পুত্র জায়েদ ইবনে হারিসার(রাঃ) সাথে বিধবা জায়নাবের(রাঃ) বিবাহের ব্যবস্থা করেন। সিজার ই ফারাহ বলেছেন যে মুহাম্মাদ(সাঃ) গৃহীতদের বৈধতা এবং সমান আচরণের অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলেন।[60] জায়নাব(রাঃ) এই বিয়েকে অপছন্দ করেন এবং তার ভাইয়েরা তা প্রত্যাখ্যান করেন, কারণ ইবনে সা'দের মতে তিনি অভিজাত বংশের ছিলেন এবং জায়েদ(রাঃ) একজন প্রাক্তন ক্রীতদাস ছিলেন।[61] ওয়াট বলেছেন যে কেন জায়নাব(রাঃ) জায়েদকে(রাঃ) বিয়ে করতে রাজি ছিলেন না তা স্পষ্ট নয় কারণ মুহাম্মাদ(সাঃ) তাকে অত্যন্ত সম্মান করতেন। তিনি আরও বলেছেন যে জায়নাব(রাঃ) একজন উচ্চাভিলাষী মহিলা হওয়ায় ইতোমধ্যে মুহাম্মাদ(সাঃ) কে বিয়ে করার আশা করছেন; অথবা তিনি হয়তো এমন কাউকে বিয়ে করতে চেয়েছিলেন যার সম্পর্কে

---

57 কিতাবু তাবাকাতুল কুবরা; খন্ড ৮, পৃষ্টা ৯২-৯৩।

58 IslamKotob। Tafsir Ibn Kathir all 10 volumes (ইংরেজি ভাষায়)। IslamKotob।

59 The Sealed Nectar (Biography of the Prophet) (ইংরেজি ভাষায়)। ২০০২।

60 Farah, Caesar E. (১৯৮৭)। Islam: Beliefs and Observances (ইংরেজি ভাষায়)। Barron's। পৃষ্ঠা ৬৯।

61 Stowasser, Barbara Freyer (১৯৯৬)। Women in the Quran, traditions, and interpretation. (English ভাষায়)। New York; Oxford: Oxford University Press। পৃষ্ঠা ৮৮।

মুহাম্মাদ(সাঃ) রাজনৈতিক কারণে অপছন্দ করেছিলেন। মওদুদী মতে, কুরআনের ৩৩:৩৬ আয়াতটি[62] প্রকাশিত হওয়ার পর জায়নাব(রাঃ) জায়েদকে(রাঃ) সম্মতি দেন এবং বিয়ে করেন।

জায়নাবের(রাঃ) বিয়ে অসামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল।[63] ওয়াটের মতে, এটা প্রায় নিশ্চিত যে তিনি ৬২৬ সালের শেষের আগে মুহাম্মাদ(সাঃ) এর সাথে বিয়ের জন্য কাজ করছিলেন। "জায়নাব(রাঃ) তাড়াহুড়ো করে পোশাক পরেছিলেন যখন তাকে বলা হয়েছিল 'আল্লাহর রসূল দরজায় আছেন'। তিনি তাড়াহুড়ো করে লাফিয়ে উঠলেন এবং আল্লাহর রসূলের প্রশংসাকে উত্তেজিত করে উঠলেন, যাতে তিনি এমন কিছু বিড়বিড় করে ফিরে যান যা খুব কমই বোঝা যায়। কিন্তু, তিনি খুব আনন্দের সঙ্গে বলেছিলেন: 'সর্বশক্তিমান আল্লাহর মহিমা! মহিমা আল্লাহর, যিনি হৃদয়কে ঘুরিয়ে দেন!'[64] জায়নাব(রাঃ) জায়েদকে(রাঃ) এই বিষয়ে বলেছিলেন, এবং তিনি তাকে তালাক দেওয়ার প্রস্তাব দিয়েছিলেন, কিন্তু মুহাম্মাদ(সাঃ) তাকে রাখতে বলেছিলেন।[65] গল্পটি জায়নাবের(রাঃ) অনুভূত সৌন্দর্যের উপর অনেক চাপে রেখেছিল।[66] নোমানি এই গল্পটি গুজব বলে মনে করেন।[67] ওয়াট আখ্যানের এই অংশের নির্ভুলতা নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করে কারণ এটি প্রাথমিক উৎসে ঘটে না। তিনি মনে করেন যে যদিও আখ্যানের অন্তর্নিহিত সত্যের ভিত্তি থাকে, তবে এটি ট্রান্সমিশনের সময় অতিরঞ্জনের সাপেক্ষে হত কারণ পরবর্তী মুসলমানরা বজায় রাখতে পছন্দ করতেন যে ইসলামে কোনও ব্রহ্মচর্য এবং সন্ন্যাসী ছিল না। রডিনসন ওয়াটের সাথে একমত নন যে গল্পটি ঐতিহ্যবাহী গ্রন্থগুলিতে জোর দেওয়া হয়েছে এবং এটি কোনও বিরূপ মন্তব্য বা সমালোচনা জাগিয়ে তুলবে না।[68] এই গল্পটি বেশিরভাগ মুসলিম পণ্ডিতরা প্রত্যাখ্যান করেছেন প্রধানত বর্ণনার কোনও শৃঙ্খল না থাকার কারণে এবং কোনও খাঁটি হাদিস থেকে এর সম্পূর্ণ

62 "The Meaning of the Qur'an"। www.tafheem.net।

63 Stowasser, Barbara Freyer (১৯৯৬)। Women in the Quran, traditions, and interpretation. (English ভাষায়)। New York; Oxford: Oxford University Press। পৃষ্ঠা ৮৮।

64 Muḥammad ibn jarir Al-Ṭabarī; The Victory of Islam (ইংরেজি ভাষায়)। State University of New York Press। পৃষ্ঠা ২-৩।

65 Watt, W. Montgomery (২০১২-০৪-২৪)। "ʿĀʾisha Bint Abī Bakr"। Encyclopaedia of Islam, Second Edition (ইংরেজি ভাষায়)। Brill।

66 Rodinson, Maxime (২০০২)। Muhammad: Prophet of Islam (ইংরেজি ভাষায়)। I.B. Tauris। পৃষ্ঠা ২০৭।

67 Nu'mānī, Shiblī (১৯৭৯)। Sirat-un-nabi: the life of the Prophet (English ভাষায়)। Delhi, India: Idarah-i Adabiyat-i Delli।

68 Rodinson, Maxime (২০০২)। Muhammad: Prophet of Islam (ইংরেজি ভাষায়)। I.B. Tauris। পৃষ্ঠা ২০৭।

অনুপস্থিতির কারণে। কিছু মন্তব্যকারী এটা অযৌক্তিক বলে মনে করেছেন যে মুহাম্মাদ(সাঃ) সারা জীবন তাকে জানার পর একদিন হঠাৎ করে জায়নাবের(রাঃ) সৌন্দর্য সম্পর্কে সচেতন হবেন; যদি তার সৌন্দর্য তাকে বিয়ে করার কারণ হত, তবে সে জায়েদকে(রাঃ) তার বিয়ের ব্যবস্থা না করে প্রথমেই তাকে বিয়ে করত।[69]

মুহাম্মাদ(সাঃ) জনমতের ভয়ে প্রথমে জায়নাবকে(রাঃ) বিয়ে করতে অনিচ্ছুক ছিলেন। এই বিয়ে তাদের সমসাময়িকদের কাছে অজাচার বলে মনে হবে কারণ তিনি তার দত্তক পুত্রের প্রাক্তন স্ত্রী ছিলেন, এবং দত্তক পুত্রদের জৈবিক পুত্র হিসাবে একই হিসাবে বিবেচনা করা হত।[70] ওয়াটের মতে, "অজাচারের এই ধারণাটি পারিবারিক প্রতিষ্ঠানগুলির একটি নিম্ন, সাম্প্রদায়িক স্তরের পুরানো অনুশীলনের সাথে আবদ্ধ ছিল যেখানে একটি শিশুর পিতৃত্ব নিশ্চিতভাবে জানা যায়নি; এবং এই নিম্ন স্তরটি ইসলাম দ্বারা নির্মূল করা হচ্ছিল।" কিন্তু, কুরআন ৩৩:৩৭ এই ইঙ্গিত দেয় যে, এই বিবাহ আল্লাহর দ্বারা তাঁর উপর চাপিয়ে দেওয়া কর্তব্য। এটি বোঝায় যে দত্তক নেওয়া পুত্রদের প্রকৃত পুত্র হিসাবে গণ্য করা আপত্তিকর এবং অতীতের সাথে এখন সম্পূর্ণ বিরতি থাকা উচিত। এইভাবে মুহাম্মাদ(সাঃ), আত্মবিশ্বাসী যে তিনি জনমতের মুখোমুখি হওয়ার জন্য যথেষ্ট শক্তিশালী ছিলেন, এই ট্যাবুগুলি প্রত্যাখ্যান করতে এগিয়ে যান। যখন জায়নাবের অপেক্ষার সময় শেষ হয়, তখন মুহাম্মাদ(সাঃ) তাকে বিয়ে করেন। মদিনার একটি প্রভাবশালী দল, যাকে "মুনাফিক" বলা হত, এই শব্দটি তাদের বোঝায় যারা গোপনে ইসলামিক ঐতিহ্যের[71] বিরুদ্ধে কাজ করার সময় ইসলাম গ্রহণ করে,[72] তারা সত্যিই এই বিবাহকে অজাচার বলে সমালোচনা করেছে।[73] মুসলিম সম্প্রদায়কে বিভক্ত করার চেষ্টা করে, তারা মুহাম্মাদ(সাঃ) কে তার স্ত্রীদের মাধ্যমে আক্রমণ করার কৌশলের অংশ হিসাবে গুজব ছড়িয়ে দেয়।[74] ইবনে কাসিরের মতে,

---

69 "The Prophet's Marriage to Zaynab bint Jahsh | IslamToday – English"

70 Watt, W. Montgomery (২০১২-০৪-২৪)। "ʿĀʾi<u>sh</u>a Bint Abī Bakr"। Encyclopaedia of Islam, Second Edition (ইংরেজি ভাষায়)। Brill।

71 Stowasser, Barbara Freyer (১৯৯৬)। Women in the Quran, traditions, and interpretation. (English ভাষায়)। New York; Oxford: Oxford University Press। পৃষ্ঠা ৮৯।

72 "Hypocrite – Oxford Islamic Studies Online"। web.archive.org।

73 Watt, W. Montgomery (২০১২-০৪-২৪)। "ʿĀʾi<u>sh</u>a Bint Abī Bakr"। Encyclopaedia of Islam, Second Edition (ইংরেজি ভাষায়)। Brill।

74 Stowasser, Barbara Freyer (১৯৯৬)। Women in the Quran, traditions, and interpretation. (English ভাষায়)। New York; Oxford: Oxford University Press। পৃষ্ঠা ৮৯।

প্রাসঙ্গিক কুরআনের আয়াতগুলো ছিল মুনাফিকদের আপত্তির "ঐশ্বরিক প্রত্যাখ্যান"।[75] রডিনসনের মতে, সন্দেহভাজনরা যুক্তি দেখিয়েছিল যে আয়াতগুলি সামাজিক নিষিদ্ধতার সাথে সঠিক দ্বন্দ্বে রয়েছে এবং মুহাম্মাদ(সাঃ) কে খুব বেশি অনুগ্রহ করেছে। এই আয়াতগুলো বিতরণের ফলে ভিন্নমতের অবসান হয়নি।[76]

জুওয়াইরিয়া বিনতে আল-হারিস(রাঃ)

বানু মুস্তালিকের সাথে সংঘর্ষের অন্যতম বন্দী ছিলেন জুওয়াইরিয়া বিনতে আল-হারিস(রাঃ), যিনি এই গোত্রের প্রধানের কন্যা ছিলেন। তার স্বামী মুস্তাফা বিন সাফওয়ান যুদ্ধে নিহত হয়েছিলেন। তিনি প্রাথমিকভাবে মুহাম্মাদের সঙ্গী তুবিত ইবনে কায়স ইবনে আল-শাম্মাসের মধ্যে পড়ে যান। দাস ত্বরান্বিত হওয়ার পর, জুওয়ারিয়া মুহাম্মাদ(সাঃ) এর কাছে গিয়ে অনুরোধ করেন যে তিনি - মুস্তালিকের প্রভুর কন্যা হিসাবে - মুক্তি পেতেন, কিন্তু তিনি তা প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। এদিকে, তার বাবা তার মুক্তির জন্য মুক্তিপণ নিয়ে মুহাম্মাদ(সাঃ) এর কাছে যান, কিন্তু মুহাম্মাদ(সাঃ) তখনও তাকে মুক্তি দিতে অস্বীকার করেন। এরপর মুহাম্মাদ(সাঃ) তাকে বিয়ে করার প্রস্তাব দেন এবং তিনি তা গ্রহণ করেন। যখন জানা যায় যে, এই বিয়ের মাধ্যমে মুস্তালিকের উপজাতিরা ইসলামের নবীর আত্মীয় হবে, তখন মুসলমানরা তাদের বন্দীদের মুক্তি করে দিতে শুরু করে। এভাবে মুহাম্মাদ(সাঃ) এর বিবাহের ফলে প্রায় একশো পরিবারের স্বাধীনতা হয় যাদের তিনি সম্প্রতি দাস ত্বরান্বিত করেছিলেন।

সাফিয়া বিনতে হুয়াই ইবনে আখতাব(রাঃ)

সাফিয়া বিনতে হুয়াই(রাঃ) একজন অভিজাত মহিলা ছিলেন, যিনি ইহুদি উপজাতি বানু নাদিরের প্রধান হুয়াই ইবনে আখতাবের কন্যা ছিলেন, যাকে পরিখার যুদ্ধে আত্মসমর্পণের পর মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছিল। তিনি প্রথমে কবি সাল্লাম ইবনে মিশকামের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন, যিনি তাকে তালাক দিয়েছিলেন, এবং দ্বিতীয়ত, তিনি কেনানা ইবনে আল-রাবিকে বিয়ে করতে বাধ্য হন, যিনি একজন সেনাপতি। ৬২৮ সালে খন্দকের যুদ্ধে বানু নাদির পরাজিত হন, তার স্বামীকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয় এবং তাকে বন্দী হিসেবে গ্রহণ করা হয়। মুহাম্মাদ(সাঃ) তাকে তার বন্দী দিহিয়া থেকে মুক্তি দেন এবং বিয়ের প্রস্তাব দেন, যা সাফিয়া(রাঃ) গ্রহণ করেন।

---

[75] Stowasser, Barbara Freyer (১৯৯৬)। Women in the Quran, traditions, and interpretation. (English ভাষায়)। New York; Oxford: Oxford University Press। পৃষ্ঠা ৮৯।

[76] Rodinson, Maxime (২০০২)। Muhammad: Prophet of Islam (ইংরেজি ভাষায়)। I.B. Tauris। পৃষ্ঠা ২০৭।

একটি হাদিস অনুসারে, মুহাম্মাদ(সাঃ) এর সমসাময়িকরা বিশ্বাস করতেন যে সাফিয়ার উচ্চ মর্যাদার কারণে, কেবল মাত্র তাকে মানু বাদ দেওয়া এবং মুহাম্মাদ(সাঃ) এর সাথে বিয়ে করার উপযুক্ত ছিল। আধুনিক পণ্ডিতরা বিশ্বাস করেন যে মুহাম্মাদ(সাঃ) ইহুদি উপজাতির সাথে পুনর্মিলনের অংশ হিসাবে এবং সদিচ্ছার অঙ্গীকার হিসাবে সাফিয়াকে(রাঃ) বিয়ে করেছিলেন। জন এল এসপোসিতো বলেছেন যে এই বিয়ে রাজনৈতিক হতে পারে। হাইকাল অভিমত ব্যক্ত করেন যে, সাফিয়ার(রাঃ) সাথে মুহাম্মাদ(সাঃ) এর অভিপ্রায় এবং বিবাহ আংশিকভাবে তার দুঃখজনক ঘটনা দূর করার জন্য এবং আংশিকভাবে তাদের মর্যাদা রক্ষার জন্য ছিল, এবং এই কাজগুলি পূর্ববর্তী বিজয়ীদের সাথে তুলনা করে যারা রাজাদের কন্যা ও স্ত্রীদের বিবাহ করেছিল যাদের তারা পরাজিত করেছিল। কারও কারও মতে, সাফিয়াহকে(রাঃ) বিয়ে করে মুহাম্মাদ(সাঃ) ইহুদি ও ইসলামের মধ্যে শত্রুতা দূর করার লক্ষ্যে। মুহাম্মাদ(সাঃ) সাফিয়াকে(রাঃ) ইসলাম গ্রহণে রাজি করান। আবু ইয়ালা আল-মাওসিলির মতে, সাফিয়া(রাঃ) মুহাম্মাদ(সাঃ) তাকে যে ভালবাসা ও সম্মান দিয়েছেন তার প্রশংসা করতে এসেছিলেন এবং বলেছিলেন, "আমি কখনও একজন ভাল স্বভাবের ব্যক্তিকে আল্লাহর রসূল হিসেবে দেখিনি"। সাফিয়াহ(রাঃ) মারা যাওয়ার আগ পর্যন্ত মুহাম্মাদ(সাঃ) এর প্রতি অনুগত ছিলেন।

ইসলামী ঐতিহ্য অনুসারে, সাফিয়া(রাঃ) ছিলেন সুন্দরী, ধৈর্যশীল, বুদ্ধিমান, বিজ্ঞ ও ভদ্র এবং তিনি মুহাম্মাদ(সাঃ) কে "আল্লাহর রসূল" বলে শ্রদ্ধা করতেন। মুসলিম পণ্ডিতরা বলেন যে তার অনেক ভাল নৈতিক গুণ ছিল। তাকে একজন নম্র উপাসক এবং ধার্মিক বিশ্বাসী হিসাবে বর্ণনা করা হয়। ইবনে কাসির বলেন, "তিনি তার উপাসনা, ধার্মিকতা, তপসিলা, ধর্মনিষ্ঠা এবং দান-ধ্যানের অন্যতম সেরা নারী ছিলেন"। ইবনে সা'দের মতে, সাফিয়াহ খুব দাতব্য এবং উদার ছিলেন। তিনি যা কিছু ছিল তা ছেড়ে দিতেন এবং ব্যয় করতেন; তিনি জীবিত থাকাকালীন তার কাছে থাকা একটি বাড়ি দিয়েছিলেন।

মুহাম্মাদ(সাঃ) এর পরিবারে প্রবেশের পর সাফিয়া(রাঃ) আইশা(রাঃ) ও হাফসার(রাঃ) সাথে বন্ধুত্ব করেন। এছাড়াও, তিনি ফাতিমাকে(রাঃ) উপহার দিয়েছিলেন। তিনি মুহাম্মাদ(সাঃ) এর অন্যান্য স্ত্রীদের কিছু উপহার দিয়েছিলেন তার রত্ন থেকে যা তিনি খাইবার থেকে তার সাথে নিয়ে এসেছিলেন। কিন্তু, মুহাম্মাদ(সাঃ) এর অন্য কয়েকজন স্ত্রী সাফিয়ার(রাঃ) ইহুদি বংশদ্ভুত হওয়ার কারণে খারাপ কথা বলেছিলেন। মুহাম্মাদ(সাঃ) সাফিয়াহকে(রাঃ) বলেনঃ

"আমার পূর্বপুরুষ মুসা ছিলেন একজন নবী, তাঁর ভাই হারুন একজন নবী ছিলেন এবং আমার স্বামী (মুহাম্মাদ(সাঃ)) একজন নবী ছিলেন"

মুহাম্মাদ(সাঃ) একবার তার সমস্ত স্ত্রীদের সাথে হজ্জে গিয়েছিলেন। পথে সাফিয়ার(রাঃ) উট হাঁটু গেড়ে বসল, কারণ এটি কাফেলায় সবচেয়ে দুর্বল ছিল এবং সে কাঁদতে শুরু করল। মুহাম্মাদ(সাঃ) তার কাছে এসে তার পোশাক এবং হাত দিয়ে তার চোখের জল মুছছিলেন, কিন্তু তিনি যত তাকে কাঁদতে বারণ করেছিলেন, ততই তিনি কাঁদতে লাগলেন। মুহাম্মাদ(সাঃ) যখন মারাত্মক অসুস্থ ছিলেন, তখন সাফিয়া(রাঃ) গভীরভাবে বিচলিত হয়েছিলেন। তিনি তাকে বলেছিলেন "আমি যদি তোমার পরিবর্তে কষ্ট পেতাম।"[77]

রমলা বিনতে আবি সুফিয়ান (উম্মে হাবিবা)(রাঃ)

একই বছর মুহাম্মাদ(সাঃ) তার মক্কীয় শত্রুদের সাথে একটি শান্তি চুক্তি স্বাক্ষর করেন, কুরাইশ কার্যকরভাবে দুই পক্ষের মধ্যে যুদ্ধের অবস্থার অবসান ঘটায়। তিনি শীঘ্রই কুরাইশ নেতা এবং সামরিক সেনাপতি আবু সুফিয়ান ইবনে হারবের কন্যাকে বিয়ে করেন, যার লক্ষ্য ছিল তার বিরোধীদের আরও সমন্বয় সাধন করা। তিনি রামলা বিনতে আবি সুফিয়ানের(রাঃ) কাছে বিয়ের প্রস্তাব পাঠান, যিনি সেই সময় আবিসিনিয়ায় ছিলেন যখন তিনি জানতে পারেন যে তার স্বামী মারা গেছেন। তিনি এর আগে মক্কায় তার বাবার ইচ্ছার বিরুদ্ধে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। আবিসিনিয়ায় অভিবাসনের পর তার স্বামী খ্রিস্টধর্মে ধর্মান্তরিত হন।[78] মুহাম্মাদ(সাঃ) আমর বিন ওমাইয়া আদ-দামরিকে নেগুসের (রাজা) কাছে একটি চিঠি দিয়ে প্রেরণ করেন, তার কাছে উম্মে হাবিবার হাত চেয়েছিলেন — এটি আল-হিজরীর সপ্তম বছরে মুহররামে ছিল।

মায়মুনা বিনতি আল-হারিস(রাঃ)

হুদায়বিয়াহ চুক্তির অংশ হিসেবে মুহাম্মাদ(সাঃ) কম তীর্থযাত্রার জন্য মক্কা সফর করেন। সেখানে মায়মুনা বিনতে আল-হারিস(রাঃ) তাকে বিয়ের প্রস্তাব দেন। মুহাম্মাদ(সাঃ) গ্রহণ করেন এবং এভাবে তার দীর্ঘদিনের মিত্র আব্বাসের ভাবী মায়মুনাকে(রাঃ) বিয়ে করেন। তাকে বিয়ে করে মুহাম্মাদ(সাঃ) তার পূর্ববর্তী প্রতিপক্ষ বানু মাখজুমের সাথে আত্মীয়তার সম্পর্কও স্থাপন করেন। যেহেতু মক্কাবাসীরা তাকে আর থাকতে দেয়নি, তাই

77 "islamstory | Islamic History Portal | SAFIYYA bint Huyayy"। islamstory.com (ইংরেজি ভাষায়)।

78 "IslamOnline NET | Islam | Islamic | Islamic News | Islamaphobia | Fatwa | Islamic Finance"। *www.islamonline.com*।

মুহাম্মাদ(সাঃ) মায়মুনাকে(রাঃ) তার সাথে নিয়ে শহর ছেড়ে চলে যান। তার মূল নাম ছিল "বারা" কিন্তু তিনি তাকে "মায়মুনা" বলে অভিহিত করেছিলেন, যার অর্থ ধন্য, কারণ তার সাথে তার বিয়েও সাত বছরের মধ্যে প্রথমবারের মতো চিহ্নিত হয়েছিল যখন তিনি তার শহর মক্কায় প্রবেশ করতে পারেন।

মারিয়া আল-কিবতিয়া(রাঃ)

মারিয়া আল-কিবতিয়া(রাঃ) ছিলেন একজন মিশরীয় কপ্টিক খ্রিস্টান দাসী, যাকে বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যের অধীনস্থ মিশরীয় সম্রাট মুকাউকিস মুহাম্মাদ(সাঃ) এর নিকট উপহার হিসাবে প্রদান করেন।[79] মদিনায় ফেরার পথে মারিয়া(রাঃ) ইসলাম গ্রহণ করেন এবং মুহাম্মাদ(সাঃ) তাকে মুক্ত করে স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করেন। তিনি ইব্রাহিম ইবনে মুহাম্মাদ নামে মুহাম্মাদ(সাঃ) এর একটি সন্তানের জন্ম দেন, যে কিনা শিশুকালেই মারা যায়। কিছু কিছু সূত্র অনুযায়ী ইব্রাহিমকে জন্ম দেয়ার পর থেকে মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত পরবর্তী পাঁচ বছর তিনি দাসত্ব থেকে মুক্ত ছিলেন।[80] ইবনে কায়িম আল-যাওজিয়া সহ আরও বহু সূত্র দাবি করে যে, তিনি মুহাম্মাদ(সাঃ) এর একজন উপপত্নী ছিলেন,[81][82] অর্থাৎ তিনি মুহাম্মাদ(সাঃ) এর কৃতদাসী ছিলেন কিন্তু স্ত্রী নয়। এর কারণ ইসলামী আইন মুসলিম পুরুষদেরকে দেনমোহর প্রদানকৃত বিবাহিত নিজ স্ত্রী এবং নিজ অধিকৃত দাসীদের সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক করার অনুমতি দেওয়ায়, তিনি দাসী হয়েও মুহাম্মাদ(সাঃ) এর স্ত্রীগণের পাশাপাশি তার পরিবারের সদস্য ছিলেন। ইবনে ইসহাক রচিত মুহাম্মাদ(সাঃ) এর জীবনী হতে সম্পাদিত ইবনে হিশামের সংকলনে তাকে মুহাম্মাদ(সাঃ) এর স্ত্রীগণের তালিকায় উল্লেখ করা হয় নি।[83] তবে বেশ কিছু

---

79 A. Guillaume (১৯৫৫), পৃষ্ঠা ৬৫৩

80 ইবনে ইসহাক, The Life of Muhammad (Peace Be Upon Him), পৃষ্ঠা ৬৫৩.

81 Exegesis (Tafsir) of Quran by ibn Kathir for Chapter 66, verses 1-5 of Quran

82 Zaad al-Ma'aad, 1/103

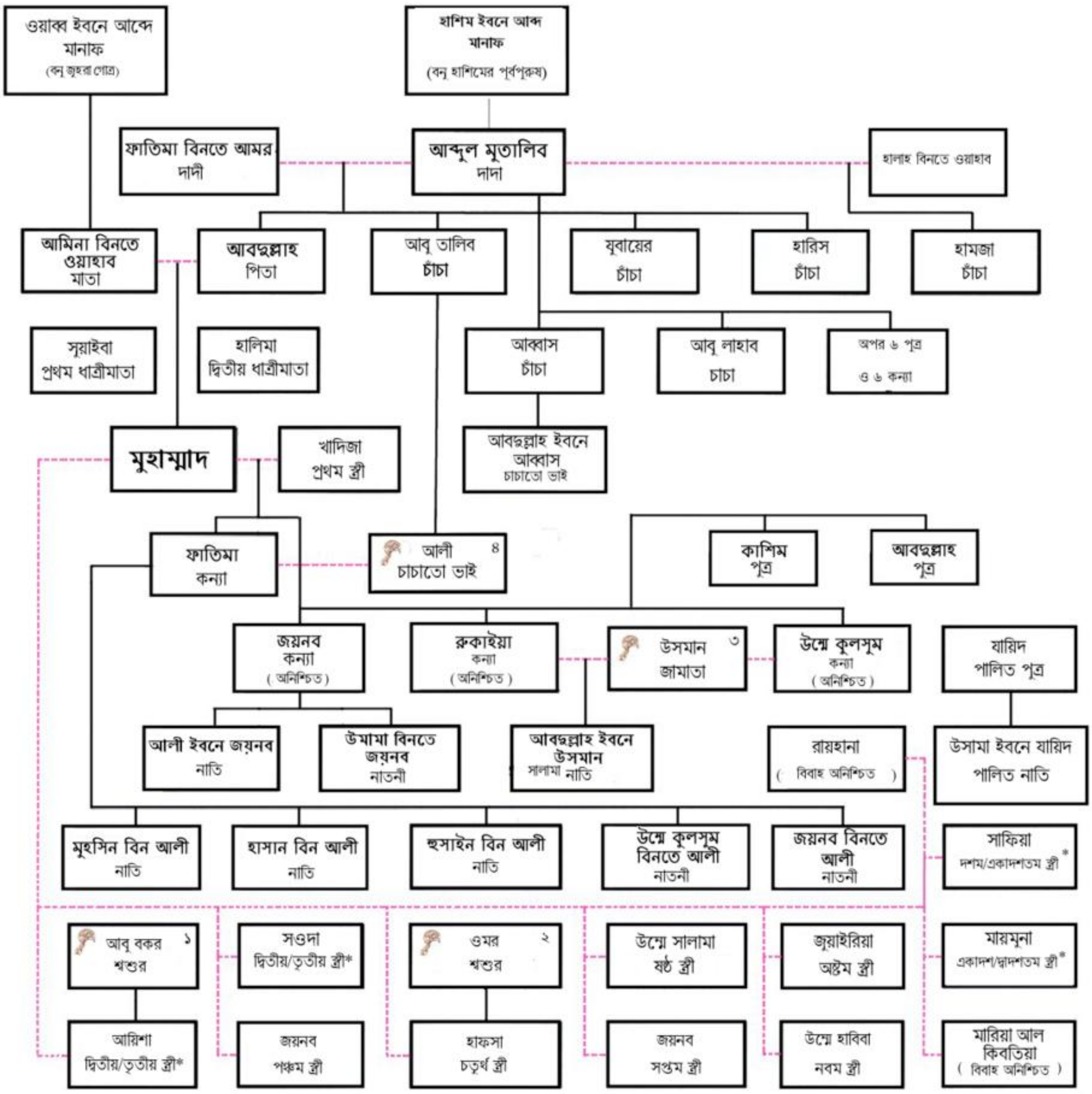
83 ইবনে ইসহাক, The Life of Muhammad, পৃষ্ঠা ৭৯২.

সহিহ হাদিস ও ঐতিহাসিক গ্রন্থের তথ্য অনুযায়ী তিনি মুহাম্মাদ(সাঃ) এর স্ত্রী ছিলেন।[84][85]

84 The History of al-Tabari Vol. 9: The Last Years of the Prophet: The Formation of the State A.D. 630-632/A.H. 8-11 (ইংরেজি ভাষায়)। SUNY Press। ২০১৫-০৬-১৫। পৃষ্ঠা ১৩৭।God granted Rayhanah bt. Zayd of the Banu Qurayzah to his Messenger. Mariyah the Copt was presented to the Messenger of God, given to him by al-Muqawqis, the ruler of Alexandria, and she gave birth to the Messenger of God's son Ibrahim. These were the messenger of god's wifes, six of them were from the Quraysh."

85 Ibn Kathir। "Maria al-Qibtiyya"। *Mohammads Life: The Wifes of the Prophet Muhammad*। al-Azhar; Mohammad Gemeiah কর্তৃক অনূদিত। Maria al-Qibtiyya is said to have married the Prophet and certainly everyone gave her the same title of respect as the Prophet's wives, 'Umm al Muminin' 'Mother of the Believers'"

মুহাম্মাদের বংশতালিকা



সরাসরি বংশসূত্র **মোটাহরফে** চিহ্নিত হয়েছে।

* চিহ্ন নির্দেশ করে যে বৈবাহিক ক্রম নিশ্চিত নয়।

রাশিদুন খলিফাগণ।

[86]

86 https://en.wikipedia.org/wiki/Wives_of_Muhammad

এক নজরে উম্মাহাতুল মুমিনীনদের পরিচয়

নাম	গোত্র	বিবাহের পূর্বের অবস্থা	বিবাহের সময় বয়স	মন্তব্য	বিবাহের তারিখ	মৃত্যুর তারিখ
খাদিজা বিনতু খুওয়াইলিদ(রাঃ)	বনু আসাদ	বিধবা	৪০	প্রথম বিয়ে এবং নবুয়াত প্রাপ্তির আগে একমাত্র বিয়ে	৫৯৫	৬১৯
সাওদা বিনতে জামআ(রাঃ)	বনু আব্দু শাম্স	বিধবা	৬৫	বৃদ্ধ, গরিব এবং বিধবা; আবিসিনিয়া হিজরতের পর	৬১৯-এর পরপর	মুহাম্মাদ(সাঃ) এর মৃত্যুর পর
আয়েশা বিনতু আবু বকর(রাঃ)	বনু তাইম	কুমারী	৯ (মতান্তর: বিয়ের সময় আয়েশার বয়স)	মুহাম্মাদ(সাঃ) এর সাথে পারিবারিক সম্পর্ক স্থাপনের জন্য আবু বকর তার মেয়েকে বিয়ে দেন।	৬২২	মুহাম্মাদ(সাঃ) এর মৃত্যুর পর
হাফসা বিনতে উমর(রাঃ)	বনু আদি	বিধবা		উমরের সাথে সম্পর্ক স্থাপনের উদ্দেশ্যে তার মেয়েকে	৬২৪-৬২৫	মুহাম্মাদ(সাঃ) এর মৃত্যুর পর

নাম	গোত্র	বিবাহের পূর্বের অবস্থা	বিবাহের সময় বয়স	মন্তব্য	বিবাহের তারিখ	মৃত্যুর তারিখ
জয়নব বিনতু খুযায়মা(রাঃ)		বিধবা			৬২৬ – ৬২৭	বিয়ের পরপরই
উম্মে সালামা হিন্দ বিনতু আবি উমাইয়া(রাঃ)	বনু উমাইয়া	উহুদ যুদ্ধে বিধবা হন	প্রায় ৬৫	সাহায্যের জন্য, ৪ জনের জননী ছিলেন	৬২৬	মুহাম্মাদ(সাঃ) এর মৃত্যুর পর
রায়হানা বিনতে জায়েদ(রাঃ)	বনু নাদির					
জয়নব বিনতে জাহশ(রাঃ)		তালাকপ্রাপ্ত এবং বিধবা			৬২৫–৬২৭	মুহাম্মাদ(সাঃ) এর মৃত্যুর পর
জুওয়াইরিয়া বিনতে আল-হারিস(রাঃ)	বনু মুস্তালিক	বিধবা; মা মালাকাত আইমানুকুম-এর আওতায়।			৬২৭–৬২৮	মুহাম্মাদ(সাঃ) এর মৃত্যুর পর
রামালাহ বিনতে আবি সুফিয়ান(রাঃ)	বনু উমাইয়া	আবু সুফিয়ানের কন্যা। প্রথম উমাইয়া খলিফা মুয়াবিয়া'র বোন। তালাকপ্রাপ্ত, তার স্বামী আবিসিনিয়ায় খ্রিস্টান হয়ে যায়।		সাহায্য	৬২৯	মুহাম্মাদ(সাঃ) এর মৃত্যুর পর

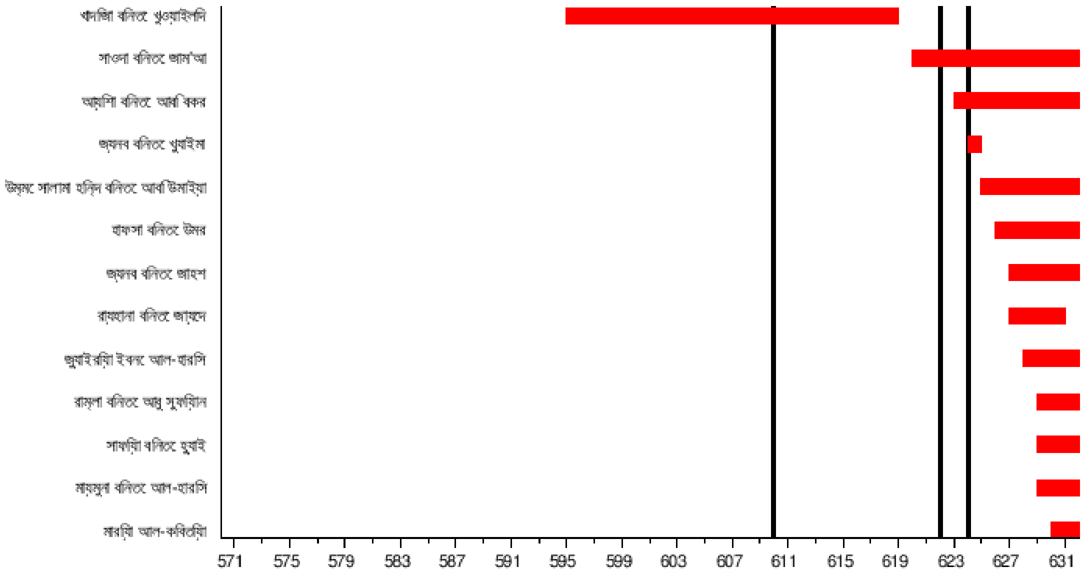
নাম	গোত্র	বিবাহের পূর্বের অবস্থা	বিবাহের সময় বয়স	মন্তব্য	বিবাহের তারিখ	মৃত্যুর তারিখ
সাফিয়া বিনতে হুওয়াই(রাঃ)	বনু নাদির	বিধবা; মা মালাকাত আইমানুকুম-এর আওতায়।			৬২৯	মুহাম্মাদ(সাঃ) এর মৃত্যুর পর
মায়মুনা বিনতে আল-হারিস(রাঃ)		বিধবা	২৬		৬২৯	মুহাম্মাদ(সাঃ) এর মৃত্যুর পর
মারিয়া আল-কিবতিয়া(রাঃ)	মিশরীয়			মিশরের সম্রাট মুকাউকিসের পক্ষ হতে মুহাম্মাদ(সাঃ) জন্য উপহার	৬২৮-৬২৯	মুহাম্মাদ(সাঃ) এর মৃত্যুর পর

[87]

87 https://en.wikipedia.org/wiki/Wives_of_Muhammad

বিবাহের সময়রেখা

দ্রষ্টব্যঃ কিছু উৎস এই তারিখগুলোতে একমত নয়, তবে বেশিরভাগ উৎসই এটিতে একমত।



[88]

লেখচিত্রের উলম্ব রেখাগুলো পর্যায়ক্রমিকভাবে নবুয়াত, হিজরত এবং বদরের যুদ্ধকে নির্দেশ করে।

রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সন্তানগন

মুহাম্মাদ(সাঃ) এর সন্তানদের মধ্যে রয়েছে ৩জন পুত্র ও ৪জন কন্যা।[89] সাধারণ দৃষ্টিভঙ্গি হল সবাই মুহাম্মাদের(সাঃ) প্রথম স্ত্রী খাদিজা বিনতে খুওয়ালিদের(রাঃ) গর্ভে জন্মগ্রহণ করেছিলেন,[90] কেবল একটি পুত্রসন্তান ব্যতীত, যিনি মারিয়া আল-কিবতিয়ার(রাঃ) গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন।[91] যাইহোক, এটাও প্রস্তাব করা হয়েছে যে

---

88 https://en.wikipedia.org/wiki/Wives_of_Muhammad

89 Haykal, Muḥammad Ḥusayn (১৯৯৪)। The Life of Muhammad (ইংরেজি ভাষায়)। The Other Press। পৃষ্ঠা 76–77.

90 Gwynne, Paul (২০১৩-১২-২৩)। Buddha, Jesus and Muhammad: A Comparative Study (ইংরেজি ভাষায়)। Wiley। According to Sunni Islam, Khadija bore Muhammad four daughters (Zaynab, Ruqayya, Umm Kulthum and Fatima) and two sons ('Abdallah and Qasim). 65 Sadly, bothboys died intheir early childhood. Khadija's consolation and support were ...”

91 None (২০০৮)। The Oxford encyclopedia of women in world history। Internet Archive। Oxford [England] ; New York : Oxford University Press। পৃষ্ঠা ১৭।

মুহাম্মাদ(সাঃ) তিন কন্যাকে আসলে দত্তক নিয়েছিলেন।[92][93] মুহাম্মাদের(সাঃ) একটি দত্তক পুত্র ছিল যায়েদ ইবনে হারেসা(রাঃ)।[94]

কালানুক্রমিকভাবে মুহাম্মাদের(সাঃ) সন্তানরা ছিলঃ

- কাসিম ইবনে মুহাম্মাদ (৫৯৮ খ্রি. – ৬০১ খ্রি.)(৩ বছর বয়সে)
- জয়নব বিনতে মুহাম্মাদ (৫৯৯ খ্রি. – ৬২৯ খ্রি.)(৩০ বছর)
- রুকাইয়াহ বিনতে মুহাম্মাদ (৬০১ খ্রি. – ৬২৪ খ্রি.)(২৩ বছর)
- উম্মে কুলসুম বিনতে মুহাম্মাদ (৬০৩ খ্রি. – ৬৩০ খ্রি.)(২৭ বছর)
- ফাতিমা বিনতে মুহাম্মাদ(রাঃ) (বিতর্কিত জন্মতারিখ), (৬০৫ খ্রি. – ৬৩২ খ্রি.)(২৭ বছর)
- আব্দুল্লাহ ইবনে মুহাম্মাদ, (মৃত্যু : ৬১৫ খ্রি.)
- ইব্রাহিম ইবনে মুহাম্মাদ, (৬৩০ খ্রি. – ৬৩২ খ্রি.)(২ বছর)

এরা সবাই অপেক্ষাকৃত অল্প বয়সে মারা গেছেন; ২–৩০ বছরের মধ্যে।[95]

নবুওয়াত-পূর্ব সংক্ষিপ্ত জীবন

গোটা বিশ্ব মানবতার প্রতিটি স্তরের মানুষের মধ্যে যে সকল গুণ ও বৈশিষ্ট্য রয়েছে এর সবগুলোর সমন্বয় ঘটেছিল নবীয়ে দোজাহান সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর চরিত্রের মধ্যে। তিনি ছিলেন সুস্থ চিন্তা ভাবনা আর সরল দৃষ্টিভঙ্গির এক সমুন্নত আলোর মিনার। সুন্দর বুদ্ধিমত্তা, মৌলিক চিন্তা ও গবেষণা আর উপায় ও উপকরণের দ্বায়িত্বশীলতা ইত্যদি গুণাবলি নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর মধ্যে পরিপূর্ণরূপে বিদ্যমান ছিল। তিনি তার প্রলম্বিত নিশ্চুপ থাকার দ্বারা ধারাবাহিক ভাবনা, ফিকিরের পেছনে পূর্ণ মনোযোগী হওয়া আর সত্যকে রক্ষার কাজে সহায়তা নিয়েছিলেন। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আপন উর্বর বুদ্ধিমত্তা আর

---

92 Abbas, Hassan (২০২১-০২-২৩)। The Prophet's Heir: The Life of Ali ibn Abi Talib (ইংরেজি ভাষায়)। Yale University Press। পৃষ্ঠা ৩৩।

93 de-Gaia, Susan (২০১৮-১১-১৬)। Encyclopedia of Women in World Religions: Faith and Culture across History [2 volumes] (ইংরেজি ভাষায়)। ABC-CLIO। পৃষ্ঠা ৫৬।

94 Hazleton, Lesley (২০১৩-০৪-০৪)। The First Muslim: The Story of Muhammad (ইংরেজি ভাষায়)। Atlantic Books Ltd। পৃষ্ঠা ৬৭–৬৮।

95 "নবীজি (সা.)-এর সন্তান-সন্তুতি"। কালের কণ্ঠ।

বিশুদ্ধ বিচক্ষণতার দ্বারা পূর্ণ মনোযোগের সঙ্গে জীবনের ডাইরির পৃষ্ঠাগুলো অধ্যয়ন করেছিলেন। তিনি মানুষের কর্ম তৎপরতা ও লোকদের অবস্থার পূর্ণ নিরীক্ষণ করেছিলেন। এভাবে সে যুগে যত কুসংস্কার বাসা বেঁধেছিল তিনি তা ঘূর্ণা করতেন এবং নিজেও তা থেকে দূরে থাকতেন। এরপর নিজের ও তাদের কাজকর্মের পূর্ণ বিচক্ষণতার সঙ্গে তাদের মধ্যে জীবন সফরের প্রতিটি মনযিল পাড়ি দিয়েছিলেন। অর্থাৎ, মানুষের মধ্যে যে ভালো কাজটি হতো তাতে তিনি অংশ নিতেন[96] আর এর বিপরীতে কোনো খারাপ কাজ হলে তিনি তাঁর চিরাচরিত ঠিকানা ঘর কিংবা মনের নির্জনতাকে ইখতেয়ার করতেন। তিনি মদ্যপান করতেন না। মূর্তির বেদিতে বলিকৃত পশুর গোশত খেতেন না। মূর্তির পায়ের কাছে জড়ো হয়ে কোনো ধরনের কোনো অনুষ্ঠান করতেন না। বরং তিনি তাঁর জীবনের প্রথম দিন থেকে শুরু করেই এই মিথ্যা ও বাতিল মাবুদগুলোকে প্রচণ্ড ঘৃণা করতেন। এমনকি গোটা পৃথিবীতে তাঁর কাছে এর চেয়ে অধিকতর ঘৃণিত বস্তু দ্বিতীয়টি আর ছিল না। লাত ও উয্যার নামে শপথ খাওয়ার কথাও তিনি শুনতে পারতেন না।[97] সন্দেহ নেই তকদীর সর্বদাই রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ওপর হেফাযত ও সুরক্ষার নিশ্ছিদ্র চাদর ছড়িয়ে রেখেছিল। সুতরাং, যখন পার্থিব কোনো ভোগ বিলাসের বাসনা হৃদয়ে আন্দোলন আর আলোড়নের ঝড় বইয়ে দিত, যখন অপছন্দীয় কোনো কাজের অনুসরণের মধ্যে হৃদয়ে তৃপ্তি খুঁজে পাওয়া শুরু করত। ঠিক তখনই স্বীয় মালিকের পূর্ণ মনোযোগ আর দৃষ্টি তাঁর ও সেগুলোর মাঝে প্রাচীর হয়ে দাঁড়াত। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, জাহেলিয়াতের যুগে মানুষ যা কিছু করত, আমি জীবনে কেবল দুই বার সেগুলি করার ইচ্ছা করেছিলাম। কিন্তু প্রত্যেকবারই আমার আল্লাহ তাআলা আমার ও সেগুলোর মাঝে প্রাচীর হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। এরপর আমি নবুওত ও রিসালত পাওয়ার আগ পর্যন্ত কোনো দিনও এ ধরনের কোনো কাজ দ্বিতীয় বার করার ইচ্ছা করিনি। সেই ঘটনাদুটো ছিল : মক্কার পাহাড়ে যে বালকটি আমার সঙ্গে বকরি চরাত, এক রাতে আমি তাকে বললাম : তুমি আমার বকরিগুলো একটু দেখে রেখো। আমি মক্কায় গিয়ে সকলের সঙ্গে একটু গল্প করে আসি। সে বলল: ঠিক আছে তা-ই হবে।

---

96 যেমন জাহিলী যুগে কুরাইশরা আশুরার রোযা রাখত, রাসূলে কারীম সা. নিজেও জাহেলী যুগে আশুরার রোযা রাখতেন। দেখুন সহীহ বুখারী হাদীস নং ২০০২। ফাতহুল বারী ৪/২৮৭।

97 ইবনে হিশাম ১/১২৮। তারীখে তাবারী ২/১৬১। তাহযীবে তারীখে দিমাশক ১/৩৭৩, ৩৭৬।

এরপর আমি সে উদ্দেশ্যে সামনের দিকে রওয়ানা হলাম। আমি যখন মক্কার শেষ প্রান্তের একটি ঘরের কাছে এসে উপনীত হলাম, তখন আমার কানে বাঁশি ও বাজনার আওয়াজ ভেসে এলো। আমি জিজ্ঞাসা করলাম কিসের আওয়াজ? তারা বলল : অমুকের সঙ্গে অমুকের বিবাহ। আমি শোনার জন্য বসে গেলাম। কিন্তু আল্লাহ তাআলা আমার চোখে নিদ্রার পর্দা ফেলে দিলেন এবং আমি ঘুমিয়ে গেলাম। ভোরের সূর্যের তাপ শরীরে এসে লাগলে আমার ঘুম ভাঙে । আমি আমার সাথীর কাছে ফিরে গিয়ে সবকিছু তাকে খুলে বলি। এরপর অন্য এক রাতেও তাকে আমি একই প্রস্তাব করি। এ উদ্দেশ্যে মক্কায় প্রবেশ করি। এর ফলাফলও হয় প্রথম রাতের মতোই। ...এরপর আর কোনোদিনও আমি আমার মনে এ ধরনের আশা স্থান দেইনি।[98]

ইমাম বুখারী হযরত জাবের বিন আব্দুল্লাহ রা. থেকে বর্ণনা করেছেন, তখন কাবার নির্মাণ কাজ চলছিল। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম চাচা আব্বাসের সঙ্গে পাথর এনে দেওয়ার জন্য সেখানে গিয়েছিলেন। তখন হযরত আব্বাস রা. তাকে বললেন, তোমার লুঙ্গিটা কাঁধের ওপর রেখে দাও এতে পাথরের আঘাত ও ব্যথা লাগবে না। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সঙ্গে সঙ্গে মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন। তাঁর চোখদুটি বড় বড় হয়ে আসমানের দিকে উঠে গেল। এরপর তিনি হুঁশ হারিয়ে ফেলেন। কিছুক্ষণ পরে হুঁশ ফিরে আসার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি আমার লুঙ্গি কোথায়! আমার লুঙ্গি কোথায়? বলতে লাগলেন । এরপর তাকে লুঙ্গি পরিয়ে দেওয়া হলো। অন্য এক বর্ণনায় আছে, এরপর আর কোনো দিনও রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সতর দেখা যায়নি।[99]

উত্তম চরিত্র মাধুর্য, মহান গুণাবলি আর বিশেষ কিছু বৈশিষ্ট্যের মাধ্যমে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বীয় কওমের এক সম্মানজনক আসনের অধিকারী ছিলেন। সুতরাং, তিনি ছিলেন তাঁর কওমের মধ্যে সবচেয়ে বড় পৌরুষদীপ্ত মানুষ। তাঁর চরিত্র তাদের সকলের চেয়ে অনেক সুন্দর ছিল। তাঁর মরতবা সকলের চেয়ে বড় ছিল। তাঁর ধৈর্য ও সহনশীলতা সকলের চেয়ে বিশাল ছিল। তাদের সবার মধ্যে তাঁর কথাই ছিল সর্বাধিক সত্য। তাঁর স্বভাবই ছিল সবচেয়ে পেলব ও কোমল। তাঁর হৃদয়ই ছিল অধিক পবিত্র। ভালো কাজে তাদের মধ্যে তিনিই সর্বাধিক মহান ছিলেন। আমলের

---

98 হাদীসটি রেওয়ায়েত করেছেন তাবারী র. ২/২৭৯ প্রমুখ। মুহাদ্দিস ইমাম হাকিম ও যাহাবী র. এটাকে বিশুদ্ধ বলে আখ্যা দিয়েছেন। এর বিপরীতে আল বিদায়া ওয়ান নিহায়াতে আল্লামা ইবনে কাসীর র ২/২৮৭ এটাকে যঈফ বলেছেন।

99 সহীহ বুখারী হাদীস নং ১৫৮২। ফাতহুল বারী ৩/৫১৩, হাদীস নং ৩৫২৯, ৭/১৮০। আরও দেখুন ফাতহুল বারী ৩/৫১৭। মুসনাদে আহমদ ৩/২৯৫, ৩১০, ৩৩৩, ৩৮০।

দিক দিয়ে তিনিই সর্বাধিক পূত ও পুণ্যবান ছিলেন। তিনিই সর্বাধিক অঙ্গীকার পূরণকারী আর প্রতিশ্রুতি রক্ষাকারী ছিলেন। তিনিই তাদের মধ্যে সবচেয়ে বড় আমানতদার ছিলেন। এমনকি এই মহান আমানতদারির কারণে তাঁর কওম তাকে আমীন বলে ডাকত। কারণ তাঁর মধ্যেই এমন সব মহান গুণ আর বৈশিষ্ট্যের মেলা বসেছিল পৃথিবীর ইতিহাসে এক ব্যক্তির মধ্যে তা অতীতে কোনো দিনও দেখা যায়নি। আর ভবিষ্যতেও কোনো দিন যাবে না। উম্মুল মুমিনীন খাদীজার রা. ভাষায় রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছিলেন ঠিক এমন: তিনি অসহায় মানুষের খরচ বহন করতেন। সর্বহারার জন্য জীবিকা উপার্জন করে দিতেন। মেহমানের যথাযথ আতিথেয়তার ব্যবস্থা করতেন এবং আসমান থেকে যে সকল মুসিবত আসত তাতে সাহায্য করতেন।[100]

নবুওয়াত-পরবর্তী জীবন

রাসূলুল্লাহ (সা)-র বয়সের যখন চল্লিশ পূর্তি হল বিশ্ব তখন অনলকুণ্ডের একেবারে প্রান্তসীমায়, বরং এ কথা বলাই অধিকতর সঙ্গত হবে যে, দোরগোড়ায় উপনীত। গোটা মানবগোষ্ঠী দ্রুততার সঙ্গে আত্মহত্যার পথে অগ্রসর হয়েছিল। এটা ছিল সেই নাযুক মুহূর্ত যখন মানবতার ভাগ্যাকাশে ঘটল সুবহে সাদিকের উদয়। শোষিত, বঞ্চিত ও দুর্ভাগা বিশ্বের ভাগ্য আবার জেগে উঠল এবং মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সা)-এর আবির্ভাবের মুবারক মুহূর্ত নিকটবর্তী হল । আল্লাহ্র নিয়মও তাই, যখন অন্ধকার ঘনীভূত হয়, মানুষের হৃদয়-মন শক্ত ও মৃতপ্রায় হয়ে যায় তখন তাঁর রহমতের স্নিগ্ধ বসন্ত বাতাস বইতে শুরু করে এবং মানবতার শীতল মৌসুমী বাগে আবার বসন্তের আগমন ঘটে ।দুনিয়াতে তখন মূর্খতা ও জাহিলিয়াতের রাজত্ব চলছিল। কল্পনার ফানুস ওড়ানো এবং শির্ক ও মূর্তিপূজার মহামারী চলছিল সর্বত্র ব্যাপকভাবে। এতদ্দৃষ্টে তাঁর অস্থিরতা সৃষ্টিজগতের ও আসমান-যমীনের স্রষ্টার পথ-নির্দেশনা তথা হেদায়াত ও তাঁর বিধানাবলীর অপেক্ষার চূড়ান্ত সীমায় গিয়ে উপনীত হয়েছিল। মনে হচ্ছিল কোন অদৃশ্য শক্তি ও গায়বী আওয়াজ তাঁকে পরিচালনা করছে, পথ প্রদর্শন করছে এবং সেই বিরাট পদের জন্য তাঁকে প্রস্তুত করছে।সে সময় একাকিত্ব ও নির্জনতাপ্রিয়তা তাঁর নিয়মিত অভ্যাসে পরিণত হয়েছিল । তিনি সকলের থেকে আলাদা হয়ে নিঃসঙ্গ অবস্থানে বিরাট

100 সহীহ বুখারী হাদীস নং ৩।

তৃপ্তি পেতেন, শান্তি পেতেন। তিনি মক্কা থেকে বহু দূরে চলে যেতেন, এমন কি শহরের ঘরবাড়িগুলো তাঁর দৃষ্টিসীমা থেকে হারিয়ে যেত। তিনি মক্কার বিভিন্ন ঘাঁটি ও এখানকার উপত্যকাসমূহ যখন অতিক্রম করতেন তখন গাছপালা ও প্রস্তরমালা থেকে আওয়াজ ভেসে আসত, “আসালামু আলায়কা ইয়া রাসূলাল্লাহ! হে আল্লাহ্ রাসূল! আপনার প্রতি সালাম। তিনি ডানে বামে ঘুরে তাকাতেন, কিন্তু গাছপালা ও প্রস্তর খণ্ড ছাড়া আর কিছুই দৃষ্টিগোচর হত না ।”[101]



[102]

চিত্র: জাবালে নূর

হেরা গুহায়বেশির ভাগ সময় তিনি হেরা গুহায় অবস্থান করতেন এবং উপর্যুপরি কয়েক রাত সেখানেই অতিবাহিত করতেন। এর ইনতেজামও তিনি আগে থেকেই করে নিতেন।এখানে তিনি ইবরাহীম (আ)-এর তরীকায় ও সুস্থ প্রকৃতির পথনির্দেশনায় আল্লাহ্র ইবাদতে মশগুল থাকতেন।[103] নবুওয়াত লাভএভাবেই একদা তিনি হেরা গুহায় তশরীফ আনেন এমন সময় তাঁকে নবুওয়াতের পদমর্যাদা দিয়ে সরফরায করার পবিত্র মুহূর্ত এসে যায়। জন্মের ৪১তম বছরে ১৭ রমযান ২ তারিখের ঘটনা (মুতাবিক

---

101 সীরাত ইবন হিশাম, ১ম খণ্ড, ২৩৪-৩৫; সহীহ মুসলিমে তাঁর এই উক্তিও বর্ণিত আছে: আমি মক্কার একটি পাথর এখনও চিনি যা নবুওয়াত লাভের আগেই আমাকে সালাম দিত (কিতাবু’ল- ফাদাইল)

102 https://atlasislamica.com/cave-of-hira-jabla-an-nur/

103 আইশা (রা)-এর হাদীছ দেখুন (সহীহ বুখারী)।

৬ আগস্ট, ৬১০ খৃ.) জাগ্রত ও চৈতন্যাবস্থায় সংঘটিত হয়। তাঁর সামনে হেরা গুহায় ফেরেশতা আগমন করেন এবং বলেন : পড়ুন । তিনি উত্তর দিলেন : আমি পড়তে জানি না । রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, এরপর ফেরেশতা আমাকে বুকের সঙ্গে জাপটে ধরে এমন জোরে চাপ দিলেন যে, আমি কষ্ট অনুভব করলাম। এরপর তিনি আমাকে ছেড়ে দিলেন এবং বললেন : পড়ুন । আমি বললাম : আমি পড়তে জানি না। এরপর তিনি পুনরায় আমাকে ধরলেন এবং এমন জোরে বুকের সঙ্গে চেপে ধরলেন যে, আমি তাঁর চাপ তীব্রভাবে অনুভব করলাম। অতঃপর তিনি আমাকে ছেড়ে দিলেন এবং বললেন: পড়ুন।

আমি বললাম, আমি পড়তে জানি না। তিনি পুনরায় আমাকে ধরে পূর্বের মতই চাপ দিলেন এবং ছেড়ে দিলেন। বললেন : পড়ুন । আমি পড়লাম :

إِقْرَاء بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ إِقْرَاءوَرَبُّكَ الأَكْرَمُ الَّذِي عَلَمَ بِالْقَلَمِ عَلَمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ

"পাঠ কর তোমার প্রতিপালকের নামে যিনি সৃষ্টি করেছেন, সৃষ্টি করেছেন মানুষকে আলাক থেকে। পাঠ কর, আর তোমার প্রতিপালক মহামহিমান্বিত, যিনি কলমের সাহায্যে শিক্ষা দিয়েছেন, শিক্ষা দিয়েছেন মানুষকে যা সে জানত না" (সূরা আলাক : ১-৫ আয়াত)।[104]

---

104 ইবন কাছীর, ১ম খণ্ড, ৩১২, আবু জা'ফার মুহাম্মাদ আল-বাকির।



[105]

চিত্র: হেরা গুহা

এটা ছিল নবুওতের প্রথম দিন, পহেলা ওয়াহী ও কুরআনের অংশ।[106]

হযরত খাদীজা (রা)-র ঘরে

রাসূলুল্লাহ (সা) এই আকস্মিক ঘটনায় খুবই ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েন। কেননা এর আগে আর কখনো এমন ধরনের ঘটনা তাঁর সঙ্গে ঘটেনি। আর এ ধরনের কথাও তিনি আর

---

105 https://atlasislamica.com/cave-of-hira-jabla-an-nur/

106 একটি আশ্চার্য বিষয় যা দুনিয়ার দার্শনিক ও চিন্তাবিদগণ এবং ধর্ম ও সংস্কৃতির ঐতিহাসিকদেরমনোযোগ আকর্ষণ করতে চায়, তা হল প্রথম অবতীর্ণ ওয়াহীতে কলমের উল্লেখ যা একজন নিরক্ষর লোকের ওপর, একটি জাতিগোষ্ঠীর মধ্যে এবং এমন একটি দেশে নাযিল হল যেখানে কলমের অস্তিত্ব কদাচিৎ খুঁজে পাওয়া যেত এবং যেখানে লেখাপড়া জানা লোক আঙুলে গোনা যেত, তা এই ধর্ম ও এর ধারক-বাহক উম্মতের লেখাপড়া ও কলমের সাহায্যে কাজ করার যোগ্যতা এবং এর দ্বারা তার চিরস্থায়ী ও মজবুত সম্পর্কের (অপরাপর প্রাচীন ধর্মগুলোর বিপরীতে) চিহ্নিত করে দিয়েছে যা ছিল এর বিশ্বব্যাপী জ্ঞানগত ও রচনামূলক আন্দোলনের গূঢ় রহস্য, ধর্ম ও জাতিগোষ্ঠীর ইতিহাসে যার কোন দ্বিতীয় নজীর নেই।

সেই গূঢ় রহস্য রক্তপিণ্ড عَلَّمَ ٱلْإِنسَٰنَ مَا لَمْ يَعْلَمْ আয়াতের এই ওয়াহীর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হওয়া যা জ্ঞান অন্বেষণ, নতুন জ্ঞানের অনুসন্ধান এবং বিগত কালগুলোতে জানতে চাইতে পারার কিন্তু প্রমাণিত ইলমী হাকীকতসমূহের অস্বীকৃতির অভাবের পেছনে কার্যকারণ হিসাবে প্রমাণিত হয়।

কখনো শোনেন নি। নবুওয়াত ও আম্বিয়া আলায়হিমু'স-সালামের যুগ দীর্ঘকাল হয় গত হয়ে গেছে। অতএব, তিনি বিপদাশংকা করতে লাগলেন এবং নিজের ঘরে ফিরে গেলেন। ভয়ের প্রাবল্যে তাঁর কাঁধ কাঁপছিল। তিনি ঘরে পৌছেই হযরত খাদীজা (রা)-কে বললেন : আমাকে ঢেকে দাও, আমাকে ঢেকে দাও, আমাকে ঢেকে দাও। আমার বিপদের আশংকা হচ্ছে।

হযরত খাদীজা (রা) তাঁকে ভয় পাওয়ার ও ভীত হওয়ার কারণ জিজ্ঞেস করলেন। তিনি তখন সকল ঘটনা বিবৃত করলেন। তিনি একজন বুদ্ধিমতী ও সজাগ সচেতন মহিলা ছিলেন। নবুওয়াত, আম্বিয়া-ই কিরাম ও ফেরেশতাদের সম্পর্কে তিনি অনেক কিছুই শুনে রেখেছিলেন। তিনি তাঁর চাচাতো ভাই ওয়ারাকা ইবন নওফলের নিকট (যিনি খৃষ্ট ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন, আসমানী সহীফাসমূহ অধ্যয়ন করেছিলেন এবং তাওরাত ও ইঞ্জীলের ধারক-বাহকদের সঙ্গে তাঁর ওঠাবসা ছিল) কখনো কখনো গমন করতেন এবং মক্কার লোকদের অন্যায় ও অসমীচীন কথাবার্তা ও অভ্যাস পছন্দ করতেন না। আর সেসব কোন সুস্থ ও বিবেকবান মানুষই পছন্দ করবে না

তিনি তাঁর স্ত্রী ও দিবারাত্রির সঙ্গিনী হিসাবে তাঁর গোপন ও প্রকাশ্য সব কিছু সম্পর্কে অবহিত হওয়ার কারণে, অধিকন্তু বিশেষ আস্থা ও সম্পর্কের দরুন রাসূলুল্লাহ (সা)-এর উন্নত ও মহান চরিত্র সম্পর্কে সর্বাধিক অবগত ছিলেন। তাঁর গুণাবলী ও স্বভাব-প্রকৃতি দৃষ্টে হযরত খাদীজা (রা)-র পূর্ণ বিশ্বাস জন্মেছিল যে, আল্লাহ তা'আলার সাহায্য-সমর্থন ও তৌফিক প্রতি মুহূর্তে তাঁর অনুসঙ্গী। তিনি আল্লাহ তা'আলার মনোনীত মকবুল বান্দা এবং তাঁর সীরাত তথা জীবন-চরিতও পসন্দনীয় সীরাত। যেই ব্যক্তি এরূপ আখলাক-চরিত্র, এ রকম জীবন-চরিত ও এমন উন্নত ও পবিত্র স্বভাব-প্রকৃতির অধিকারী হবেন তাঁর ওপর কোন শয়তান,

জিন্ন কিংবা দুষ্ট আত্মার প্রভাব পড়তে পারে না কখনো। এটি আল্লাহ তা'আলার হেকমত, রহমত ও স্নেহ-মমতা থেকে দূরে এবং তাঁর প্রচলিত সুন্নাতের পরিপন্থী। তিনি সুদৃঢ় বিশ্বাস, গভীর আস্থার সঙ্গে ও পূর্ণ শক্তিতে বললেন: “কখনো নয় । আল্লাহ্র কসম! আল্লাহ তা'আলা কখনো আপনাকে লাঞ্ছিত ও অপমানিত করবেন না। আপনি আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করেন, অপরের বোঝা বহনপূর্বক তার বোঝা হাল্কা করেন,

অভাবী লোকের প্রয়োজন মিটিয়ে থাকেন, মেহমানের খাতির-যত্ন ও মেহমানদারী করেন এবং সত্য পথে চলতে গিয়ে তাকলীফ ও বিপদ-মুসীবতে সাহায্য করেন।"[107]

ওহী বন্ধের সময়কাল

রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট কতদিন ওহী আসা বন্ধ ছিল এ ব্যাপারে উলামায়ে কেরাম বিভিন্ন মতামত পেশ করেছেন। তবে তার মধ্যে সর্বাধিক বিশুদ্ধ বক্তব্য হলো, রাসূলের নিকট ওহী বন্ধের সময়কাল ছিল হাতে গনা কয়েকটি দিন মাত্র। ইবনে আব্বাস থেকে ইবনে সাদের বর্ণনা এ বক্তব্যকেই সমর্থন করে।[108] আর ওহী বন্ধের মুদ্দত তিন বছর বা দুই বছর কিংবা ছয় মাস হিসেবে যে কথা লোকমুখে প্রচলিত রয়েছে তা কোনোভাবেই বিশুদ্ধ ও নির্ভুল নয় ।সীরাতুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ওপর নির্ভরযোগ্য বর্ণনা আর সীরাত বিশেষজ্ঞদের মতামতের ওপর গভীর নজর বুলিয়ে আমি চরম বিস্মিত হয়েছি। আমি এমন এক তথ্য পেয়েছি যা সাধারণত কারও লেখাতে পাওয়া যাবে না। আর তা হলো: বিভিন্ন রেওয়ায়েত ও বর্ণনায় পাওয়া যায়, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রতি বছর রমযান মাস কাটাতেন হেরা গুহায় । আর নবুওতের পূর্বে এমন হয়েছিল সর্বমোট তিনটি বছর। এ হিসেবে নবুওত প্রাপ্তি ছিল সেই তিন বছরের তৃতীয় বছর। আর যখন রমযান মাস শেষ হতো তখন তাঁর অবস্থানও শেষ হতো। এরপর শাওয়ালের প্রথম তারিখ সকাল বেলা তিনি বাড়িতে ফিরে আসতেন ।বুখারী ও মুসলিমের বর্ণনা দ্বারা জানা যায়, ওহী বন্ধের মুদ্দত শেষ হওয়ার পরে সর্বপ্রথম যখন ওহী নাযিল হয়েছিল তখন নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হেরা গুহা থেকে এক মাস অবস্থান শেষে বাড়ি ফিরে আসছিলেন।আমি বলতে চাই, ওহীর মুদ্দত শেষ হওয়ার পরে সর্বপ্রথম এই ওহীটি নাযিল হয়েছিল ঐ বছরের শাওয়ালের প্রথম তারিখ যে বছরের রমযানে তিনি নবুওত ও রিসালতের ধনে ধন্য হয়েছিলেন। কারণ, এটাই ছিল তাঁর হেরা গুহায় বসবাসের সর্বশেষ দিন। আর এখন এটা প্রমাণিত যে, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ওপর ওহীর সূচনা হয়েছিল একুশে রমযানের শুক্রবার

107

সহীহ বুখারী

باب كيف كان بدء الوحى إلى رسول الله ,

108 তাবাকাতে ইবনে সা'দ ১/১৯৬

রাতে। সুতরাং, ওহী বন্ধের মুদ্দত ছিল মাত্র দশদিন। এরপরে দ্বিতীয় বার তাঁর নিকট ওহী নাযিল হয়েছিল নবুওতের প্রথম বর্ষের পয়লা শাওয়াল বৃহস্পতিবার ভোর বেলা। আর সম্ভবত এ কারণেই প্রতি বছর রমযানের শেষ দশদিন মসজিদে ইতেকাফ ও নিঃঙ্গতার মধ্য দিয়ে কাটানোর জন্য নির্ধারণ করা হয়েছে। শাওয়ালের প্রথম দিনকে ঘোষণা করা হয়েছে ঈদ তথা আনন্দ আর খুশির দিন হিসেবে। আল্লাহই সর্বজ্ঞ।ওহী বন্ধ থাকার এ দিনগুলোতে কষ্ট আর পেরেশানির প্রাবল্যে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কুঁকড়ে উঠেছিলেন। হতবিহ্বলতা আর হতাশা ছিল তাঁর এ দিনগুলোর নিত্য সঙ্গী। ইমাম বুখারী র. 'কিতাবুত তা'বীর' এ বর্ণনা করেন, ‘রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ওহী বন্ধের এ দিনগুলোতে এতটা চিন্তিত আর পেরেশান ছিলেন যে, কখনো কখনো পাহাড়ের চূড়া থেকে আত্মহত্যার জন্য দৌড়ে যেতেন। সুতরাং, যখনই এমন করার জন্য তিনি পর্বতের শিখর দেশে পৌঁছে যেতেন তখন জিবরাঈল আ. তাঁর সামনে আত্মপ্রকাশ করতেন। অনন্তর তাকে বলতেন, হে মুহাম্মাদ! আপনি সত্য সত্যই আল্লাহর রাসূল! এতে তাঁর প্রাণের ধুকধুকানি কিছুটা হলেও স্তিমিত হতো। তাঁর মন কিছুটা হলেও প্রশান্তির পরশ পেত। এরপর তিনি বাড়িতে ফিরে যেতেন। এরপরে যখন ওহী বন্ধের মুদ্দত আরও প্রলম্বিত হতো আবারও তিনি তেমন করার জন্য বের হতেন। পর্বতের গা বেয়ে বেয়ে যখন সর্বোচ্চ শৃঙ্গে পৌছে যেতেন তখন হযরত জিবরাঈল আ. তাঁর সামনে আত্মপ্রকাশ করে আগের মতো কথাবলতেন।[109] ওহী নিয়ে দ্বিতীয় বার জিবরাঈল আ. এর অবতরণহাফিয ইবনে হাজার আসকালানী র. লেখেন, ‘কয়েকদিন ওহী এ কারণে বন্ধ রাখা হয়েছিল যাতে করে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে ভয় পেয়েছিলেন তা কেটে যায় এবং তাঁর মধ্যে দ্বিতীয় বার ওহী প্রাপ্তির শওক ও যওক পয়দা হয়।[110] অনন্তর যখন এটা তাঁর হাসিল হয়ে গেল আর তিনি ওহী অবতীর্ণ হওয়ার অপেক্ষায় বসে থাকতে লাগলেন আল্লাহ তাআলা তাকে দ্বিতীয় বার ওহী অবতীর্ণ করার মাধ্যমে মহীয়ান করে তোলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, ‘দীর্ঘ এক মাস হেরা গুহায় অবস্থান করার পরে সেখান থেকে নেমে ফিরতি পথে যখন আমি পার্বত্য উপত্যকা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিলাম তখন কী যেন হঠাৎ আমাকে ডাক দিলো। আমি আমার ডান দিকে তাকালাম কিন্তু কিছুই দেখতে পেলাম না । এবার আমি বাম দিকে তাকালাম

---

109 সহীহ বুখারী হাদীস নং ৬৯৮২।

110 ফাতহুল বারী ১/২৭।

কিন্তু অনুরূপ শূন্য দেখলাম । এবার সামনে তাকালাম তারপরে পেছনে তাকালাম কিন্তু কোথাও কিছুই আমার নজরে পড়ল না। এরপরে যখন আমি আমার মাথা সামান্যটুকু উঁচু করলাম তখন ভীতিকর কিছু দেখতে পেলাম। দেখলাম হেরা গুহায় আমার কাছে যে ফেরেশতা এসেছিলেন তিনি আসমান ও জমিনের মধ্যবর্তী স্থান সমান একটি বিশাল কুরসীতে উপবিষ্ট। আমি চমকে গিয়ে ভয়ে হুমড়ি খেয়ে মাটিতে পড়ে গেলাম । আমি দৌড়ে খাদীজার কাছে এসে বললাম 'আমাকে চাদর দিয়ে ঢেকে দাও আমাকে চাদর দিয়ে ঢেকে দাও!! আমার ওপর ঠাণ্ডা পানি ঢেলে দাও!! তিনি বলেন, এরপরে তারা আমাকে চাদর দিয়ে ঢেকে দিলো এবং আমার ওপর ঠাণ্ডা পানি ঢেলে দিলো। পরক্ষণেই অবতীর্ণ হয়

[يَٰٓأَيُّهَا ٱلۡمُدَّثِّرُ ١ قُمۡ فَأَنذِرۡ ٢ وَرَبَّكَ فَكَبِّرۡ ٣ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرۡ ٤ وَٱلرُّجۡزَ فَٱهۡجُرۡ ٥][111]

হে চাদরওয়ালা আপনি উঠে দাঁড়ান! ....এটা ছিল নামায ফরয হওয়ার আগের ঘটনা। এরপরে ওহীর ময়দান গরম হয়ে উঠল। চলতে থাকল অব্যাহত ভাবে।[112] এই আয়াতগুলোই নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর রিসালতের মৌলিক নীতিমালা। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নবুওত লাভের পরে ওহী বন্ধ থাকার দিনগুলো শেষ হতেই এগুলো নাযিল হয়েছিল। এ সকল আয়াতে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ওপর দুটি যিম্মাদারি অর্পণের কথা আলোচিত হয়েছে। পাশাপাশি এগুলোর পরিণতি ও ফলাফলের কথাও বলে দেওয়া হয়েছে।

এক. রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে আল্লাহর পয়গাম মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া এবং তাদেরকে ভীতি প্রদর্শন করার যিম্মাদারি দেওয়া হলো। আর এটা বোঝা যায় قُمۡ فَأَنذِرۡ এর মাধ্যমে। কেননা তার অর্থ হলো মানুষ যদি ভ্রষ্টতা ও গোমরাহি থেকে, মহান আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারও ইবাদত থেকে, তাঁর সত্তা ও গুণাবলি, অধিকার ও কাজের ক্ষেত্রে অন্যকে শরীক করা থেকে ফিরে না আসে তবে তাদেরকে আল্লাহর শাস্তি থেকে ভীতি প্রদর্শনকরুন।

---

111 সুরা মুদ্দাসির (১-৫)

112 সহীহ বুখারী: সূরা মুদ্দাসসিরের তাফসীর। প্রথম ও পরবর্তী অধ্যায়, ৮/৪৪৫-৪৪৭। সহীহ মুসলিমের কিতাবুল ঈমানে এমন বর্ণনা রয়েছে ১/১৪৪, হাদীস নং ২৫৭।

দুই. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে তাঁর নিজের জীবনেও আল্লাহ তাআলার নিদের্শনাবলি বাস্তবায়নের এবং সেগুলো জীবনের পদে পদে আঁকড়ে থাকার নির্দেশ দেওয়া হলো। যাতে তিনি আল্লাহর রেযামন্দি হাসিল করতে পারেন এবং সমস্ত মুমিনের জন্য পরিণত হতে পারেন মহোত্তম আদর্শে । অবশিষ্ট আয়াতগুলোতে এ কথাই বলা হয়েছে। সুতরাং, وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ এর অর্থ হলো আপনি কেবল তাকেই সুমহান জানুন! তাঁর সঙ্গে অন্য কাউকে শরীক করেন না । এরপর, وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ এর বাহ্যিক উদ্দেশ্য হলো শরীর ও কাপড়কে পবিত্র করা । কেননা, যে আল্লাহর নামের তাকবীর বলবে এবং তার রবের সামনে দাঁড়াবে সে কখনোই অশুচি আর অপবিত্র হতে পারে না। সুতরাং, আয়াতে বাহ্যিক পবিত্রতার ওপরই যখন এতটা জোর দেওয়া হয়েছে সেখানে শিরক, আখলাক ও আমালের পবিত্রতার ওপর নিঃসন্দেহে আরও বেশী জোর দেওয়া হয়েছে। এরপর, وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ এর অর্থ হলো আল্লাহর অসন্তোষ ও আযাব উদ্রেককর কারণ থেকে দূরে থাকুন! আর এটা সম্ভব একমাত্র তার আনুগত্য করা ও তাঁর নাফারমানি পরিত্যাগ করার মাধ্যমে। আর, وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ এর অর্থ হলো : কারও প্রতি এমন কোনো অনুগ্রহ করেন না, যার দ্বারা আপনি মানুষের কাছ থেকে পারিশ্রমিককিংবা পার্থিব জীবনে উত্তম প্রতিদান পাওয়ার আশা করবেন ।সর্বশেষ আয়াতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে ঐ বালা মুসিবত থেকে সতর্কবাণী ও হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়েছে, যা তাঁর কওমের পক্ষ থেকে তাঁর ওপর পতিত হওয়ার অপেক্ষায় ছিল যখন তিনি তাদের মুখালাফাত করলেন। তাদেরকে এক আল্লাহর প্রতি দাওয়াত দিলেন। তাদেরকে তার শাস্তি ও ফয়সালা সম্পর্কে ভীতি প্রদর্শন করলেন। এ কারণে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন

وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ

যে ব্যক্তি তার নিজের জন্য বেঁচে থাকে জীবনে সে-ই না কেবল আরাম চোখে দেখতে পারে। একটুখানি প্রশান্তির কথা ভাবতে পারে। কিন্তু আপনার মতো যার কাঁধে যিম্মাদারির এক বিশাল বোঝা সে কীভাবে ঘুমাবে? সে কীভাবে একটু সময় আরাম করবে! তুলতুলে নরম বিছানার অন্বেষা কিংবা সুখঘন জীবনধারার আকাঙ্খা সে কীভাবে করবে! যে মহান দায়িত্ব আপনার অপেক্ষায় বসে আছে সেগুলো পালন করার ব্যাপারে সজাগ হয়ে উঠুন! যেই সুবিশাল বোঝা আপনার কাঁধে এসে পড়বে তার জন্য এখন থেকেই প্রস্তুতি গ্রহণ করুন। কষ্ট-ক্লেশ ও ক্লান্তির জন্য তাকলীফ ও শ্রান্তির জন্য প্রস্তুত হোন। আপনি দাঁড়িয়ে যান। কারণ ঘুম আর বিশ্রামের সময় শেষ হয়ে গেছে। জীবনের

ছুটির দিনগুলো ফুরিয়ে গেছে। এখন শুধু রাতের পর রাত বিনিদ্র কাটাতে হবে। একের পর এক জিহাদী অভিযান চালিয়ে যেতে হবে। তাই আপনি উঠুন! তার জন্য প্রস্তুতি নিন!সন্দেহ নেই, এগুলো ছিল এমন কতগুলো গুরুত্বপূর্ণ ও ভয়ানক বাক্য যেগুলো নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর বাহিনীকে প্রশান্ত ঘরের তুলতুলে বিছানার পেলবতা থেকে নামিয়ে তুফান আর দমকা হাওয়ায় ভরা উত্তাল সমুদ্রে ছুঁড়ে মেরেছিল। তাদেরকে অবতারণ করিয়েছিল জীবনের বাস্তব ময়দানে-যেখানে গলাগলি করছিল দ্বন্দ্ব আর সংঘাত। হৈ-হুল্লোড় আর চেঁচামেচি।

তখন রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উঠে দাঁড়ালেন। সেই যে একদিন দাঁড়ালেন তারপর থেকে আর কোনো দিনও একটু সময় বসার ফুরসত পেলেন না। সামান্য একটু আরাম কিংবা কোথাও একটু স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলার সুযোগ পেলেন না। তিনি নিজের জন্য কিংবা নিজের পরিবারের জন্য একটা দিন বেঁচে থাকেননি। আল্লাহর দাওয়াত নিয়ে একবার যে দাঁড়ালেন তারপর আর বসার কথা ভুলে গেলেন। তাঁর কাঁধে তুলে দেওয়া হয়েছিল পৃথিবীর সবচেয়ে বড় ও ভারী বোঝা। এটা ছিল ভূপৃষ্ঠের সবচেয়ে বড় আমানতের বোঝা, মানবতার বোঝা, গোটা আকীদার বোঝা, জীবনের বিভিন্ন ময়দানে জিহাদ আর সংগ্রামের বোঝা। বিশ বছরেরও বেশি সময় ধরে ঘরের বাইরে থেকে দ্বন্দ্বমুখর জীবনের তপ্ত রণাঙ্গনে জীবন কাটিয়ে দিয়েছেন। সেই গুরুগম্ভীর নিনাদ শোনার পর থেকে নিয়ে আজ পর্যন্ত এই প্রলম্বিত সময়ে অন্য কোনো কাজ তাঁর সামনে এসে এ কাজকে ব্যহত করেনি। এর পেছনে সয়ে গেছেন হাজারো কষ্ট ও মুসিবত। আল্লাহ তাআলা তাকে আমাদের পক্ষ থেকে এবং গোটা মানব জাতির পক্ষ থেকে উত্তম জাযা দান করুন।

ওহীর প্রকারভেদ

রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জীবনভোর যুদ্ধ-জিহাদ সম্পর্কে আলোচনার পূর্বে আমরা এখন ওহীর প্রকারভেদ ও তার স্তর বিন্যাস সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত কথা বলব। আল্লামা ইবনুল কাইয়্যিম র.ওহীর স্তর বিন্যাস স্তর বিন্যাস করেছেন ঠিক এভাবে

প্রথম স্তর : সত্য স্বপ্ন। আর এটা ছিল তাঁর প্রতি ওহীর সূচনা।

দ্বিতীয় স্তর : সাক্ষাৎ ব্যতীতই ফেরেশতা তাঁর অন্তরে যা কিছু ঢেলে দিতেন । যেমন নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, রূহুল কুদস আমার মনে এ কথা ঢেলে দিয়েছেন যে, কোনো আত্মাই তার রিযিক পূর্ণ করার আগ পর্যন্ত মরবে

না। সুতরাং, তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং সুন্দরভাবে অন্বেষণ করো। রিযিক আসতে বিলম্ব করার কারণে তোমরা কখনোই তা অন্যায়ভাবে তালাশ করো না। কেননা, আল্লাহর কাছে যা রয়েছে, তা কেবল আনুগত্যের মাধ্যমেই আসতে পারে।

তৃতীয় স্তর : কখনো কখনো মানুষের আকৃতি ধারণ করে ফেরেশতা তাঁর নিকট আগমন করতেন। এরপর তাকে সম্বোধন করে কথা বলতেন। তিনি তার থেকে সেগুলো মুখস্থ করে নিতেন। এ অবস্থায় অনেক সময় সাহাবায়ে কেরাম তাকে দেখতে পেতেন।

চতুর্থ স্তর : ঘণ্টার আওয়াজের ন্যায় তার নিকট ওহী আসত। এটা ছিল আল্লাহর নবীর জন্য সবচেয়ে কঠিন আর কষ্টসাধ্য মুহূর্ত। এ প্রকারের ওহী অবতরণে ফেরেশতা রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সঙ্গে পুরো মিশে যেতেন এমনকি কনকনে শীতের মধ্যেও রাসূলের কপাল বেয়ে টপটপ করে ঘামের ফোঁটা ঝরতে থাকত। আর যদি তিনি কোনো সওয়ারীর পিঠে থাকতেন তবে সেটি বসে যেত। একবার রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আইহি ওয়া সাল্লাম যায়দ বিন সাবেতের রাণের ওপর মাথা রেখে শোয়া ছিলেন। এমতাবস্থায় ওহী এনে । তাঁর মনে হচ্ছিল যেন তাঁর রাণ গলে শেষ হয়ে যাবে ।

পঞ্চম স্তর : তিনি ফেরেশতাকে তাঁর আসল আকৃতিতে দেখতে পেতেন। সুতরাং এ অবস্থায় তিনি যা অবতীর্ণ করার অবতীর্ণ করতেন। এ অবস্থায় ওহী অবর্তীর্ণ হয়েছিল সর্বমোট দুই বার । সূরা নাজমে এর উল্লেখ রয়েছে।

ষষ্ঠ স্তর : সরাসরি আল্লাহ তাআলা মিরাজের রজনীতে যা কিছু স্বীয় বান্দার প্রতি অবতীর্ণ করেছিলেন । যেমন পাঁচ ওয়াক্ত নামায ইত্যাদি।সপ্তম স্তর: কোনো ফেরেশতার সাহায্য ও মাধ্যম ব্যতিরেকেই আল্লাহর সঙ্গে কথপোকথন করা। যেমনটি হয়েছিল হযরত মূসা বিন ইমরানের ক্ষেত্রে। হযরত মূসা আ. সম্পর্কে এ ঘটনা কুরআনে স্পষ্টভাবে বর্ণিত আছে। আর আমাদের নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ক্ষেত্রে এর প্রমাণ পাওয়া যায় মিরাজ সম্পর্কিত সহীহ হাদীস দ্বারা ।কেউ কেউ অষ্টম আরেকটি স্তরের কথাও বলেছেন। আর তা হলো কোনো পর্দা ব্যতীত সরাসরি আল্লাহর সঙ্গে কথা বলা। তবে এ ব্যাপারে উলামায়ে মুতাক্বাদ্দিমীন ও মুতাআখ্খিরীনের মাঝে রয়েছে চরম মতানৈক্য।[113]

---

113 যাদুল মাআদ ১/১৮

নিকটাত্মীয়দের মধ্যে দাওয়াত

সুরা শুআরা এর আয়াত নাযিল হওয়ার পর রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বনু হাশিম গোত্রের নিজ আত্মীয়-স্বজনকে এক জায়গায় ডাকলেন। সুতরাং, তারা রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ডাকে সাড়া দিয়ে এক জায়গায় একত্রিত হলো। বনু মুত্তালিব বিন আবদে মানাফের একটি দলও ছিল তাদের সঙ্গে। তারা ছিল পঁয়তাল্লিশ জন পুরুষ। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন তাদের উদ্দেশে কথা বলার ইচ্ছা করলেন তখন আবু লাহাব তাঁর মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বলতে লাগল: এরা তোমার চাচা ও চাচাতো ভাইদের বংশ। সুতরাং, তুমি ভণিতার আশ্রয় না নিয়ে যা বলার সরাসরি বলে ফেলো। গোটা আরবের তামাম কবীলার মুকাবিলা করার ক্ষমতা তোমার কওমের নেই। আর তোমার হাত ধরার ব্যাপারে আমিই সর্বাপেক্ষা বেশি হক্বদার। সুতরাং, তখন তোমার চাচাতো ভাইয়েরাই তোমার জন্য যথেষ্ট। আর যদি তুমি তোমার পথেই হাঁটতে থাকো তবে তাদের জন্য তোমাকে দমনের পথ বের করা অত্যন্ত সহজ হয়ে যাবে। কুরাইশের কবীলাগুলো তোমার ওপর আক্রমণ করবে। আর এ ক্ষেত্রে তাদের সাহায্যে এগিয়ে আসবে আরবের তামাম কবীলা। আর তখন আমার জানা থাকবে না গোটা বিশ্বে তোমার চেয়ে আগে বেড়ে নিজ বাপ-দাদার বংশের ধ্বংস আর বিলুপ্তির জন্য অন্য কেউ এত দাপাদাপি করেছে কি না! রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন নীরবতা অবলম্বন করলেন। তাঁর যবান মুবারক থেকে একটি কথাও বের হলো না।

এরপর দ্বিতীয় আরেকদিন তিনি তাদেরকে সমবেত করলেন। তাদেরকে সম্বোধন করে তিনি বললেন, সকল প্রশংসা আল্লাহ তাআলার জন্য। আমি তাঁর প্রশংসা করি আর তাঁর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করি। তাকে আমি বিশ্বাস করি আর তাঁর ওপর ভরসা করি। আমি আরও সাক্ষ্য দেই, এক আল্লাহ তাআলা ব্যতীত আর কোনো ইলাহ নেই; তাঁর কোনো শরীক নেই। অতঃপর তিনি বললেন, কোনো কওমের অগ্রদূত কিংবা প্রতিনিধির জন্য সেই কওমের সঙ্গে মিথ্যা কিংবা প্রতারণা করার নিয়ম নেই। আর আল্লাহ তো ঐ মহান সত্তা; যিনি ব্যতীত আর কোনো ইলাহ নেই । আমি বিশেষভাবে তোমাদের নিকট আর ব্যাপকভাবে গোটা দুনিয়াবাসীর নিকট আল্লাহর রাসূল স্বরূপ প্রেরিত হয়েছি। আল্লাহর কসম! তোমরা যেভাবে ঘুমের কোলে ঢলে পড়ো ঠিক সেভাবে একদিন মৃতুর কোলেও ঢলে পড়বে। আবার ঘুম থেকে তোমরা যেমন জেগে ওঠো ঠিক তেমনিভাবে কবর থেকে তোমরা একদিন পুনরুত্থিত হবে। তখন তোমাদের পৃথিবীতে যা কিছু

করতে এর সবকিছুর হিসাব দিতে হবে। হয়তো চিরকাল জান্নাতে থাকবে নয়তো জাহান্নামে ।তখন আবু তালিব বলে উঠল, আমরা তোমাকে সাহায্য করতে কতটা ভালোবাসি, তোমার কথা ও উপদেশ আমরা মেনে নিতে কতটা আগ্রহবোধ করি এবং আমরা তোমার কথা ও অদৃশ্য সংবাদ কতটা সত্যায়ন করি এ ব্যাপারে তুমি আমাদেরকে কিছু জিজ্ঞাসা করো না। এই তোমার বাপ-দাদার বংশধর । আর আমিও তাদেরই একজন। পার্থক্য কেবল এটুকুই যে, তোমার ইচ্ছা ও ইরাদার পূর্ণতার ক্ষেত্রে আমার অবস্থান সবার আগে। সুতরাং, তোমার পথে তুমি অব্যাহত গতিতে সামনে বাড়তে থাকো । আল্লাহর কসম! আমি সব সময় তোমার পাশে থাকবো। পৃথিবীর সকল বিপদ-আপদ থেকে নিজের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে হলেও তোমার সুরক্ষা আমি নিশ্চিত করব। কিন্তু এতকিছু সত্ত্বেও আব্দুল মুত্তালিবের ধর্মকে ছেড়ে দিতে আমার মন কখনোই সায় দিবে না ।তার এ কথা শুনে আবু লাহাব বলল, আল্লাহর শপথ! এটা একটা ইতরামি বটে! অন্য কেউ তাঁর হাতে হাতকড়া পরিয়ে দেওয়ার আগে বেলা থাকতে তোমরাই পরিয়ে দাও ।আবু তালিব তাকে বলল, যতদিন হায়াত আছে ততদিন পর্যন্ত অবশ্যই তাঁর যথাযথ হেফাযত করে যাব।[114]

যুলুম-নির্যাতন শুরু

নবুওতের চতুর্থ বছরের গোড়ার দিকে ইসলাম যখন চারদিকে ছড়িয়ে পড়তে লাগল তখন কুরাইশরা তার উদ্যমতাকে দমিয়ে দেওয়ার জন্য, তার গতিকে থামিয়ে দেওয়ার জন্য কোমর বেঁধে নেমে পড়ল। এ উদ্দেশ্যে তারা তাদের সাধ্যমতো যতগুলো পন্থা ও পদ্ধতি পারছিল একের পর এক নির্বিঘ্নে ব্যবহার করে যাচ্ছিল। এভাবেই কেটে গেল বহু দিন। বহু মাস। কুরাইশ কাফের ও মুশরিকরা তাদের পূর্বের জায়গাতেই দাঁড়িয়ে ছিল। তখনো শুরু হয়েছিল না যুলুম ও নির্যাতনের পালা। কিন্তু যখন তারা গভীরভাবে লক্ষ্য করে বুঝতে পারল যে, কিশোর বয়সেই ইসলামের মধ্যে যে শক্তি আর তেজ রয়েছে তাতে ভরা যৌবনে এ সকল পন্থা ও পদ্ধতিতে তার সঙ্গে কখনোই কুলিয়ে ওঠা সম্ভব হবে না, তখন তারা নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করল। পরামর্শে সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হলো মানবাধিকারবিরোধী এক সিদ্ধান্ত- মুসলমানদের ওপর এবার চাপিয়ে দিতে হবে অত্যাচার আর নির্যাতনের এক অন্ধকার কালো রাত্র। নতুন এই দীন থেকে তাদেরকে যে কোনো মূল্যেই ফিরিয়ে আনতে হবে। সিদ্ধান্ত মোতাবেক কুরাইশের প্রত্যেক রাঘব বোয়ালই তার কওমের, যে ব্যক্তি ইসলামে দাখিল হয়েছে তার ওপর

114 ইবনুল আসীর প্রণীত 'কামিল' ১/৫৮৪,৫৮৫

চরম নির্যাতন ও নিপীড়ন চালানো শুরু করল। প্রত্যেক মনিবই তার যে গোলাম ইসলামের পথ বেছে নিয়েছিল তার ওপর ভেঙে ফেলেছিল জোর-জুলুমের পাহাড়; তাকে ঘিরে ফেলেছিল মার-পিট আর জোর-জবরস্তির অন্ধকার ।কাফের-মুশরিকদের বড় বড় মাথা আর গোত্র প্রধানগুলিই যখন যুলুম আর নির্যাতনের ঘৃণ্য এ পথে ধাবিত হয়েছিল তখন তাদের চাটুকার আর চামচাগুলি ও যে এ পথ অবলম্বন করে তাদের আঁচল জড়িয়ে ধরার জন্য পিছু ধরবে এটা কোনো বিস্ময়কর ব্যাপার ছিল না; বরং প্রকৃতির চাহিদাই এমনটি হওয়ার কথা বলে দিচ্ছিল। সুতরাং, পদলেহী এই ছুঁচোগুলিও তাদের পথ ধরে হাঁটতে লাগল ।

তারা মুসলমানদের জীবনে বিশেষ করে সহায় সম্বলহীন গরিব মুসলমানদের জীবনে এমন ব্যাপক ও বিশাল সর্বনাশ ডেকে এনেছিল যা শুনলে গায়ের পশম দাঁড়িয়ে যায়। হৃদয় ফেটে চৌচির হয়ে যায়। সুনির্মল ও সুকোমল আত্মার গহীন থেকে বেদনার প্রচণ্ড ধাক্কায় বের হয় গগণবিদারী আর্তনাদ! আহ!!যখন শরীফ ও গণমান্য কারও ইসলাম গ্রহণের কথা আবু জাহলের কানে গিয়ে পৌঁছত তখন সে তাকে তিরস্কার ও ভর্ৎসনা করত। তার ধন ও সম্পদ আর ইয্যত ও সম্মানের বিশাল ক্ষতি করার হুমকি-ধমকি দিত। আর যদি সে দুর্বল হতো তবে চোখ কান বন্ধ করে তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ত। সেখানে কায়েম হতো হৃদয় বিদারক মারপিটের এক অসভ্য দৃশ্য।[115] যখন উসমান রা. ইসলাম গ্রহণ করলেন তখন তাঁর চাচা তাকে খেজুর পাতার চাটাইয়ের ভেতর পেঁচিয়ে ধরে নীচের দিক দিয়ে তাঁর চোখে মুখে ধোঁয়া দিত।[116]

যখন মুসআব বিন উমাইরের ইসলাম গ্রহণের সংবাদ তার মায়ের কানে গিয়ে পৌছল তখন তিনি তার খাবার-দাবারের দুয়ার বন্ধ করে দিলেন। এক পর্যায়ে তাকে ঘর থেকে বের করে দিলেন। সারা জীবন যে মানুষটি সুখ আর আড়ম্বরতার দরিয়ায় পাল তুলে এক কূল থেকে অন্য কূলে সহজেই দারিদ্র্যের সমস্ত তুফান কেটে চলেছেন, আজ তার জীবনে নেমে এলো দারিদ্র্যের এক ঘনঘোর অন্ধকার রাত। দারিদ্র্যের পাহাড়সম ঊর্মিমালায় বিধ্বস্ত হবার ভয়ে উত্তরঙ্গ দরিয়ার মাঝে আজ তার জীবন তরী নিরন্তর শঙ্কিত। তার আত্মা থরথর কম্পিত।[117] সুহাইব বিন সিনান রূমী রা. কে এতটা শাস্তি দেওয়া হতো যে, প্রায় সময়ই তিনি হুঁশ হারিয়ে ফেলতেন এবং মুখে কী বলতেন তা

115 ইবনে হিশাম ১/৩২০ ।

116 রহমাতুল্লিল আলামীন ১/৫৭।

117 উসদুল গাবা ৪/৪০৬। তালকীতে ফুহূমিল আহলিল আসারি পৃষ্ঠা ৬০।

নিজেও জানতেন না।[118] বেলাল রা. ছিলেন উমাইয়্যা বিন খলফ জুমহীর গোলাম। উমাইয়্যা তাঁর গলায় রশি লাগিয়ে এলাকার ইতর ছেলেদের হাতে তুলে দিত। তারা তাঁর রশি ধরে টেনে মক্কার চারপাশের পাহাড়ে পাহাড়ে ঘুরত। এভাবে তাঁর গলায় রশির দাগ পড়ে যেত। কিন্তু তা সত্ত্বেও তাঁর মুখ থেকে বের হতো কেবল আহাদ আহাদ!!! এতে উমাইয়্যা আরও ক্রুদ্ধ হতো এবং তাকে নিদারুণ প্রহার করতে শুরু করত। তাকে ক্ষুধার্ত রাখত । দুপুরের প্রচণ্ড দাহ আর কাঠফাটা রোদে তাকে মরুভূমিতে বসিয়ে রাখত। এর চেয়েও আরও হৃদয়বিদারক ইতিহাস ছিল, মক্কার মরুবিয়াবানে দুপুর বেলায় তপ্ত বালুরাশিতে তাকে চিত করে শুইয়ে রাখা হতো। এরপর এক বিশাল পাথর তাঁর বুকের ওপর রেখে তাকে চাপা দেওয়া হতো। তারপর উমাইয়্যা বলত, আল্লাহর কসম! হয়তো তুমি এভাবে মৃত্যুর স্বাদ আস্বাদন করবে, নতুবা মুহাম্মাদকে অস্বীকার করবে এবং লাত ও উয্যার ইবাদত করবে। তখন বেলাল রা. সে অবস্থাতেই বলতেন আহাদ! আহাদ!! তিনি আরও বলনেন, যদি তোমাদেরজন্য এর চেয়েও আরও ক্রোধোদ্রেককর কোনো শব্দ আমার জানা থাকত তবে আমি তা-ই বলতাম। এ অবস্থায় একদিন হযরত আবু বকর রা. তার পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি তাকে এ অবস্থায় দেখে একটি কালো গোলাম কিংবা দুই শত বা দুই শ' আশি দিরহাম দিয়ে খরিদ করে আযাদ করে দিলেন।[119] আম্মার বিন ইয়াসির রা. ছিলেন বনু মাখযুমের গোলাম । তিনি ও তাঁর পিতা- মাতা গোড়াতেই ইসলাম গ্রহণ করে নিয়েছিলেন। সুতরাং, দুপুরের প্রচণ্ড রোদের তাপে মরুর বালুরাশি যখন খই হয়ে ফুটত, তখন মুশরিকরা বিশেষ করে আবু জাহল প্রস্তরময় জমিনের দিকে চলে যেত এবং তাদেরকে যেভাবে পারত শাস্তি দিত। একদিন রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি যখন তাদের এই শাস্তি আর দুরবস্থা প্রত্যক্ষ করলেন তখন বললেন, হে ইয়াসিরের পরিবার! তোমরা ধৈর্য ধারণ করো । কেননা, তোমাদেরকে জান্নাতের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে। ইয়াসির এভাবে শাস্তি পেয়ে পেয়ে মারা গেলেন। আর আম্মারের মাতা সুমাইয়্যার লজ্জাস্থানে আবু জাহল বর্শা দিয়ে আঘাত করে তাকে শহীদ করে দেয়। তিনিই ছিলেন ইসলামের প্রথম শহীদ রমণী।

---

118 ইসাবা ৩, ৪/২৫৫। ইবনে সা'দ ৩/২৪৮।

119 ইবনে হিশাম ১/৩১৭, ৩১৮। তালকীহে ফুহূমিল আহলিল আসারি পৃষ্ঠা ৬১। তাফসীরে ইবনে কাসীরঃ সূরা নাহলের ১০৬ নং আয়াতের তাফসীর [২/৬৪৮]

তিনি ছিলেন আবু হুযাইফা বিন মুগীরা বিন আব্দুল্লাহ বিন উমর বিন মাখযূম এর দাসী। তার পিতার নাম ছিল খাইয়্যাত। তিনি ছিলেন অনেক দুর্বল ও বৃদ্ধ । কখনো কখনো রোদে পুড়িয়ে শাস্তি দেওয়া হতো। আবার কখনো কখনো তার বুকের ওপর বিশাল পাথর চাপিয়ে দেওয়া হতো। কোনো কোনো সময় তাকে পানিতে ডুবিয়ে রাখা হতো। এতে তিনি হুঁশ হারিয়ে ফেলতেন। আর মুশরিকরা তাকে বলত, তুমি যতক্ষণ না মুহাম্মাদকে গালি দিবে কিংবা লাত ও উয্যার প্রশংসা করবে ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা তোমাকে ছাড়ব না। বাধ্য হয়ে তিনি তাদের কথায় সম্মত হলেন। এরপর কাঁদতে কাঁদতে আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছে দৌড়ে এলেন। আল্লাহ তাআলা আয়াত নাযিল করলেন: যার উপর জবরদস্তি করা হয় এবং তার অন্তর বিশ্বাসে অটল থাকে সে ব্যতীত যে কেউ বিশ্বাসী হওয়ার পর আল্লাহতে অবিশ্বাসী হয় এবং কুফরীর জন্য মন উন্মুক্ত করে দেয় তাদের উপর আপতিত হবে আল্লাহ্র গযব এবং তাদের জন্যে রয়েছে শাস্তি। [সূরা নাহল : ১০৬][120]

আবু ফুকাইহা ছিলেন বনু আবদ্দুদ্দার এর গোলাম।তার নাম ছিল আফলাহ। মূলতঃ তিনি ছিলেন আযদ কবীলার লোক। দিনের মধ্যভাগে সম্পূর্ণ উলঙ্গ করে পায়ে লৌহ শিকল পরিয়ে মরুভূমির বালুর মধ্য নিয়ে তাকে ফেলে রাখা হতো। এরপর তাঁর পিঠের ওপর রেখে দেওয়া হতো এক বিশাল জগদ্দল পাথর; যাতে তিনি একটুকুও নড়াচড়া করতে না পারেন। এতে তিনি বার বার হুঁশ হারিয়ে ফেলতেন। এভাবেই নিরবচ্ছিন্নভাবে চলতে লাগল শাস্তির ধারা; পরিশেষে তিনি যখন হাবশায় দ্বিতীয় হিজরতের সময় হিজরত করে চলে গিয়েছিলেন, তখন অত্যাচারের এ ধারা বন্ধ হয়েছিল। একবার মুশরিকরা তাঁর পা বেঁধে দিলো। এরপর তাকে মরুভূমিতে টেনে নিয়ে যাওয়া হলো। সেখানে বালুর ওপর ফেলে এত জোরে তার গলা চেপে ধরা হল যে, তারা তাকে মৃত মনে করল। আবু বকর একদিন তার পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তখন তিনি তার এই দৈন্যাবস্থা প্রত্যক্ষ করে তাকে ক্রয় করে আযাদ করে দিয়েছিলেন।[121]

খাব্বাব বিন আরত রা. ছিলেন উম্মে আনমার বিনতে সিবা' আল খুযাইয়্যার গোলাম। পেশায় তিনি ছিলেন একজন কামার। যখন তিনি ইসলাম গ্রহণ করলেন তখন তাঁর মনিবা তাকে আগুনের ছেঁকা দিয়ে শাস্তি দিতে লাগল। নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি

---

120 ইবনে হিশাম ১/১৩৯, ৩২০। তাবাকাতে ইবনে সা'দ ৩/২৪৮, ২৪৯......... তাফসীরে ইবনে কাসীর প্রাগুক্ত। দেখুন দুররুল মানসুরে উল্লিখিত আয়াতের তাফসীর।

121 উসদুল গাবা ৫/২৪৮। ইসাবা ৭, ৮/১৫২ ইত্যাদি।

ওয়া সাল্লাম কে অস্বীকার করার জন্য তাঁর মনীবা লৌহ শলাকা আগুনে গরম করে এনে কখনো তাঁর পিঠে আবার কখনো তাঁর মাথায় লাগিয়ে দিত। কিন্তু এটা আল্লাহর প্রতি তাঁর ঈমান আর আত্মসমর্পণকে বরং বাড়িয়েই চলল। মুশরিকরাও তাকে কোথাও পেলে শাস্তি দিত। কখনো তারা তার ঘাড় চেপে ধরত। আবার কখনো চুল টানাটানি করত। কখনো আগুনের জ্বলন্ত অঙ্গারের ওপর শুইয়ে দিয়ে চেপে তার সঙ্গে ধরে রাখত। ফলে আগুনের তাপে এক সময় শরীর থেকে পানি বের হয়ে সে আগুনকে নিভিয়ে ফেলত ।যিন্নীরা নামী এক রোমক দাসীও ইসলাম গ্রহণ করেছিল। এ কারণে তাকে কঠোর শাস্তি দেওয়া হতো। এক পর্যায়ে তার চোখেও ভীষণ আঘাত করা হয় ফলে সে অন্ধ হয়ে যায়। অতঃপর তাকে বলা হয়, লাত এবং উয্যা তোমার ওপর অসন্তুষ্ট হয়েই এ মুসিবত দিয়েছে। সে বলল, আল্লাহর কসম! তারা আমাকে কোনো মুসিবতে আক্রান্ত করার ক্ষমতাও রাখে না। এটা তো আল্লাহর পক্ষ থেকে তিনি যদি চান তবে তা ভালো হয়ে যাবে। পরের দিন আল্লাহর অপার অনুগ্রহে তার চোখ ভালো হয়ে গেল । কুরাইশরা বলল এটাও মুহাম্মাদের একটা জাদু।[122] বনু যুহরার দাসী উম্মে উবাইসও ইসলামের সুশীতল ছায়ায় আশ্রয় নিয়েছিলেন। ইসলাম গ্রহণ করার অপরাধে যে মুশরিকই তাকে পেত কঠোর শাস্তি দিত। বিশেষকরে তার মনিব আসওয়াদ বিন আবদে ইয়াগূসের তো এ ক্ষেত্রে কোনো জুড়িই ছিল না। সে ছিল রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জানের দুশমনদের এবং তাঁর সঙ্গে ঠাট্টা বিদ্রূপকারীদের অন্যতম।[123] বনু আদী গোত্রের উমর বিন মুমিলের দাসীও ইসলাম গ্রহণ করেছিল। এ কারণে উমর বিন খাত্তাব-তখন তিনি শিরকের ওপর ছিলেন-তাকে শাস্তি দিতেন । তাকে মারতে মারতে তিনি ক্লান্ত হয়ে পড়তেন। এরপরে ডেকে বলতেন, আমি ক্লান্ত হয়ে তোমাকে মারা বন্ধ করেছি; অন্য কোনো কারণে নয়। দাসীও তাকে বলত, আপনার পালনকর্তাও আপনার সঙ্গে এরূপ ব্যবহার করবেন![124] দাসীদের মধ্যে যারা ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন এবং পরিণতিতে ভয়াবহ নির্যাতনের সম্মুখীন হয়েছিলেন, তাদের অন্যতম ছিলেন নাহদিয়া ও তার মেয়ে । মা ও মেয়ে উভয়ই বনু আব্দুদ্দারের এক মহিলার দাসী ছিলেন।[125] আর ইসলাম গ্রহণ করার

---

122 তাবাকাতে ইবনে সা'দ ৮/২৫৬। ইবনে হিশাম ১/৩১৮।

123 ইসাবা ৭,৮/২৫৮।

124 ইবনে হিশাম ১/৩১৯। তাবাকাতে ইবনে সা'দ ৮/২৫৬।

125 ইবনে হিশাম ১/৩১৮,৩১৯।

কারণে দাসদের মধ্যে হতে যাদেরকে শাস্তি পেতে হয়েছিল, তাদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন আমের বিন ফুহাইরা রা। নির্যাতনের প্রচণ্ডতায় তিনি কখনো কখনো হুঁশ হারিয়ে ফেলতেন। নিজের অজ্ঞাতেই মুখে কী যেন বিড়বিড় করতেন।[126] হযরত আবু বকর সিদ্দীক রা. এ সকল দাস-দাসীকে কিনে আযাদ করে দিয়েছিলেন। এ কারণে আবু বকরের পিতা আবু কুহাফা একদিন তাকে লক্ষ্য করে বললেন, খুঁজে খুঁজে শুধু দুর্বল ও জীর্ণশীর্ণ দাসদাসীগুলোকেই আযাদ করে যাচ্ছ। শক্তিশালী ও বীর-স্বভাবীদেরকে আযাদ করো তবে তারা তোমার হেফাযতের কাজে আসবে। আবু বকর তার পিতাকে জবাবে বললেন, কিন্তু আব্বাজান! আমি তো কেবল আমার মালিককে খুশি করার জন্য এদেরকে আযাদ করে যাচ্ছি।

এ থেকে দূরে রাখা হবে আল্লাহভীরু ব্যক্তিকে, যে আত্মশুদ্ধির জন্যে তার ধন- সম্পদ দান করে এবং তাঁর উপর কারও কোন প্রতিদানযোগ্য অনুগ্রহ থাকে না। তাঁর মহান পালনকর্তার সন্তুষ্টি অন্বেষণ ব্যতীত। সে সত্বরই সন্তুষ্টি লাভ করবে। সূরা লাইল : ১৭-২১] আর তিনি ছিলেন হযরত আবু বকর সিদ্দীক রা.।[127] কাফের-মুশরিকদের যুলুম ও অত্যাচার থেকে রেহাই পাননি হযরত আবু বকর সিদ্দীক রা. নিজেও। একবার নওফল বিন খুওয়াইলিদ আদাবী তাকে ও তালহা বিন উবাইদুল্লাহকে নামায ও দীন থেকে বিমুখ করার জন্য এক রশিতে বাঁধলেন। কিন্তু তাদের দুজনের কেউ-ই তার ডাকে সাড়া দেননি। পরবর্তী সময়ে সে যখন তাদেরকে বন্ধনমুক্ত হয়ে নামাযে দাঁড়ানো দেখতে পেল তখন যার পর নেই বিস্মিত ও হতবিহ্বল হয়ে গেল। এ ঘটনার পর থেকে তাদের দুজনের নাম হয়ে গেল 'দুই সঙ্গী'। কোনো কোনো রেওয়ায়েতে নওফলের জায়গায় তালহার ভাই উসমান বিন উবাইদুল্লাহর কথা বলা হয়েছে।[128] মোটকথা, মুশরিকরা যখনই কারও ইসলাম গ্রহণের সংবাদ পেত সঙ্গে সঙ্গে তার ওপর সবাই একযোগে ঝাঁপিয়ে পড়ত। অত্যাচার আর নির্যাতনের তুফান বয়ে যেত তার ওপর দিয়ে। গরিব ও দুর্বল মুসলমান-বিশেষকরে ক্রীত দাস- দাসীর ক্ষেত্রে তাদের এ ময়দান ছিল আরও পরিষ্কার; আর নির্ঝঞ্ঝাট ও ঝামেলামুক্ত । কেননা গোটা পৃথিবীতে তাদের তো এমন কেউ ছিল না এ নির্যাতন ও নিষ্পেষণের কারণে যার পেশানিতে স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠবে বিরাগ আর বিরক্তির নিদর্শন। যে তাদের সুরক্ষা ও হেফাযতের এতটুকু

126 ইবনে সা'দ ৩/২৪৮।

127 ইবনে হিশাম ১/৩১৮.৩১৯। তাবাকাতে ইবনে সা'দ ৮/২৫৬। তাফসীরের বিভিন্ন কিতাব।

128 উসদুল গাবা ২/৪৬৮।

নিশ্চয়তা দিবে। বরং সমাজের মাথা ও মোড়লরাই সময়ে সুযোগে মুসলমানদের ওপর যুলুম নির্যাতনের গুরুদায়িত্ব পালন করত। উস্কে দিত এ পথে পদলেহী চাটুকারদেরকে । কিন্তু শক্তিশালী ও সম্ভ্রান্ত মুসলমানদের ক্ষেত্রে এটা ভারি কঠিন ছিল। কেননা, কওমের সকল মানুষ তাদের প্রতি ইয্যত ও সম্মান দেখাত; তাদের হেফাযত ও সুরক্ষার ব্যাপারে সর্বদা চোখ কান খোলা রাখত। এ কারণে কওমের একমাত্র সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিবর্গই চারদিকে লক্ষ্য রেখে সময় সুযোগ বুঝে তাদেরকে কিছু বলার দুঃসাহস দেখাত । অন্যরা এ ক্ষেত্রে কোনোদিন ভাগ্য পরীক্ষারও সুযোগ পেত না।

হিজরত

আজ থেকে শত শত বছর আগে ইসলামের শৈশবের দিনগুলোতে মক্কার নও মুসলিমরা যালিম ও সীমালঙ্ঘনকারী মুশরিকদের হাতে যা সহ্য করেছিল। অথচ, সেই মুশরিকরা নিজেদেরকে আল্লাহর পরিবারভুক্ত ও তার হারামের উপযুক্ত অধিবাসী মনে করত।সুতরাং, শঙ্কা আর সংকট ঘেরা এই পরিস্থিতি আর সময়ের দাবি এটাই ছিল যে, রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এখন এমন একটি শক্তিশালী ও সুসংহত পথ অবলম্বন করবেন, যে পথে নির্যাতিত মুসলমানরা মুক্তি পাবে । যে পথে আসবে বিপদ সংকুল আঁধার রাতের পরে নয়া যিন্দিগির এক আলোর ভোর । এ কারণে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন এমন দুইটি সুচিন্তিত ও বিজ্ঞোচিত পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন পরবর্তী সময় দাওয়াতের পথ সুগম আর প্রকৃত লক্ষ্য-উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে যেগুলির বিশাল প্রভাব ছিল ।পদক্ষেপ দুটি নিম্নরূপ-

এক. দারুল আরকাম তথা আরকাম বিন আবুল আরকাম মাখযূমীর ঘরকে দাওয়াতের মারকায ও শিক্ষার কেন্দ্ররূপে গ্রহণ।

দুই. নির্যাতিত ও কষ্ট পীড়িত মুসলমানদেরকে হাবশার দিকে হিজরতেরআদেশ দান ।

দারুল আরকাম

এ ঘরটি ছিল সাফা পাহাড়ের পাদদেশে। বিরুদ্ধবাদীদের রক্ষচক্ষুর সীমানা থেকে অনেক দূরে। তুলনামূলক অনেকটা নিরাপদ ভেবে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ ঘরটিকে মুসলমানদের সঙ্গে গোপনে মিলিত হওয়ার কেন্দ্র স্বরূপ গ্রহণ করেছিলেন। এখানে বসে তিনি তাদের নিকট আল্লাহর আয়াতসমূহ তেলাওয়াত করতেন; তাদের আত্মাকে বিশুদ্ধ আর শুচিশুভ্র করে তুলতেন। তাদেরকে আল্লাহর

কিতাব আর হিকমত শিক্ষা দিতেন। এ ঘরটি বেছে নেওয়ার পেছনে আরও কিছু উদ্দেশ্য কাজ করছিল। আর তা ছিল মুসলমানরা এখানে যেন তাদের ইবাদত ও বন্দেগী আর ঈমান ও আমল ধারাবাহিকভাবে নিরাপদে চালিয়ে যেতে পারেন। আল্লাহ তাঁর রাসূলের ওপর যা কিছু অবতীর্ণ করেন তা সুন্দরভাবে হাতে পেয়ে যান। আর যারা ইসলামে দাখিল হতে চান তারা স্বাধীনভাবে ইসলামে দাখিল হয়ে যান। জন মানবহীন এ পার্বত্য প্রান্তরে বিরুদ্ধবাদীরা যেন তাদের কথা ঘুণাক্ষরেও জানতে না পারে; শহরের অভ্যন্তরের প্রতিটি অলিতে গলিতে যাদের দাপাদাপি আর মাতামাতিতে ঘর থেকে বের হওয়াও কঠিন ছিল ।সন্দেহ নেই, যদি রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুসলমানদেরকে নিয়ে প্রকাশ্যে কোথাও সমবেত হতেন তবে মুশরিকরা তাদের থলিতে যা কিছু ছিল সবকিছু ব্যয় করে শতভাগ চেষ্টা চালাত মুসলমানদের ও তাদের লক্ষ্য উদ্দেশ্যের মাঝে দুর্ভেদ্য প্রাচীর হয়ে দাঁড়াতে। তারা তাদের শক্তি ও ক্ষমতা, সামর্থ্য আর কঠোরতা সবকিছুর বিনিময়ে হলেও মুসলমানদেরকে আত্মশুদ্ধি করতে কিংবা কিতাব ও হিকমত শিক্ষার মহা সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত করার প্রাণান্তকর প্রয়াস পেত। এ পথ ধরেই দুই দলের মধ্যে হয়তো কখনো ঠেলাঠেলি লেগে যেত। হয়তো তারা জড়িয়ে যেত রক্তক্ষয়ী লড়াই আর সংঘাতে । ফলে অকালে ঝরে পড়ত লাখো-কোটি বনী আদমের মূল্যবান প্রাণ-পুষ্প । বরং বলা যায় এমনটি হয়েও ছিল। যেমন ইবনে ইসহাক উল্লেখ করেন, রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাহাবায়ে কেরাম বিভিন্ন পার্বত্য উপত্যকায় গিয়ে সমবেত হতেন। অতঃপর তারা সেখানে লুকিয়ে লুকিয়ে নামায পড়তেন। কুরাইশ কাফেরদের একটি দল একদিন তাদেরকে দেখে ফেলে। ফলে তারা তাদেরকে গালি দেয় এবং উভয়ের মধ্যে সংঘর্ষ বেঁধে যায়। সাদ বিন আবী ওয়াক্কাস রা. তাদের একজনকে আঘাত করেন। ফলে তার শরীর থেকে রক্ত প্রবাহিত হয়। আর এটাই ছিল ইসলামের ইতিহাসে সর্বপ্রথম রক্ত ঝরানোর কাহিনী।[129]

সবারই জানা আছে, যদি ইসলাম ও মুসলমানরা তখন কাফের ও মুশরিকদের সঙ্গে প্রকাশ্য রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হতেন এবং তাদের মধ্যে মাঝেমধ্যে কোথাও কোথাও দৈবাৎ ঘটে যাওয়া ঠেলাঠেলি আর ঠোকাঠুকি ধারাবাহিকভাবে চলতে থাকত তবে তাতে প্রথম দলই ক্ষতিগ্রস্ত বেশি হতো। পরিণতিতে একসময় মুসলমানরা পুরোপুরি বিলুপ্ত হয়ে যেত। হারিয়ে যেত জীবনের খেলাঘর থেকে। সুতরাং, প্রজ্ঞা আর বুদ্ধিবৃত্তির চাহিদা

---

129 ইবনে হিশাম ১/২৬৩।

ছিল এটাই যে, তখন নীরবতা ও নির্জনতা অবলম্বন করা হোক। গোপনীয়তাই তাদের এখনকার সাময়িক সঙ্গী হোক। এ কারণে সিংহভাগ সাহাবায়ে কেরামই তাদের ইসলাম গ্রহণের কথা, ইবাদতের কথা এবং তাদের সকলের এক জায়গায় মিলিত হওয়ার কথা গোপন রাখত । তবে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছিলেন তাদের থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন এক প্লাটফরমে দাঁড়ানো। তিনি প্রকাশ্য দিবালোকে কাফের মুশরিকদের সভা সমিতিতে উচ্চ কণ্ঠে তাওহীদের আযান দিতেন। খোলাখুলি ও দ্ব্যর্থহীন ভাষায় তাদেরকে ইসলাম ও ইবাদতের দিকে ডাকতেন। পৃথিবীর কোনো কিছুই তাকে এ পথ থেকে কোনোদিন একটি মুহূর্তের জন্যও ফিরিয়ে রাখতে পারেনি। প্রকাশ্যে দাওয়াতের কাজ শেষ করে তিনি আবার সেই পাহাড়ী পথ ধরতেন যে পথের প্রান্তে তাকে হাতছানি দিয়ে ডাকত দারুল আরকাম। কারণ তার দিনরাতের স্বপ্ন ছিল মুসলমানদের কল্যাণ ও মঙ্গল; ইসলামের বিজয় ও সফলতা ।

হাবশায় প্রথম হিজরত

ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে কাফের মুশরিকদের বিরোধিতা শুরু হয়েছিল নবুওতের চতুর্থ বছরের মাঝামাঝি কিংবা শেষের দিকে। প্রথমে বিরোধ আর বিদ্রোহের এ আগুন জ্বলেছিল সামান্য মোম কিংবা প্রদীপের আগুনের মতো করে। কিন্তু দিনের পর দিন আর মাসের পর মাস নিরবচ্ছিন্ন জ্বলার পরে এ আগুন ভয়াবহ রূপ ধারণ করল। পরিশেষে নবুওতের পঞ্চম বছরের মাঝামাঝি সময় এটা দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়ল চতুর্দিকে। যৌবনের মদমত্ততায় দুনিয়ার বুকে সে কায়েম করল আখেরাতের কারখানার জীবন্ত জাহান্নাম। সুতরাং, মুসলমানদের জন্য মক্কা তখন আর নিরাপদ শহর ছিল না। তারা যন্ত্রণার এই প্রকাণ্ড অগ্নিকাণ্ড

থেকে নাজাতের জটিল মাসআলার সমাধানের বিভিন্ন সুরত আবিষ্কার করার ফিকিরে নিমগ্ন ছিল। আর ঠিক এ সময়ই নাজাত আর মুক্তির নতুন ভোরের ঘোষণা নিয়ে অবতীর্ণ হলো সূরা যুমার। এ সূরায় মুসলমানদেরকে জন্মভূমি ছেড়ে পরদেশে হিজরত করার পথ দেখিয়ে দেওয়া হলো। দ্ব্যর্থহীন ভাষায় তাদেরকে
জানিয়ে দেওয়া হলো ‘আল্লাহর জমিন মোটেও সংকীর্ণ নয়।
দুনিয়াতে সৎকাজ করে, তাদের জন্যে রয়েছে পুণ্য। আল্লাহর পৃথিবী প্রশস্ত। যারা সবরকারী, তারাই তাদের পুরস্কার পায় অগণিত। [সূরা যুমার : ১০]

রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইতঃপূর্বেই এ কথা জানতে পেরেছিলেন যে, হাবশার বাদশা আসহামা নাজ্জাসী হলেন একজন আদিল ও ইনসাফগার বাদশা। তিনি আরও জানতে পেরেছিলেন যে, তার রাজ্যে কেউ কারও ওপর একটুকুও যুলুম করতে পারে না। তাই তিনি মুসলমানদেরকে তাদের দীন ও ধর্মকে, ঈমান ও ইবাদতকে বুকে আগলে নিয়ে হাবশার পথে হিজরত করার নির্দেশ দান করেন।[130]

নবুওতের পঞ্চম বছর রজব মাসে সাহাবায়ে কেরামের সর্বপ্রথম দলটি স্বীয় জন্মভূমি ছেড়ে হাবশার পথে হিজরত করে। এই দলের মোট সদস্য ছিল বারো জন পুরুষ আর চার জন মহিলা। তাদের নেতা ছিলেন হযরত উসমান বিন আফফান রা.। সঙ্গে ছিলেন তার স্ত্রী ও রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর মেয়ে রুকাইয়্যা রা.। তিনি তাদের সম্পর্কে বলেছেন, হযরত ইবরাহীম আ. ও লূত আ. এর পরে তারাই প্রথম দম্পতি যে দম্পতি আল্লাহর পথে হিজরত করেছিল।

কুরাইশরা যাতে তাদের এ সংবাদ জানতে না পারে এ জন্য দিনের আলোতে কোথাও লুকিয়ে থেকে রাতের আঁধারে তারা রাস্তায় নেমে পড়ে সামনের নতুন কোনো মনযিলের দিকে রওয়ানা হতেন। তাদের গন্তব্য ছিল লোহিত সাগরের সাঈবা বন্দর। ভাগ্য তাদের ভালো ছিল । বন্দরে পৌঁছে তারা হাবশাগামী দু'টি জাহাজ ঘাটে নঙ্গর করা দেখতে পেলেন। সামান্য কিছু সময় পরেই জাহাজ দুটি পাল উড়িয়ে তাদেরকে নিয়ে যাত্রা করল হাবশার পথে। লোহিত সাগরের উত্তাল বুকের অশান্ত ঊর্মীমালার সঙ্গে খেলে খেলে হেলেদুলে জাহাজ এগিয়ে চলল সামনের দিকে। ইতোমধ্যে কুরাইশরা তাদের গোপন সংবাদ জেনে গেল । হাবশাগামী মুহাজিরদের পশ্চাদ্ধাবনে তারা লোকও পাঠিয়ে দিলো। কিন্তু ততক্ষণে জাহাজ তাদেরকে নিয়ে গেছে অনেক দূরে; দৃষ্টিসীমার বাইরে। বন্দর থেকে দূরে বহুদূরে আকাশ আর সাগর তরঙ্গের ছেলে খেলা আর গলাগলি ছাড়া আর কিছুই নজরে পড়ল না পশ্চাদ্ধাবনকারী কুরাইশ বাহিনীর। অপরদিকে মুসলমানরা হাবশায় গিয়ে পৌঁছে প্রশান্তি আর নিরাপত্তার নিঃশ্বাস ফেললেন। খুঁজে পেলেন একটু শান্তি আর সুখের ঠিকানা।[131]

মুসলমানদের সঙ্গে মুশরিকদের সিজদা ও মুহাজিরদের প্রত্যাবর্তন

এ বছরই রমযান মাসে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একদিন হারাম শরীফে তাশরীফ নিয়ে গেলেন। সেখানে ছিল কুরাইশের এক বিশাল জনসমাবেশ।

---

130 দেখুন, বাইহাক্বী প্রণীত সুনানুল কুবরা ৯/৯

131 যাদুল মাআদ ১/২৪।

তাদের বড় বড় নেতৃবৃন্দ আর কওমের সরদাররাও সেখানে উপস্থিত ছিল। তিনি তাদের জনসমাবেশের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আকস্মিক কুরআনে কারীমের সূরা নজম তেলাওয়াত করা শুরু করলেন। ঐ সকল কাফেররা ইতঃপূর্বে কোনো দিন রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর মুখে কুরআনে কারীমের তেলাওয়াত শুনেছিল না। কেননা, তাদের নিজেদের অর্থহীন আলাপচারিতা আর গাল-গল্প থেকে বিরত থেকে এদিকে তারা কোনো দিনও মুখ ফেরানেরা সুযোগ পায়নি। কফেররা বলে, তোমরা এ কুরআন শ্রবণ করো না এবং এর আবৃত্তিতে শোরগোল সৃষ্টি কর, যাতে তোমরা জয়ী হও। [সূরা হা- মীম-সিজদা : ২৬] কিন্তু যখন নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হঠাৎ তাদের মাঝে উদিত হয়ে এটা তেলাওয়াত করতে লাগলেন আর তাদের কর্ণকুহরে এক অশ্রুতপূর্ব সুরের ঝঙ্কার আর ছন্দ তালের মাতন পতিত হলো তখন তাদের অনুভূতিতে আন্দোলন আর আলোড়নের ঝড় এলো। এ ছিল এমন এক ঝঙ্কার; কুরাইশরা তাদের জনমেও কোনো দিন যা শুনেনি। তাই তা তাদের মনের দরিয়ায় এক জোয়ার ডেকে নিয়ে এলো। প্লাবিত করল হৃদয়ের সকল অনুভব আর অনুভূতি। পার্থিব দুনিয়া থেকে তারা সম্পূর্ণ বেখবর হয়ে মনোজগতের এক নতুন দুনিয়ায় প্রবেশ করল। এতদিনকার জীবন আর জগতের সবকিছু তারা ভুলে গেল। ক্ষণিকের মধ্যে নতুন কিছুর প্রত্যাশায় তাদের হৃদয় ও মন বেকারার ও উতলা হয়ে উঠল। পরিশেষে সূরার শেষ প্রান্তে এসে যখন তিনি অনুভব আর অনুভূতির দরিয়ায় জোয়ার জাগানিয়া আল্লাহর এই হুকুম তেলাওয়াত করলেন, “সুতরাং তোমরা তার জন্য সেজদা করো আর কেবল তাঁরই ইবাদত করো”- এবং তিনি নিজেও সিজদায় লুটিয়ে পড়লেন তখন কাফেরদের কেউ নিজেকে আর ধরে রাখতে পারল না। লুটিয়ে পড়ল তৃষ্ণার্ত প্রাণে নিজের প্রকৃত স্রষ্টার গৌরব আর মহিমাময় পদতলে। এত বেকারারি আর ভালোবাসা নিয়ে জীবনের কোনো দিন যা তারা করেনি। সত্য কথা কি হক্ক আর হক্কানিয়্যাতের শাশ্বত জয়গান তখন মিথ্যা গর্ব-অহঙ্কার আর অর্থহীন দম্ভের পর্দা ছিঁড়ে ফেলেছিল। যার কারণে তাদের গোমর ফাঁস হয়ে গিয়েছিল। তখন কেউই নিজেকে ধরে রাখতে পারেনি। লুটিয়ে পড়েছিল সৃষ্টিগত দুর্বলতার আবেদনে স্রষ্টার পায়ে।[132]

---

132 ইমাম বুখারী র, ইবনে আব্বাস ও ইবনে মাসউদ রা. সূত্রে সংক্ষিপ্তভাবে এ সিজদার ঘটনা বর্ণনা করেছেন। দেখুন 'সিজদাতুন নাজমি' অধ্যায় ও সুজুদিল মুসলিমীনা ওয়াল মুশরিকীন অধ্যায়, ১/১৪৬। আরও দেখুন 'মক্কায় রাসূলে কারীম সা. ও সাহাবায়ে কেরাম মুশরিকদের থেকে যার মুখামুখি হয়েছেন অধ্যায়, ১/৫৪৩।

কিন্তু পরে যখন তাদের হুঁশ ফিরে এলো। যখন তারা দেখতে পেল, আল্লাহর কালামের দুর্লভ শক্তি আর অজেয় ক্ষমতা তাদের হৃদয় আর মনের লাগাম হাতে তুলে নিয়েছে। যার টুটি চেপে ধরতে তাদের এত বছরের তাকলীফ ও মেহনত চলছে, শেষ পর্যন্ত তার সামনেই তাদের সকলের উন্নত শির অবনত হয়ে গেছে । তখন তাদের ওপর লজ্জা আর অপমানের দুয়ার খুলে গেল। বুদ্ধি-বিলোপের পাগলা ঘোড়া তাদের মাথায় সওয়ার হয়ে দিগবিদিকে ছুটতে লাগল। যে সকল মুশরিকরা এ সমাবেশে উপস্থিত ছিল না চতুর্দিক থেকে তারা তাদের ওপর নিন্দা আর তিরষ্কারের বিষবাণ নিক্ষেপ করতে লাগল তখন তারা নতুন করে ভাবনা শুরু করল। উপায়ান্তর না দেখে তারা এর সকল দায় দায়িত্ব চাপিয়ে দিলো নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাঁধে। তারা সর্বত্র এ মিথ্যা রটিয়ে দিলো যে, নবী কারীম তাদের মূর্তির প্রশংসা ও জয়গান গেয়েছেন। এতকাল ধরে যা তারা দাবি করে আসছিল এক্ষণে তিনি তার সাফাই গেয়েছেন। তিনি নিজ কণ্ঠে উচ্চারণ করেছেন 'এগুলি সম্মান ও ইয্যতওয়ালা বড় বড় দেবতা; নিঃসন্দেহে তাদের সুপারিশ গৃহীত হবে'।

কিন্তু ইতিহাসে এটা কাফির চরিত্রের কোনো বিস্ময়কর ঘটনা ছিল না। কারণ মুসলমানদের সঙ্গে ধোঁকা ও কপটতা, প্রতারণা ও প্রবঞ্চনা আর ষড়যন্ত্র ও চক্রান্ত ছিল তাদের জাতীয় চরিত্রের একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। এ ক্ষেত্রে মিথ্যাকে তারা ভালোবাসত হৃদয় দিয়ে। মুনাফেকি করত তারা পরম আন্তরিকতা আর নিষ্ঠার সঙ্গে। সুতরাং, রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ওপর তাদের এ খোলামেলা অপবাদ আশ্চর্যের কিছু ছিল না।

একে একে এ সংবাদ হাবশার মুহাজিরদের কাছে গিয়েও পৌঁছল। কিন্তু এ সংবাদের পেটের বদলে পিঠই তাদের ভাগ্যে জুটল। মক্কায় ঠিক যেমন ঘটেছিল তারা ঠিক এর উল্টাটি জানতে পারল। তারা খবর পেল কুরাইশের সবাই মুসলমান হয়ে গেছে। সুতরাং তারা না ভেবে-চিন্তেই ঐ বছর শাওয়াল মাসেই মক্কায় ফিরতি পথ ধরল। মক্কার কাছাকাছি এসে যখন প্রকৃত বিষয় তারা ঠাওর করতে পারল অনেকে সেখান থেকেই আবার হাবশায় চলে গেল। বাকিরা লুকিয়ে লুকিয়ে কিংবা কুরাইশের কারও ছত্রছায়ায় মক্কায় প্রবেশ করল।[133]

133 ইবনে হিশাম ১/৩৬৪। যাদুল মাআদ ১/২৪, ২/৪৪।

মুহাজির ও মুসলমাদের ওপর কুরাইশের পক্ষ থেকে যলুম আর নির্যাতনের মাত্রা এবার আরও বেড়ে গেল। এখন সেই অত্যাচার আর নির্যাতনের মিছিলে তাদের আত্মীয়-স্বজনরাও শরিক হলো। কেননা, হাবশার বাদশা নাজ্জাসী মুসলমানদের সঙ্গে যে ভালো ও মহান আচরণ করেছিলেন তা কুরাইশদের হৃদয়ে এক বিশাল ক্ষতের সৃষ্টি করেছিল। দিবানিশি তারা এতে হিংসার আগুনে জ্বলে পুড়ে মরছিল। তাই রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুসলমানদেরকে দ্বিতীয় বার হাবশার পথে হিজরত ব্যতীত আর কোনো উপায়ন্তর খুঁজে পেলেন না ।

হাবশায় দ্বিতীয় হিজরত

মুসলমানরা দ্বিতীয় বার হাবশার পথে হিজরতের প্রস্তুতি নিলো। তবে তাদের দ্বিতীয় বার এই হিজরত ছিল প্রথম বারের চেয়ে আরও বেশি ব্যাপক; আরও বেশি কষ্টসাধ্য ও বিপদসংকুল। কারণ, কুরাইশরা এবার তাদের হিজরতের কথা জেনে গিয়েছিল এবং তাদেরকে পথিমধ্যে বাঁধা দেওয়ার বিষয়টিও চূড়ান্ত করে ফেলেছিল। কিন্তু মুসলমানরা তাদের চেয়ে অনেক বেশি দ্রুতগতিতে পথ অতিক্রম করছিল। আর আল্লাহর নুসরত ও সাহায্য ছিল তাদের কদমে কদমে। ফলে কাফেররা তাদের নাগাল পাওয়ার আগেই তারা নিরাপদে নাজ্জাসীর কাছে গিয়ে আশ্রয় নিলো।

এবারের হিজরতে মুহাজিরদের সংখ্যা ছিল ৮২ বা ৮৩ জন পুরুষ আর ১৮ কিংবা ১৯ জন নারী। আম্মার বিন ইয়াসির রা. হিজরত করেছিলেন কি না এ ব্যাপারে ইতিহাসে বিভিন্ন বর্ণনা পাওয়া যায়।[134]

হাবশার মুহাজিরদের বিরুদ্ধে কুরাইশের ধারাবাহিক ষড়যন্ত্র

মুসলমানরা নিজেদের জন্য ও নিজেদের দীনের জন্য হাবশাকে সুন্দর ও নিরাপদ একটি দুর্গ হিসেবে পেয়ে যাবে মুশরিকদের পক্ষে কখনোই এটি কোনো সাধারণ ব্যাপার ছিল না। তাই তারা প্রচণ্ড হিংসার আগুনে দাউ দাউ করে জ্বলছিল। তারা তাদের মধ্য থেকে বুদ্ধিমান, বিচক্ষণ ও দূরদর্শী দুজন তথা আমর

134 যাদুল মাআদ ১/২৪।

বিন আস আর আব্দুল্লাহ বিন আবী রবীআ-তখনো তারা মুসলমান হয়নি- কে বাদশা নাজ্জাসী ও তার সভাষদদের জন্য বহু মূল্যবান উপঢৌকন আর হাদিয়া- তোহফা দিয়ে পাঠিয়ে দিলো ।

তারা প্রথমে বাদশার সভাষদদের কাছে গিয়ে কুরাইশের দেওয়া হাদিয়া- তোহফা পেশ করতে বলল। এরপর বাদশা নাজ্জাসীর নিকট কী কী বলে মুসলমানদেরকে এ দেশ থেকে তাড়িয়ে দিতে হবে তা শিখিয়ে দিলো। যখন তাদের নিজেদের ভেতরকার শলা- পরামর্শ সম্পন্ন হলো তখন তারা সিদ্ধান্ত মোতাবেক নাজ্জাসীর দরবারে এসে হাজির হলো। তার দরবারে কুরাইশের পাঠানো উপঢৌকন পেশ করে বলতে লাগল :

মহামান্য সম্রাট! আমাদের কিছু বেকুব নওজোয়ান আপনার রাজ্যে পালিয়ে এসে আস্তানা গেড়েছে। তারা তাদের কওমের ধর্মের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছে এবং আপনার ধর্ম গ্রহণ করা থেকেও বিরত থেকেছে। এর বিপরীতে তারা একটি নতুন দীন আবিষ্কার করেছে। আপনি কিংবা আমরা তথা আমাদের কেউই যে দীন সম্পর্কে ইতঃপূর্বে কোনো দিন কিছু শুনিনি। কিছু জানিনি। তাই এখন তাদের কবীলার সরদার ও আত্মীয়-স্বজনরা আমাদেরকে আপনার কাছে পাঠিয়েছে। উদ্দেশ্য-আপনি এদেরকে ধরে তাদের কাছে ফিরিয়ে দিবেন। কেননা তারাই এদের ব্যাপারে অধিকতর নেগাহবান; এদের নিন্দা ও ভর্ৎসনা সম্পর্কে অধিকতর পরিজ্ঞাত ।

সভাষদগণও তাদের দুজনের কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে বলে উঠল, বাদশাহ মহামান্য! তারা দুজন সম্পূর্ণ সত্যবাদী। আপনি ঐ সকল বেকুবকে ধরে তাদের হাতে তুলে দিন। তারা তাদেরকে নিজ জাতি ও দেশে ফিরিয়ে নিয়ে যাবে।

কিন্তু বাদশাহ নাজ্জাসী ছিলেন অত্যন্ত বিচক্ষণ সম্রাট। তিনি চিন্তা করে দেখলেন, বিষয়টির সুষ্ঠ তদন্ত আর উভয় পক্ষের কথা শোনা ব্যতীত ভালো-মন্দ কোনো ফয়সালা দেওয়া যাবে না। তাই তিনি মুসলমানদেরকে দরবারে ডেকে পাঠালেন। তারা এসে হাযির হলো। আসার আগেই তারা সিদ্ধান্ত নিয়ে নিয়েছিল, বাঁচা মরা যা-ই কিছু হোক সৎ আর সত্যের পথেই তারা অটল ও অবিচল থাকবে। অতঃপর বাদশা নাজ্জাসী তাদেরকে বললেন, সেটা কোন্ ধর্ম যার মাধ্যমে তোমরা তোমাদের কওমের ধর্মের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছ? যা হাতে পেয়ে তোমরা না তোমাদের বাপ-দাদার ধর্ম আর না আমাদের ধর্ম গ্রহণ করেছো! যার মাধ্যমে তোমরা আমাদের ব্যবসা লাটে উঠিয়েছ !!

জাফর বিন আবু তালিব সকলের পক্ষ থেকে সামনে এগিয়ে তাদের নতুন এই দীনের রূপরেখা আর জীবন ও সমাজ ব্যবস্থা তুলে ধরলেন। অতি সুন্দর ও কোমলতার সঙ্গে

গুরুগম্ভীর কণ্ঠে সম্রাট নাজ্জাসীর কর্ণ কুহরে পতিত হতে লাগল নও মুসলিম জাফর বিন আবী তালিবের বক্তব্য:

মহামান্য সম্রাট! আমরা জাহেলী যুগের জাহেল মানুষ ছিলাম। আমরা মূর্তি- পূজা করতাম আর মৃত জন্তু জানোয়ার ভক্ষণ করতাম! দুনিয়ার সকল অশ্লীলতার আমরা ছিলাম গুরুঠাকুর! আমরা আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করতাম। প্রতিবেশীর সঙ্গে খারাপ আচরণ করতাম। আমাদের শক্তিশালীরা দুর্বলদেরকে চিবিয়ে খাচ্ছিল। পৃথিবীতে এমন কোনো দুষ্কর্ম ছিল না যা আমরা করতাম না । এমন সময় মহামহিম আল্লাহ তাআলা ঠিক আমাদের মধ্য থেকেই আমাদের কাছে একজন রাসূল প্রেরণ করলেন। আমরা তাঁর বংশ পরম্পরা সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবগত। তাঁর সততা, তাঁর আমানতদারি, তাঁর পবিত্রতা আর তাঁর চরিত্রের শুচিশুভ্রতা সম্পর্কে আমরা পরিপূর্ণ পরিজ্ঞাত। তিনি এসে আমাদেরকে আল্লাহর দিকে ডাকলেন। তিনি আমাদেরকে তাওহীদের দীক্ষা দিলেন । তিনি আমাদেরকে বললেন যেন আমরা আল্লাহকে এক জানি। তাঁর ইবাদত-বন্দেগি করি। এতদিন আমরা আর আমাদের বাপ-দাদারা তাকে ছেড়ে যে পাথরের পূজা করতাম; মূর্তির বন্দনা গাইতাম তা যেন ছেড়ে দিই। তিনি আমাদেরকে আদেশ দিলেন যেন আমরা সর্বদা সত্য কথা বলি; মানুষের রাখা আমানত আদায় করে দিই; আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখি; প্রতিবেশীর সঙ্গে ভালো ব্যবহার করি; সব ধরনের রক্তপাত আর হারাম থেকে বেঁচে থাকি। তিনি আমাদেরকে আরও নির্দেশ করলেন, যেন কোনো দিন আমরা অশ্লীলতায় জড়িয়ে না পড়ি; যেন মিথ্যা কথা কোনো দিন না বলি; অন্যায়ভাবে এতিমের মাল ভক্ষণ না করি; সতী-সাধ্বী নারীর ওপর মিথ্যা অপবাদের কলঙ্ক কালিমা চাপিয়ে না দিই। তিনি আমাদেরকে আরও বললেন, যেন আমরা এক আল্লাহর ইবাদত করি; তাঁর সঙ্গে অন্য কিছু শরিক না করি। তিনি আমাদেরকে নামায, রোযা আর যাকাতের-এভাবে ইসলামের কয়েকটি বিধি বিধানের কথা তিনি বললেন- নির্দেশ দিলেন । সুতরাং, আমরা তাকে সত্যায়ন করলাম। তার ওপর আমরা ঈমান আনলাম। আল্লাহর যে দীন আর বিধান তিনি নিয়ে এলেন সে ক্ষেত্রে আমরা তার ইত্তেবা ও অনুসরণ করলাম। আমরা এক আল্লাহর ইবাদত করতে শুরু করলাম। এখন আর আমরা তার সঙ্গে অন্য কাউকে শরিক করি না। তিনি আমাদের ওপর যা কিছু হারাম করলেন আমরা সেগুলো হারাম বলে জানতে লাগলাম। তিনি আমাদের জন্য যা কিছু হালাল করলেন আমরা সেগুলোকে হারাম বলে জানতে লাগলাম। আর এ কারণে আমাদের কওম আর কবীলার লোকগুলি আমাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে বসল। তারা

আমাদের ওপর সীমালঙ্ঘন করল। তারা আমাদের ওপর বিভিন্ন যুলুম আর নির্যাতনের পাহাড় ভেঙে ফেলল। তারা চাইল আমরা যেন এক
আল্লাহর ইবাদত ছেড়ে দিয়ে আবার ফিরে যাই মূর্তি-পূজার সেই ঘনঘোর অন্ধকারে; যে অন্ধকার থেকে তার বদৌলতে আমরা নাজাত পেয়েছিলাম। যেই অন্ধকার কারারাজ্য থেকে মুক্তি পেয়ে আমরা এক নওল আলোর দুনিয়ার সাক্ষাৎ পেয়েছিলাম। তারা আমাদেরকে ডাকল যেন আমরা আগে যে সকল ঘৃণিত ও বাজে বস্তু হালাল মনে করতাম এখন আবার সেগুলো হালাল মনে করি। এরপরে যখন তারা আমাদের ওপর জোর জবরদস্তি চালাতে লাগল; যখন আমাদের ওপর বিভিন্ন যুলুম আর নির্যাতনের ধারা অব্যাহত রাখল; আমাদের দীন আর আমাদের নিজেদের মাঝে তারা প্রাচীর হয়ে দাঁড়াল তখন আমরা আমাদের নিজেদের ও নিজেদের বাপ-দাদার ভিটে-মাটি ত্যাগ করে আপনার এ দূর দেশে পাড়ি জমালাম। অন্য সবাইকে রেখে আমরা আপনাকে বেছে নিলাম। আপনার কাছে আসাকেই আমরা পছন্দ করলাম। তাই হে মহামান্য বাদশাহ! আমাদের আশা; আপনার কাছে আমরা কখনোই যুলুম আর নির্যাতনের শিকার হব না ।

সম্রাট নাজ্জাসী তাকে বললেন, তোমাদের নবী আল্লাহর কাছ থেকে যা কিছু নিয়ে এসেছেন তোমাদের কাছে কি তার কোনো কিছু আছে? জাফর রা. তাকে হাঁ সূচক জবাব দিলেন। অতঃপর নাজ্জাসী বললেন, তবে আমার সামনে তা পাঠ করো। জাফর রা. তখন সূরা মারইয়ামের প্রথম দিকের কয়েকটি আয়াত তার সামনে তেলাওয়াত করলেন। আল্লাহর কসম! নাজ্জাসী তার চোখের পানি আর ধরে রাখতে পারলেন না। তার চোখ বেয়ে অশ্রুর ঢল নামল। চোখের পানিতে ঘন শ্মশ্রু অভিষিক্ত হয়ে উঠল। সভাষদগণও এতটা কাঁদলেন যে, তাদের হাতে থাকা কিতাব ভিজে গেল। নাজ্জাসী তাদেরকে বললেন, খোদার কসম! এতো হুবহু সেই জিনিস যা নিয়ে এসেছিলেন হযরত ঈসা আ.। হযরত ঈসার পয়গাম আর এ পয়গাম তো এক অভিন্ন উৎস থেকে উৎসারিত। সুতরাং, তোমরা উভয়ে চলে যাও! আল্লাহর কসম! তাদেরকে আমি কোনো দিনও তোমাদের হাতে তুলে দেব না ।

সুতরাং, আমর বিন আস আর আব্দুল্লাহ বিন রবীআ বাদশার দরবার থেকে বের হয়ে এলো। বের হওয়ার সময় আমর বিন আস আব্দুল্লাহ বিন রবীআ কে বলল, আল্লাহর কসম! আগামী কাল বাদশার নিকট তাদের এমন কিছু দিক তুলে ধরব যার মাধ্যমে তাদের গোড়া কেটে দিব। কিন্তু আব্দুল্লাহ বিন রবীআ তাকে বাঁধা দিয়ে বলল, এমনটি

করো না। কারণ যদিও তারা আমাদের বিরোধিতা করেছে তবুও তো তারা আমাদের আত্মীয়-স্বজন আর কওমের লোক । কিন্তু আমর নিজ রায়ের ওপর অনড় রইল। পরের দিন আমর বাদশাহ নাজ্জাসীকে লক্ষ্য করে বলল, মহামান্য । তারা ঈসা ইবনে মারইয়ামের ব্যাপারে বড় জঘন্য কথা বলে। তার এ কথা শুনে

নাজ্জাসী ঈসা ইবনে মারইয়াম সম্পর্কে মুসলিম মুহাজিরদের দৃষ্টিভঙ্গি জানার জন্য লোক পাঠালেন। তারা এ খবর পেয়ে প্রথমে খুব ভয় পেয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু পরবর্তী সময়ে তারা সুদৃঢ় সংকল্প করলেন যে, যা-ই হোক হক্ব আর হক্কানিয়্যাতের ওপর আমাদের অটল থাকতেই হবে। সুতরাং, তারা যখন বাদশার দরবারে হাযির হলেন বাদশাহ তাদেরকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করলেন। হযরত জাফর রা. তাকে উত্তর দিলেন আমরা এ ব্যাপারে সেই বিশ্বাস রাখি আমাদের কাছে যা কিছু নিয়ে এসেছেন আমাদের নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। আর তা হলো হযরত ঈসা ইবনে মারইয়াম হলেন আল্লাহর বান্দা, তাঁর রাসূল, তাঁর রূহ ও তাঁর পবিত্র কথামালা যা তিনি নিষ্পাপ কুমারী মারইয়ামের গর্ভাশয়ে ফুঁকে দিয়েছিলেন ।

তখন নাজ্জাসী জমিন থেকে একটি কাষ্ঠখণ্ড নিলেন। এরপর বললেন, আল্লাহর কসম! তোমরা যা কিছু বলেছ তার আগে বেড়ে ঈসা ইবনে মারইয়াম এ কাষ্ঠখণ্ডটির মতোও ছিলেন না। তার এ কথা শুনে সভাষদগণ গলা ঝারা দিলে তিনি বললেন, আল্লাহর কসম! যদিও তোমরা গলা ঝাড়া দিচ্ছ কিন্তু সত্য ব্যাপার তা-ই ছিল ।

অতঃপর তিনি মুসলমানদেরকে লক্ষ্য করে বললেন, আপনারা আমার এ রাজ্যে শান্তি ও নিরাপত্তার সঙ্গে থাকবেন। যে আপনাদেরকে গালি দিবে তার ওপর জরিমানা ধার্য করা হবে। আপনাদের কাউকে কষ্ট দেওয়ার বিনিময়ে আমার জন্য স্বর্ণের পাহাড় হবে এটা আমার কোনো দিনের কামনা নয়।

এরপর তিনি তার চারপাশে যারা বসা ছিলেন তাদেরকে নির্দেশ দিলেন, তোমরা এ লোক দুটির দেওয়া সমস্ত হাদিয়া তোহফা ফেরত দিয়ে দাও! কেননা, তা আমার কোনো প্রয়োজন নেই! আল্লাহর কসম! তিনি যখন আমার রাজ্য আমাকে ফিরিয়ে দিয়েছিলেন তখন তিনি আমার কাছ থেকে কোনো ঘুষ নেননি; সুতরাং আমি কি আজ তাঁর পথে ঘুষ নিতে পারি? তিনি আমার ক্ষেত্রে কোনো মানুষের কথা শুনেননি । সুতরাং, আমি কি তাঁর পথে মানুষের কথা শুনতে যাব?

এ ঘটনার বর্ণনাকারী উম্মে সালামা রা. বলেন, অতঃপর তারা দুজন ভগ্ন হৃদয়ে যা কিছু নিয়ে এসেছিল সবকিছু নিয়ে নাজ্জাসীর দরবার থেকে বেরিয়ে এলো। ওদিকে

আমরা নাজ্জাসীর সুন্দর রাজ্যে সুন্দর মানুষের সঙ্গে সুখ আর শান্তিতে সুন্দর জীবন যাপন করতে লাগলাম।[135]

এই হলো ইবনে ইসহাকের বর্ণনা। কোনো বর্ণনা মতে আমর বিন আসকে পাঠানো হয়েছিল বদর যুদ্ধের পরে। আবার কেউ কেউ এই উভয় বর্ণনার মাঝে

এভাবে সামঞ্জস্য বিধান করেছেন যে, তাকে মোট দুই বার পাঠানো হয়েছিল। তবে সে ক্ষেত্রে তারা দ্বিতীয় বার পাঠানোর ঘটনায় বাদশা নাজ্জাসী আর তাদের মাঝে হুবহু সেই কথপোকথন সওয়াল-জওয়াব তুলে ধরা হয়েছে যা ইবনে ইসহাক এখানে রেওয়ায়েত করেছেন। আর ঘটনায় বর্ণিত সুওয়ালগুলোর দ্বারাও বোঝা যায় এটা ছিল প্রথম বারের কথা। তাই গ্রহণযোগ্য মত হলো মুসলমানদেরকে ফিরিয়ে নেওয়ার প্রচেষ্টা মুশরিকদের তরফ থেকে একবারই চালানো হয়েছিল। আর তা ছিল হিজরতের অব্যবহিত পরের ঘটনা।

মদিনায় হিজরত

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও আবু বকর বেশ অনেক পথ পাড়ি দিয়ে ফেলেছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর জন্মভূমি মক্কাকে খুব ভালোবাসতেন। তাই তিনি মক্কা ত্যাগ করার সময় বারবার পিছনে ফিরে তাকিয়ে বলেছিলেন, 'আল্লাহর নামে বলছি, মক্কা আল্লাহ তাআলার কাছে সবচেয়ে প্রিয় নগরী। আমাকে যদি এখান হতে বের করে দেওয়া না হতো তাহলে আমি কখনো এ নগরী ছেড়ে যেতাম না। এখানে থেকে যাওয়ার কোনো সুযোগ থাকলে আমি মক্কা ত্যাগ করতাম না।'

মদীনা অভিমুখে তাদের যাত্রা শুরু হলো। কিছুক্ষণ পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খেয়াল করলেন আবু বকর কিছু সময় তাঁর আগে আগে হাঁটছেন আবার কিছু সময় তাঁর পিছন- পিছন হাঁটছেন। তাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, কী ব্যাপার? কখনো তুমি আমার সামনে চলছো, আবার কখনো পিছনে চলছো,

কেন?

আমার যখন মনে হয় কেউ আপনাকে সামনের দিক থেকে হঠাৎ আক্রমণ করতে পারে তখন আমি আপনার সামনে চলে যাই। আবার যখন মনে হয় কেউ আপনাকে পেছন থেকে আক্রমণ করতে পারে তখন আমি আপনার পিছন পিছন হাঁটি।

---

135 ইবনে হিশাম ১/৩৩৪-৩৩৮।

- আবু বকর, তুমি কোনটা চাও, আমার ক্ষতি নাকি তোমার ক্ষতি?

- আল্লাহর রাসূলহতে দিতে চাই না।আমার ক্ষতি হলে হোক, কিন্তু আপনার ক্ষতি হোক এটা আমি হতে দিতে চাই না।[136]

"এমন দু'জন সম্পর্কে তোমার কী ধারণা, যাদের তৃতীয় সঙ্গী হচ্ছেন আল্লাহ?"

এরপর তাঁরা একটি গুহার কাছে পৌঁছালেন। প্রথমে আবু বকর গুহার ভেতরে ঢুকে সবকিছু ভালোমতো পরীক্ষা করে দেখলেন যে, সেখানে কোনো সাপ, বিছা অথবা কোনো শত্রুদল ঘাপটি মেরে আছে কিনা। সবকিছু নিরাপদ দেখে তিনি রাসূলুল্লাহকে সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ভিতরে আসতে বললেন। কিন্তু কুরাইশ মুশরিকরা তাদের গতিবিধি নজরদারি করতে সক্ষম হয় এবং গুহার খুব কাছে চলে আসে। আবু বকর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে বললেন, 'হে আল্লাহর রাসূল, যদি মুশরিকদের কেউ মাথা নিচু করে পা বরাবর তাকায় তাহলে তারা আমাদের দেখে ফেলবে।' রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খুব নির্ভীক কণ্ঠে বললেন, 'আবু বকর, এমন দু'জন সম্পর্কে তোমার কী ধারণা, যাদের তৃতীয় সঙ্গী হচ্ছেন আল্লাহ? তুমি কি তাদের নিরাপত্তা নিয়ে চিন্তিত হবে?' গুহার খুব কাছে এসেও মুশরিকদের ফিরে যাওয়ার কারণটি ছিল খুবই অদ্ভূত। একটি অতি ঠুনকো মাকড়শার জাল।[137]

"...আর সব ঘরের মধ্যে মাকড়সার ঘরই তো অধিক দুর্বল..." (সূরা আনকাবূত, ২৯: ৪১)

যে মাকড়শার জালকে একটি আঙ্গুল দিয়ে ছিঁড়ে ফেলা যায়, সেই দুর্বল মাকড়সার জালই হয়ে গেল এখানে আল্লাহ তাআলার সৈনিক। এটিই গুহায় মুশরিকদের সৈনিকদের ঢুকতে বিরত রেখেছিল। আল্লাহ যদি চান, তিনি তাঁর সুবিশাল সৃষ্টির মধ্য থেকে সবচেয়ে দুর্বলতম সৃষ্টিকেও সৈনিক হিসেবে কাজে লাগাতে পারেন। হিজরতের দিনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সঙ্গী হিসেবে ছিলেন শুধু আবু বকর(রাঃ), সাহাবাদের কেউই সেখানে ছিলেন না। তার উপর মুশরিকরা তাদের ঘিরে রেখেছিল, কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে সেই ভয়ানক পরিস্থিতি থেকে বাঁচানোর জন্য আল্লাহ তাআলা নিজেই যথেষ্ট ছিলেন। এই ঘটনার পর আল্লাহ আয়াত নাজিল করেন,

---

136 আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৩য় খন্ড, পৃষ্ঠা ৩৩০।তবে সনদের বিবেচনায় বর্ণনাটি তেমন শক্তিশালী নয়।

137 আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৩য় খন্ড, পৃষ্ঠা ৩৩১।

"যদি তোমরা তাঁকে (রাসূলুল্লাহকে) সাহায্য না কর তাহলে আল্লাহই তাঁকে সাহায্য করবেন যেমন তিনি তাকে সাহায্য করেছিলেন সেই সময়ে যখন কাফিরেরা তাঁকে দেশান্তর করেছিল। তিনি ছিলেন দু'জনের একজন, যখন তাঁরা গুহার মধ্যে ছিলেন। তখন তিনি তাঁর আপন সঙ্গীকে বলেছিলেন, বিষন্ন হয়ো না, আল্লাহ আমাদের সাথে আছেন। অতঃপর আল্লাহ তাঁর প্রতি তাঁর পক্ষ থেকে প্রশান্তি নাযিল করলেন এবং তাঁর সাহায্যে এমন বাহিনী পাঠালেন, যা তোমরা দেখনি। বস্তুতঃ আল্লাহ কাফেরদের মাথা নীচু করে দিলেন আর আল্লাহর কথাই সদা সমুন্নত এবং আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।" (সূরা তাওবাহ, ৯:৪০)

আবু বকরের জন্য এই আয়াত একটি বিরাট সম্মান। কারণ এই আয়াতে আল্লাহ তাআলা আবু বকরকে আল্লাহর রাসূলের সঙ্গী বা সাহাবি হিসেবে উল্লেখ করেছেন।রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আবু বকরের সাথে সেই গুহাতে তিনদিন অবস্থান করেন। আবু বকরের ছেলে আবদুল্লাহ তাদের সাথে রাতের বেলা গুহায় অবস্থান করতো কিন্তু দিনের বেলা মক্কায় গিয়ে খোঁজ নিত মুশরিকরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ব্যাপারে কী পরিকল্পনা করছে। মুশরিকরা যাতে আবদুল্লাহর গুহায় যাওয়া-আসার বিষয়ে টের না পায় এজন্য সে আবু বকরের আযাদকৃত দাস আমির ইবন ফুহাইরাহকে বলে দিত সে যেন তার ভেড়ার পাল নিয়ে আবদুল্লাহর অনুসরণ করে। এতে দুটো সুবিধা, প্রথমত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও আবু বকর ভেড়ার দুধ পান করতে পারতেন। এতে তাদের খাবারের প্রয়োজন পূরণ হতো। দ্বিতীয়ত, ভেড়ার পাল আবদুল্লাহ ও আমিরের যাত্রাপথে তাদের পায়ের ছাপ নষ্ট করে দিত, ফলে তাদের গন্তব্যস্থল সম্পর্কে কেউ আঁচ করতে পারতোনা।এভাবেই তিনদিন চলে গেল। তিনদিন পর সেখানে আবদুল্লাহ ইবন উরাইকাত নামের এক ব্যক্তি এলো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও আবু বকরকে মক্কা থেকে মদীনায় নেওয়ার জন্য নবীজি তাকে ভাড়া করেছিলেন। সে ছিল মুশরিক। সাধারণত যে পথে সবাই মক্কা থেকে মদীনায় যায় আবদুল্লাহ ইবন উরাইক্বাত তাদেরকে সেই পথ দিয়ে না নিয়ে অন্য আরেকটি পথ দিয়ে নিয়ে যায়। মদীনা পৌঁছার আগ পর্যন্ত তাঁরা উপকূল ঘেঁষেচলতে থাকেন।

হুলিয়া জারি ও মাথার দাম ঘোষণা

কুরাইশের মুশরিকরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও আবু বকরকে ধরিয়ে দেওয়ার জন্য একশো উট পুরস্কার দেওয়ার ঘোষণা করে। জীবিত অথবা মৃত। তারা

মরুভূমির বেদুইন গোত্রসমূহের কাছে এই পুরস্কারের ঘোষণা জানিয়ে দেয়। তারা মরুভূমির পথঘাট সম্পর্কে দক্ষ ছিল। এমনই এক লোক ছিল সুরাকা ইবন মালিক। সে ছিল এক বেদুইন গোত্রের নেতা। হিজরতের একটি ঘটনা তার মুখে জানা যায়।[138]

“আমি বন্ধুদের সাথে বসে আড্ডা দিচ্ছিলাম। এমন সময় একজন এসে বললো, 'আমি দিগন্তের দিকে দুইজন লোককে দেখেছি। কুরাইশরা দুজনকে খুঁজছে। মনে হয় তারাই সেই লোক।' আমি তাকে বাধা দিয়ে বললাম, 'আরে না, তারা সেই লোক হতে পারে না। কিছুক্ষণ আগেও এই দুই লোক এখানে ছিল, এইমাত্র চলে গেছে।' আসলে আমি ঠিকই জানতাম যে ওই দুইজন লোক আসলে মুহাম্মাদ আর আবু বকর। কিন্তু আমি নিজেই একশ উট পাওয়ার লোভে তাদেরকে মিথ্যে বলি।'

এরপর সুরাকা সেখানে আরো কিছুক্ষণ বসে থাকলো। কারণ চট করে উঠে গেলে কেউ তাকে সন্দেহ করতে পারে। তারপর সে বাসায় গিয়ে তার চাকরকে বললো তার ঘোড়াটি প্রস্তুত করে লুকিয়ে রাখতে। কিছুক্ষণ পর সে পেছনের দরজা দিয়ে বের হয়ে যায়। সাথে নেয় একটি লম্বা বর্শা। কেউ যেন সেই বর্শা দেখতে না পায় এজন্য সে বর্শাটি মাটির সাথে ঘেঁষে ঘেঁষে নিয়ে গেল। তারপর ঘোড়ায় চড়ে সে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও আবু বকরকে ধরার জন্য রওনা দিল। কিছুক্ষণ পর আবিষ্কার করলো সে ওই লোকের দাবিই ঠিক। ওই দুই লোক আসলেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং আবু বকর(রাঃ)।

কোটিপতি হওয়ার সুযোগ থেকে সুরাকা মাত্র অল্প কিছু হাত দূরে। অন্যদিকে, আবু বকর বারবার পিছনে ফিরে তাকাচ্ছিলেন আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিশ্চিন্তমনে কুরআন পাঠ করছিলেন। তিনি একবারও পিছন ফিরে তাকাননি। তিনি নিশ্চিতভাবেই জানতেন যে আল্লাহ তাআলা তাদেরকে বিজয়ী হতে সাহায্য করবেন। আবু বকর নিজেকে নিয়ে চিন্তিত ছিলেন না, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিরাপত্তা নিয়ে চিন্তিত ছিলেন। কিছুক্ষণ পর আবু বকর বুঝতে পারলেন কেউ একজন তাদের অনুসরণ করছে। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে ব্যাপারটি জানালেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর কাছে দুআ করলেন। তৎক্ষণাৎ সুরাকা ঘোড়া থেকে পড়ে গেল আর ঘোড়াটি মাটিতে বসে গেল। লোভী সুরাকা আবার ঘোড়াটিকে সামলানোর চেষ্টা করলো কিন্তু সে আবার ঘোড়া থেকে পড়ে গেল। এমন ঘটনা তার জীবনে আর কখনো ঘটেনি।

138 সীরাত ইবনে হিশাম, ২য় খন্ড, পৃষ্ঠা ১৬১।

তৃতীয়বার যখন একই ঘটনা ঘটলো তখন সুরাকার চোখেমুখে একরাশ ধূলি এসে পড়ল। সুরাকা বুঝতে পারল যে এই লোকের সাথে আল্লাহর সাহায্য আছে। এরপর সে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে অনুরোধ করলো যেন তাকে ছেড়ে দেওয়া হয়। কিছুক্ষণ আগেও যে ব্যক্তি পুরস্কারের লোভে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে কুরাইশদের হাতে তুলে দেওয়ার জন্য খুঁজছিল এখন সে নিজের বেঁচে থাকা নিয়েই চিন্তিত। সুরাকা বললো, 'আমার নিরাপত্তার জন্য একটি চিঠি লিখে দিন।' রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও আমির ইবন ফুহাইরাহকে একটি নিরাপত্তাপত্র লেখার নির্দেশ দিলেন। পত্রটি লেখা হয়েছিল চামড়া অথবা হাড়ের উপর। সুরাকা এই পত্রটিকে স্মারকচিহ্ন হিসেবে নিজের কাছে রেখে দেয়। ৮-৯ বছর পরে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর পারস্য অবরোধের সময় সুরাকা মুসলিমদের হাতে বন্দী হয়। সুরাকা তখন সেই নিরাপত্তা পত্রটি বের করে দেখালে মুসলিমরা তাকে ছেড়ে দেয়।

নিরাপত্তাপত্র যোগাড় করে সুরাকা মক্কায় ফিরে যায়। সেখানে গিয়ে সে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে খোঁজাখুঁজি করার ব্যাপারে কুরাইশদের নিরুৎসাহিত করতে লাগল। রাসূলুল্লাহই সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে এই কাজটি করতে অনুরোধ করেছিলেন। এভাবে সুরাকা হয়ে গেল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর পাহারাদার, অথচ কিছুক্ষণ আগেও সে পুরস্কারের লোভে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে ধরার জন্য তৎপর ছিল।

যাত্রাবিরতি: উম্ম মা'বাদের তাঁবু

যাত্রাপথে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও আবু বকর খুযাআ গোত্রের উম্ম মা'বাদ নামক এক মহিলার তাঁবুর কাছে থামেন। উম্ম মা'বাদ ছিলেন একজন দানশীল মহিলা। তাঁবুর পাশ দিয়ে যাওয়া পথিকদের তিনি আপ্যায়ন করতেন। কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও আবু বকরকে উম্ম মা'বাদ কিছুই দিতে পারেননি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উম্ম মা'বাদের কাছে খাবারের খোঁজ করেন। উম্ম মা'বাদ বললেন যে যদি দেওয়ার মতো কিছু থাকতো তাহলে তাঁর কাছে চাওয়া লাগতো না, বরং তিনি নিজে থেকেই দিতেন। আসলে উম্মা মা'বাদের শুধু একটি দুর্বল বকরী ছিল। খরার কারণে সেটির দুধ শুকিয়ে গিয়েছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বকরীর দুধ দোহানোর জন্য তাঁর কাছে অনুমতি চান। উম্ম মা'বাদ তাঁকে অনুমতি দেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর কাছ থেকে একটি বড়

পাত্র চেয়ে নেন। তিনি বকরীটিকে স্পর্শ করামাত্রই বকরীটি দুধ দেওয়া শুরু করে। পাত্র না ভরা পর্যন্ত বকরীটি দুধ দিতে লাগল। পাত্রটি ভরে গেলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রথমে তা উমা মা’বাদকে দেন। এরপর একে একে সবাই তৃষ্ণা মিটিয়ে দুধ পান করেন।রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সবার শেষে দুধ পান করেন। দুধ পান শেষে তিনি বলেন, “ঘরের সেবকরা সবার শেষেই পান করে।' রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উম্ম মা'বাদের জন্য পাত্রে কিছু দুধ রেখে দেন। উম্ম মা'বাদের স্বামী বকরীর পাল নিয়ে বাড়িতে ফিরে এসে দুধ দেখে স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করলেন, ‘এই দুধ কোথা থেকে এল?” উম্ম মা'বাদ বললেন, ‘এক বরকতময় লোক এসেছিলেন আজ। তিনি-ই বকরীর দুধ দোহন করেছেন।' আবু মা'বাদ স্ত্রীর কাছে সেই লোকের বর্ণনা শুনতে চাইলেন। উম্ম মা'বাদ রাসূলুল্লাহকে একবার মাত্র দেখেছিলেন। কিন্তু যে বর্ণনা তিনি দিয়েছেন তা এখন পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সম্পর্কে দেওয়া শ্রেষ্ঠ বর্ণনা।

‘আমি তাঁকে দেখেছি, উজ্জ্বলদীপ্ত চেহারা, সুন্দর তাঁর গড়ন, সুদর্শন তাঁর মুখশ্রী, ছিপছিপে তাঁর শরীর। মাথাটা খুব ছোট নয়, বরং দেখতে তিনি অভিজাত এবং সুপুরুষ। চোখদুটো তাঁর ঘনকালো, পাঁপড়িগুলো টানাটানা। বুদ্ধিদীপ্ত তাঁর চেহারা, ভরাট তাঁর কণ্ঠস্বর। ভ্রু-যুগল উঁচু আর ধনুকের মতো বাকাঁনো, চুলগুলো পরিপাটি। তাঁর গ্রীবা বিস্তৃত এবং দাড়ি বেশ ঘন। তাঁর গাম্ভীর্য তাঁর আত্মমর্যাদা প্রকাশ করে, তাঁর কথা বুদ্ধিমত্তার পরিচয় বহন করে। তাঁর কথাগুলো মনোমুগ্ধকর আর দৃঢ়, চটুল কিংবা ফেলনা নয়। তাঁর প্রতিটি শব্দ যেন সুতোয় বাঁধা মুক্তোর মতো মসৃণ। দূর থেকে তাঁকে দেখতে যেমন উজ্জ্বল আর আকর্ষণীয়, কাছ থেকে দেখলেও তাঁকেই সবচেয়ে সুদর্শন লাগে। উচ্চতায় তিনি মাঝারি। খুব লম্বাও নন আবার খাটোও নন। বাকি দুইজনের মাঝে তিনি উঁচু বৃক্ষের শাখার মতো, তবে তিনজনের মাঝে তিনিই সবচে সুন্দর। তিনি ছিলেন তাঁর সঙ্গীদের আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু। তিনি যখন কথা বলতেন, তারা মন দিয়ে শুনতো, তিনি যখন কিছু আদেশ দিতেন তা পালন করতে তারা ছুটে যেতো। তিনি কখনও মুখ গোমড়া করেননি। আর কেউ একবারও তাঁর কথার বিরোধিতা করেনি।[139]
বর্ণনা শুনে আবু মা'বাদ বললেন, 'এই লোকটি নিশ্চয়ই মুহাম্মাদ। তাঁকে তো কুরাইশরা খুঁজে বেড়াচ্ছে। আমি যদি তাঁর সাথে দেখা করতে পারতাম তাহলে তাঁর কাছে মুসলিম

139 যাদুল মাআদ, ২য় খন্ড।

হওয়ার স্বীকারোক্তি দিতাম।' তাঁর স্ত্রী উম্ম মা'বাদ আগেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছে ইসলাম গ্রহণের স্বীকারোক্তি দিয়ে মুসলিম হয়েছিলেন।

মদীনায় প্রবেশ

জুমুআর পরে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আবারও চলতে শুরু করলেন। কিছুক্ষণ পরেই তিনি মদীনায় প্রবেশ করলেন। এটাই ছিল সেই ঐতিহাসিক দিন যেদিন ইয়াসরিবের কপাল খুলে গিয়েছিল। তার ভাগ্যাকাশে অগণিত অসংখ্য সৌভাগ্য তারার মেলা বসেছিল। সেই দিন সে একটি নতুন নাম পেয়েছিল। 'মদীনাতুর রাসূল' নামের সুরভী নিয়ে সে যেন পৃথিবীর মানচিত্রে সে দিন নতুন করে আত্মপ্রকাশ করেছিল। গোটা দিগন্ত সেই দিন সাআদাতির ঝিলিমিলি দেখে খুশিতে বাগবাগ হয়ে গিয়েছিল। তার প্রতিটি অলিগলিতে আল্লাহর তাআলার হামদ আর তাকবীর ধ্বনির মিছিল বের হয়েছিল। ঘরে ঘরে চাঁদের হাট বসেছিল। নিষ্পাপ আনসার বালিকাদের আবেগভরা কলকাকলি আর গানে গানে গোটা মদীনা নৃত্য করছিল।[140]

طَلَعَ الْبَدْرُ عَلَيْنَا   مِنْ ثَنِيَّاتِ الْوَدَاعْ
وَجَبَ الشُّكْرُ عَلَيْنَا   مَا دَعَا لِلّٰهِ دَاعْ
أَيُّهَا الْمَبْعُوثُ فِينَا   جِئْتَ بِالْأَمْرِ الْمُطَاعْ
جِئْتَ شَرَّفْتَ الْمَدِينَةْ   مَرْحَباً يَا خَيْرَ دَاعْ

'সানিয়াতুল বিদা'র (দক্ষিণে অবস্থিত) পর্বতগুলি থেকে আমাদের ওপর চতুর্দশী চাঁদের উদয় হলোআল্লাহর শোকরিয়া আদায় আমাদের কর্তব্য! যতক্ষণ আল্লাহর দিকেআহ্বানকারী আহ্বান করতে থাকবে।হে আমাদের মাঝে প্রেরিত মহান! আপনি অনুসরনীয় ইসলাম নিয়েএসেছেন ।জাগতিক ধন-সম্পদের বাহারে মদীনার আনসারগণ সমৃদ্ধ না হলেও হৃদয় আর মনের ধনের অকৃপণ পাচুর্যে তাদের প্রত্যেকেই পরম সমৃদ্ধ ও ধনী ছিল। আর এ কারণেই সকলের দিলের তামান্না ছিল একটিই- যদি আল্লাহর প্রিয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমার ঘরের মেহমান হতেন! এ কারণে রাসূলের কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর উষ্ট্রী যার ঘরের সামনে দিয়ে গমন করত সে-ই তার লাগাম ধরে বলত: পরিমিত সামান-আসবাব, হাতিয়ার আর

---

140 আল্লামা ইবনুল কায়্যিম র. এর মতে, এ কবিতাগুলো রাসূলে কারীম সা. তাবুক থেকে ফিরে এলে আবৃত্তি করা হয়েছিল। আর যারা বলে এগুলো তিনি হিজরত করে মদীনায় এলে আবৃত্তি করা হয়েছিল তাদের এটা কেবল ধারণা ও ঊষর কল্পনা মাত্র। দেখুন যাদুল মাআদ ৩/১০। কিন্তু আল্লামা ইবনুল কায়্যিম র. তাঁর এ মতের সমর্থনে কোনো স্পষ্ট ও নির্ভরযোগ্য দলীল পেশ করেননি। অপরদিকে প্রাজ্ঞপুরুষ আল্লামা সুলাইমান মানসূরপুরী র. বনী ইসরাঈলের আম্বিয়ায়ে কেরামের বিভিন্ন সহীফার ইশারা ইঙ্গিত ও খোলাখুলি বক্তব্য দ্বারা প্রমাণ করেছেন যে, এগুলো ঠিকই রাসূলে কারীম সা. এর হিজরত করে মদীনায় আগমন কালে আবৃত্তি করা হয়েছিল। তবে উভয় সময়ই আবৃত্তি করাও কোনো অসম্ভব ব্যাপার নয়।

সুন্দর প্রতিরক্ষার মাঝে তাশরীফ আনুন! কিন্তু রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে বলতেন, ‘তার পথ ছেড়ে দাও! কেননা সে আল্লাহর পক্ষ থেকে আদিষ্ট' । এভাবে চলতে চলতে উষ্ট্রী ঠিক সেই জায়গায় এসে পৌঁছল আজ যেখানে মাথা উঁচু করে সগৌরবে দাঁড়িয়ে আছে মসজিদে নববী। কিন্তু রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অবতরণ করলেন না। কিছুক্ষণ পর উষ্ট্রী উঠে দাঁড়ালো এবং কয়েক কদম সামনে বাড়ল। এরপর পেছনে ফিরে আবারও আগের জায়গায় এসে বসে পড়ল। তখন রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার পিঠ থেকে মাটিতে অবতরণ করলেন। এটা ছিল রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর মামার বংশ বনু নাজ্জার গোত্র। উষ্ট্রীর এ অবস্থা মূলত আল্লাহ তাআলার পূর্বলিখিত বিধানেরই বাস্তব রূপায়ণ ছিল। তার ভাগ্য ছিল। এ কারণে আগ থেকেই আল্লাহ তাআলা তার কপালে এই মহা সৌভাগ্য লিখে দিয়েছিলেন। কারণ রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দিলের তামান্নাও ছিল তাদের মধ্যে অবতরণ করে তাদেরকে মর্যাদাবান ও সৌভাগ্যবান করা। তখন সবাই রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর প্রতি নিজেদের মেহমান হওয়ার জন্য আবেদন জানাতে লাগল। কিন্তু সাহাবী হযরত আবু আইউব আনসারী রা. সকলের আগে বেড়ে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর হাওদা উঠিয়ে নিজের ঘরে নিয়ে গেলেন। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, 'হাওদা যার ঘরে যাবে ব্যক্তিও তো সেই ঘরেই যাবে'। ওদিকে হযরত আসআদ বিন যুরারা রা. এসে রাসূলের উষ্ট্রীর লাগাম ধরে ফেললেন । এ কারণে পরিশেষে সেটি তাঁর কাছেই রয়ে গিয়েছিল।[141]সহীহ বুখারী শরীফে হযরত আনাস রা. বর্ণনা করেন, আল্লাহর নবী তখন বললেন, আমাদের এখানে কার ঘর অধিক নিকটবর্তী? তখন আবু আইউব রা. বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এই তো আমার ঘর। এই তো আমার দরজা । তখন তিনি বললেন, 'চলো। আমাদের জন্য শোয়ার জায়গা প্রস্তুত করো'। তিনি বললেন, আপনারা উভয়ে তাশরীফ আনুন! আল্লাহ বরকত দিবেন ইনশাআল্লাহ।[142] কিছুদিন পর রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর স্ত্রী উম্মুল মুমিনীন হযরত সওদা রা., তাঁর দুই কন্যা ফাতেমা ও উম্মে কুলসূম রা, উসামা বিন যায়েদ রা. ও উম্মে আয়মন রা. মদীনায় এসে পৌঁছলেন। ওদিকে আবু বকর রা. এর ছেলে আব্দুল্লাহ ইবনে আবু বকরও উম্মুল

141 ইবনে হিশাম ১/৪৯৪-৪৯৬। যাদুল মাআদ ২/৫৫।

142 সহীহ বুখারী ১/৫৫৬।

মুমিনীন আয়েশা রা. সহ নিজ পরিবার নিয়ে মদীনার পথে যাত্রা করেন। কিন্তু নবী নন্দিনী হযরত যয়নব রা. এর বের হওয়া সম্ভব হলো না। তাই তিনি স্বামী আবুল আসের কাছে রয়ে যান। পরবর্তী সময় বদর যুদ্ধের পরে হিজরত করেন।[143] আয়েশা রা. বলেন, আমরা যখন মদীনায় এলাম তখন তা ছিল আল্লাহর দুনিয়ার সবচেয়ে মারাত্মক মহামারী-উপদ্রুত ভূখণ্ড। বুতহান উপত্যকা থেকে তখন লোণা পানি প্রবাহিত হতো।তিনি বলেন, রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর মদীনায় আগমনের পরপরই আবু বকর রা. ও বেলাল রা. অসুস্থ হয়ে পড়লেন। তখন আমি একদিন তাদের কাছে গেলাম।

আবু বকর রা. কে আমি বললাম, আব্বাজান ! ! আপনার শারীরিক অবস্থা কেমন? বেলাল রা. কে বললাম, হে বেলাল! আপনার শরীরটা কেমন? আয়েশা রা. বলেন, যখন আবু বকরকে জ্বরের প্রচণ্ডতা আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ধরত তখন তিনি বলতেন , كُلُّ امْرِئٍ

مُصَبَّحٌ فِي أَهْلِهِ ... وَالْمَوْتُ أَدْنَى مِنْ شِرَاكِ نَعْلِهِ

‘ঘরের সবাই ‘সুপ্রভাত' জ্ঞাপন করছে; অথচ মৃত্যু তাঁর জুতোর ফিতার চেয়েও নিকটে। যখন বেলাল রা. এর খানিকটা হুঁশ ফিরত তিনি উচ্চস্বরে বলে উঠতেন, أَلَا لَيْتَ شِعْرِي

هَلْ أَبِيتَنَّ لَيْلَةً ... بِوَادٍ وَحَوْلِي إِذْخِرٌ وَجَلِيلُوَهَلْ أَرِدَنْ يَوْمًا مِيَاهَ مِجَنَّةٍ ... وَهَلْ تَبْدُونَ فِي شَامَةٌ وَطَفِيلُ

হায় যদি আমি জানতাম যে, কোনো রাত (মক্কার) উপত্যকায় যাপন করতে পারব আর আমার চারপাশে ইযখির ও জালীল (ঘাস বিশেষ) থাকবে!হায় কোনো দিন কি মিজান্না কূপের পাড়ে নামতে পারব! কোনো দিন কি আমার শামা আর তুফাইল (পর্বত) দেখা হবে' !!

আয়েশা রা. বলেন, তখন আমি রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকটে এলাম। এসে তাকে সবকিছু খুলে বললাম। তিনি বললেন, হে আল্লাহ! আপনি শাইবা বিন রবীআ, উতবা বিন রবীআ, ও উমাইয়া বিন খলফের ওপর অভিসম্পাত নাযিল করুন। কারণ তারা বড় নির্মমতার সঙ্গে আমাদেরকে আমাদের ভূমি থেকে বের করে এই মহামারী-উপদ্রুত ভূমিতে ঠেলে দিয়েছে। অতঃপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, হে আল্লাহ! মক্কা আমাদের কাছে যতটা প্রেমময়ী ও প্রিয়তমা ছিল আপনি মদীনাকেও আমাদের নিকট তত কিংবা তার চেয়েও বেশি প্রেমময়ী করে দিন।

143 যাদুল মাআদ ২/৫৫।

এবং এটার আবহাওয়া আপনি নির্মল ও বিশুদ্ধ করে দিন! এর সবকিছুতে আপনি বরকত দিন। এবং তার থেকে আপনি তার জ্বরকে উঠিয়ে জুহফাতে নিয়ে যান।[144] আল্লাহ তাআলা তাঁর দোআ কবুল করলেন। এর পরপরই আমি স্বপ্নে দেখতে পেলাম এলোমেলো ও আলুথালুকেশী এক কৃষ্ণাঙ্গ নারী-প্রকৃতি মদীনা থেকে বের হয়ে মাহয়া তথা জুহফাতে গিয়ে অবতরণ করল। মূলত তা ছিল মদীনার প্লেগ জুহফাতে স্থানান্তরিত হওয়ার একটি নমুনা। এভাবে মুহাজিররা মদীনার প্রতিকূল আবহাওয়ার কারণে যে সঙ্গিন অবস্থার মধ্যে কালাতিপাত করছিলেন তা থেকে নাজাত পেলেন। প্রতিকূলতার ঘনঘোর অন্ধকার রাতের অমানিশা কেটে গিয়ে তাদের জীবনে নেমে এলো শান্তি আর মুক্তির আলোর ভোর ।এই পর্যন্ত ছিল নবুওতের পর থেকে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর মক্কী জীবনের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত।

ইসরা ও মি'রাজ

নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন চড়াই-উতরাই ভরা শ্বাপদসংকুল এ পথে বার বার হোঁচট খাচ্ছিলেন। এক বার আকাশ ভরা স্বপ্ন নিয়ে সামনে দৌড়ে যাচ্ছিলেন আরেক বার জীবন যুদ্ধে বাস্তবতার প্রচণ্ড ঝড়ের মুখোমুখি হয়ে থমকে দাঁড়াচ্ছিলেন। ইসলামের তরণী আরব সাগরের তরঙ্গোদ্বেল বুকে কখনো পাল তুলে হেলে দুলে চলছিল আবার পরক্ষণেই মাতাল সমুদ্রের তুফানের কোলে পড়ে গন্তব্য ছেড়ে কাত হয়ে যাওয়ার উপক্রম করছিল। কিন্তু আশার পাল্লা-ই যখন ভারী ছিল; অসফলতার বদলে সফলতার গতি ও মাত্রা বেশি ছিল; আশার তারাগুলি সুদূর দিগন্তে ঝিকিমিকি করতে শুরু করেছিল; ঠিক তখনই রিসালতের জীবনে ইসরা ও মি'রাজের ঘটনা ঘটেছিল।ঐতিহাসিকগণ ইসরা ও মিরাজের তারিখ নির্ণয়ের ক্ষেত্রে চরম মতানৈক্যের জন্ম দিয়েছেন:

এক. কারও কারও মতে, ইসরার ঘটনা সে বছরই ঘটেছিল যে বছর আল্লাহ তাআলা রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে নবুওতের ধনে ধন্য করেছিলেন। তাবারী র. এ মত গ্রহণ করেছেন।

---

144 সহীহ বুখারী ও ফাতহুল বারী ৪/১১৯, হাদীস নং ১৮৮৯। আরও দেখুন হাদীস নং ৩৯২৬, ৫৬৫৪,৫৬৭৭, ৬৩৭২ ।

দুই. কারও কারও মতে এটি ছিল তাঁর নবুওত লাভের পাঁচ বছর পরের ঘটনা। নববী র. ও কুরতুবী এ বক্তব্যকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন।

তিন. কেউ কেউ বলেন, ইসরা ও মি'রাজ হয়েছিল নবুওতের দশম বছরের ২৭ শা রজব দিবাগত রাতে ।

চার. কারও মতে, হিজরতের ছয় মাস আগে তথা নবুওতের দ্বাদশ বছরের রমযান মাসে।

পাঁচ. কেউ বলেন, হিজরতের এক বছর দুই মাস আগে তথা নবুওতের ত্রয়োদশ বছরের মুহাররম মাসে।

ছয়. কারও বক্তব্য হলো, হিজরতের এক বছর আগে তথা নবুওতের ত্রয়োদশ বছরের রবীউল আউয়াল মাসে।কিন্তু উল্লিখিত ছয়টি বক্তব্যের মধ্য থেকে প্রথম তিনটি কখনোই বিশুদ্ধ হতে পারে না। কেননা, হযরত খাদীজা রা. এর ইন্তেকাল হয়েছিল নবুওতের দশম বছরের রমযান মাসে। আর এটা সর্বসম্মত যে, হযরত খাদীজা রা. এর ওফাত হয়েছিল পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরয হওয়ার আগে। এ ব্যাপারেও কোনো মতানৈক্য নেই যে, পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরয হয়েছিল ইসরার রাতে। পরবর্তী তথা শেষ তিনটির কোনো একটিকে প্রাধান্য দেওয়ার যথাযথ কোনো কারণ আমরা খুঁজে পাইনি। তবে এটা তো সুনিশ্চিত যে, সূরা বনী ইসরাঈলের আগপরের আয়াত দ্বারা বোঝা যায়, রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন দাঁড়িয়ে ছিলেন মক্কী জীবনের বেলাভূমিতে ঠিক তখনই সংঘটিত হয়েছিল ইসরার ঘটনা।হাদীসের ইমামগণ তাদের গ্রন্থসমূহে সবিস্তারে এ ঘটনা বর্ণনা করেছেন । নিম্নে আমরা অতি সংক্ষিপ্ত আকারে এ ব্যাপারে আলোচনা করছি:ইবনুল কাইয়্যিম রহ. বলেন, বিশুদ্ধ বর্ণনা অনুযায়ী নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ইসরা স্বশরীরের হয়েছিল। তিনি একটি বোরাকে আরোহণ করে জিবরাঈল আ. এর সঙ্গে মসজিদুল হারাম থেকে মসজিদুল আকসায় (বাইতুল মুকাদ্দাস) চলে আসেন। অতঃপর সেখানে অবতরণ করে। বোরাকটি বাইতুল মুকাদ্দাসের দরজার কপাটের সঙ্গে বেঁধে সকল নবী ও রাসূলের ইমাম হয়ে নামাজ আদায় করেন ।এরপর সে রাতেই বাইতুল মুকাদ্দাস থেকে হযরত জিবরাঈল আ. এর সঙ্গে তাকে দুনিয়ার আকাশে ওঠানো হয়। জিবরাঈল আ. দরজা খুলতে বললে আকাশের দরজা খুলে গেল। তারা সেখানে গোটা মানব জাতির পিতা হযরত আদম আ. কে দেখতে পেলেন। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে সালাম দিলেন। তিনিও সালামের উত্তর দিয়ে তাকে স্বাগত জানালেন এবং তাঁর নবুওতের

স্বীকৃতি দিলেন। এরপর আল্লাহ তাআলা তাকে হযরত আদম আ. এর ডান পাশে দুনিয়ার সকল ভাগ্যবান আর বাম পাশে সকল হতভাগাকে দেখিয়ে দিলেন।এরপর তাকে দ্বিতীয় আকাশে উঠিয়ে নেওয়া হয়। দ্বিতীয় আকাশের দরজা খুলে দেওয়া হলে তারা সেখানে ইয়াহইয়া বিন যাকারিয়্যা এবং ঈসা ইবনে মারইয়াম আ. কে দেখতে পান। তিনি তাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং তাদেরকে সালাম করেন। তারাও সালামের উত্তর দিয়ে তাকে স্বাগত জানালেন এবং তাঁর নবুওতের স্বীকৃতি দিলেন ।এরপর তাকে তৃতীয় আকাশে ওঠানো হয় এবং সেখানে তিনি ইউসুফ আ. কে দেখতে পান। তিনি তাকে সালাম দিলেন। তিনিও সালামের উত্তর দিয়ে তাকে স্বাগত জানালেন এবং তাঁর নবুওতের স্বীকৃতি দিলেন ।অতঃপর তাকে চতুর্থ আকাশে ওঠানো হয় এবং সেখানে তিনি ইদরীস আ. কে দেখতে পান। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে সালাম দেন। তিনিও সালামের উত্তর দিয়ে তাঁকে স্বাগত জানান এবং তাঁর নবুওতের স্বীকৃতি দেন । এরপর তাকে পঞ্চম আকাশে ওঠানো হয় এবং সেখানে তিনি হারূন বিন ইমরান আ. কে দেখতে পান। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে সালাম দেন। তিনিও সালামের উত্তর দিয়ে তাঁকে স্বাগত জানান এবং তাঁর নবুওতের স্বীকৃতি দেন।এরপর তাকে ষষ্ঠ আকাশে ওঠানো হয় এবং সেখানে তিনি মূসা বিন ইমরান আ. এর সাক্ষাৎ লাভ করেন। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে সালাম দেন। তিনিও সালামের উত্তর দিয়ে তাঁকে স্বাগত জানান এবং তার নবুওতের স্বীকৃতি দেন। কিন্তু যখন তাকে অতিক্রম করে যাচ্ছিলেন তখন মূসা আ. কাঁদতে শুরু করলেন। তাকে কাঁদার কারণ জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি উত্তর দিলেন, আমি কাঁদছি এ কারণে যে, আমার কত পরে এক যুবককে নবী করে পাঠানো হলো অথচ আমার উম্মতের চেয়ে তাঁর উম্মত অধিকসংখ্যায় জান্নাতে প্রবেশ করবে।অতঃপর তাকে সপ্তম আকাশে ওঠানো হয়। তিনি সেখানে ইবরাহীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে সালাম দেন। তিনিও সালামের উত্তর দিয়ে তাকে স্বাগত জানান এবং তাঁর নবুওতের স্বীকৃতি দেন ।এরপরে তাকে সিদরাতুল মুনতাহায় ওঠানো হয়। সেখানে তিনি তার ফলগুলো আরবের হিজর এলাকার মটকার মত এবং তার পত্র-পল্লবগুলো হাতির কানের মতো দেখতে পান। তাকে স্বর্ণের পঙ্গপাল, বর্ণাঢ্য নূর ও বিচিত্র রঙ একযোগে ঘিরে ফেলে। তখন তার রূপ-রেখা পরিবর্তন হয়ে যায়। আল্লাহর কোনো মাখলুকই তার সেই অপরূপ লাবণ্য আর সৌন্দর্যের খানিকটা বিবরণ দিতেও সক্ষম

নয়। এরপর তার সামনে বাইতুল মা'মূর তুলে ধরা হল । সেখানে প্রতিদিন সত্তর হাজার ফেরেশতা ইবাদতের জন্য প্রবেশ করে; আর একবার যে প্রবেশ করে কেয়ামতের আগ পর্যন্ত সে দ্বিতীয় বার প্রবেশের অনুমতি ও সুযোগ পায় না। এরপর তাঁকে জান্নাতে প্রবেশ করানো হয়। তিনি তাতে অমূল্য মণি- মাণিক্যের বিভিন্ন জাল ছড়ানো ছিটানো দেখতে পান। তার মাটিতে মেশকের পুরু আস্তরণ দেখতে পান। এরপরে তাকে আরও ওপরে এমন এক স্তরে নিয়ে যাওয়া হয় যেখানে ভাগ্য লিপিকর কলমের ঠকঠক আওয়ায শোনা যাচ্ছিল।এরপর তাকে সর্বশ্রেষ্ঠ ক্ষমতাধর, গোটা জগৎ সংসারের একচ্ছত্র অধিপতি আল্লাহ তাআলার কাছে নিয়ে যাওয়া হয়। তিনি ধীরে ধীরে তাঁর দিকে অগ্রসর হন। একসময় তাঁর একেবারে কাছে থেকে কাছে চলে যান; যখন রাসুলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সালাম আর তাঁর মাঝে ব্যবধান ছিল মাত্র দুই ধনুকের কিংবা তার চেয়েও কম। এরপর তিনি আপন বান্দার ওপর যা ওহী করার ওহী করেন এবং তাঁর ওপর পঞ্চাশ ওয়াক্ত নামায ফরয করেন। এরপর তিনি ফিরতি পথ ধরেন। পথিমধ্যে হযরত মূসা আ. এর সঙ্গে তার সাক্ষাৎ হলে তিনি তাকে জিজ্ঞাসা করেন, আল্লাহ তাআলা আপনাকে কীসের আদেশ দিয়েছেন? তিনি বললেন পঞ্চাশ ওয়াক্ত নামাযের। তিনি বললেন, আপনার উম্মত এত ওয়াক্ত নামায আদায় করতে পারবে না। আপনি আপনার প্রভুর নিকট ফিরে যান এবং স্বীয় উম্মতের ওপর তাঁর হুকুম হালকা করার জন্য আবেদন করুন। এরপর তিনি জিবরাঈল আ. এর দিকে চোখ তুলে তাকালেন। যেন তিনি তার কাছে পরামর্শ চাইলেন। জিবরাঈল আ. তাঁকে এটাই বুঝালেন যে হ্যাঁ, যদি চান করতে পারেন। এরপর তিনি আবার তাকে নিয়ে ঊর্ধ্বাকাশে আল্লাহর কাছে ছুটে চলেন। তিনি তখন তাঁর স্থানে অবস্থান করছিলেন (বুখারীর সূত্রে বর্ণিত)। অতঃপর আল্লাহ তাআলা দশ ওয়াক্ত নামায কমিয়ে দেন। এরপর রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নীচের দিকে অবতরণ করে আবার হযরত মূসা আ. এর পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। যাওয়ার সময় তাকে সংবাদ দিলেন। তিনি বললেন : আপনি আবার আপনার রবের নিকট ফিরে গিয়ে আরও হালকা করে দেওয়ার অনুরোধ করেন! এভাবে একদিকে তিনি একবার আল্লাহর কাছে আরেকবার মূসা আ. কাছে আসা যাওয়া করতে থাকেন। আর অপরদিকে পঞ্চাশ ওয়াক্ত নামাযও কমতে কমতে পাঁচ ওয়াক্তে এসে পৌঁছে। এরপরও যখন মূসা আ. তাকে আল্লাহর কাছে গিয়ে হালকা করার অনুরোধ করার পরামর্শ দিলেন তখন তিনি মূসা আ. কে বললেন, এ বিষয়টি নিয়ে আমার রবের কাছে যেতে এখন আমার লজ্জা করে। আমি

বরং এতেই তুষ্ট রয়েছি এবং মাথা পেতে মেনে নিয়েছি। পরক্ষণেই মহাশূন্যের বিশালতায় এক গুরুগম্ভীর ঘোষণা শোনা গেল: আমি আমার ফরয নির্ধারণ করে দিলাম এবং আমার বান্দাদের থেকে হালকা করে দিলাম।[145] এরপর ইবনুল কাইয়্যিম র. রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর আল্লাহকে দেখার ব্যাপারে যে মতানৈক্য রয়েছে তা বর্ণনা করেছেন। অতঃপর এ ব্যাপারে আল্লামা ইবনে তাইমিয়া র. এর মতামত উল্লেখ করেছেন। যার সার নির্যাস হলো: রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর মানবচক্ষু দিয়ে আল্লাহ তাআলাকে দেখা কোনো ভাবেই প্রমাণিত নয়। রাসূলের একজন সাহাবী থেকেও এমন বর্ণনা পাওয়া যায় না। আর ইবনে আব্বাস রা. থেকে সাধারণভাবে দেখা আর অন্তরচক্ষু দিয়ে দেখা সম্পর্কে যে দুটি বর্ণনা পাওয়া যায় তার প্রথমটি দ্বিতীয়টির বিপরীত ও বিরোধী নয়।

এরপর ইবনুল কাইয়্যিম র. লেখেন, কুরআনে কারীমের সূরা নাজম-এ উল্লিখিত আয়াত (এরপরে আরও কাছে এলেন এবং ঝুঁকে গেলেন আর ইসরার ঘটনা সম্পর্কে বর্ণিত হাদীসে 'নিকটবর্তী' হওয়ার কথা এক ও অভিন্ন নয়। কারণ, সূরা নাজমে উল্লিখিত আয়াতটি হযরত জিবরাঈল আ. সম্পর্কে সেখানকার কাজের কর্তাও হলেন তিনি। হযরত আয়েশা আর ইবনে মাসউদ রা. এর বক্তব্য এটাই; ঘটনার আগ-পরের বিশ্লেষণ দ্বারা প্রমাণিত সত্যও তাই। আর ইসরা সম্পর্কিত হাদীসে যে নিকটবর্তী হওয়া ও ঝুঁকে যাওয়ার কথা বলা হয়েছে নিঃসন্দেহে তা আল্লাহ তাআলা সম্পর্কেই। আর সূরা নাজমে এ সম্পর্কে কোনো আলোচনাই নেই। বরং সেখানে যে বলা হয়েছে (তাকে আরেক বার দেখেছিলেন সিদরাতুল মুনতাহার সন্নিকটে) স্পটই তিনি হযরত জিবরাঈল আ.। মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে তার নিজস্ব আকৃতিতে মোট দুই বার দেখেছেন: একবার পৃথিবীতে; আরেকবার সিদরাতুল মুনতাহার সন্নিকটে । আল্লাহই সর্বজ্ঞ।[146] কোনো কোনো বর্ণনায় পাওয়া যায় এ সময় রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বক্ষ বিদারণের ঘটনাও ঘটেছিল। যাই হোক এই গুরুত্বপূর্ণ আসমানী সফরে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অনেক দুর্লভ ও

145 যাদুল মাআদ ২/৪৭,৪৮।

146 প্রাগুক্ত ২/৪৭, ৪৮। আরও দেখুন সহীহ বুখারী ১/৫০, ৪৫৫, ৪৫, ৪৭০, ৪১, ৪৮১, ৫48-550, ২/৬৮৪। সহীহ মুসলিম ১/৯১-৯৬।

সৃষ্টিতত্ত্বের বিস্ময়কর নিদর্শন প্রত্যক্ষ করেছেন; আজ পর্যন্ত পৃথিবীর অন্য কোনো মানুষের পক্ষে যা কোনো দিনও সম্ভব হয়ে উঠেনি।

• রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সামনে দুধ ও শরাবের পেয়ালা পেশ করা হয় । তিনি দুটির মধ্য থেকে দুধের পেয়ালা বেছে নেন। তখন তাকে বলা হয় আপনাকে ফিতরাতের রাস্তা বলে দেওয়া হয়েছে কিংবা আপনি ফিতরাত পেয়ে গেছেন। মনে রাখবেন! আজ যদি আপনি শরাবের পেয়ালা বেছে নিতেন তবে আপনার উম্মত পথভ্রষ্ট হয়ে পড়ত।

• তিনি সিদরাতুল মুনতাহার গোড়া থেকে চারটি নহর উৎসারিত হতে দেখেন। তন্মধ্যে দুটি যাহেরী (বর্হিগমনকারী) নহর আর বাকি দুটি বাতেনী (অভ্যন্তরীন)। যাহেরী নহরদুটি হলো নীল ও ফোরাত (ইউফ্রেটিস) নদী। আর বাতেনী নহরদুটি হলো জান্নাতের দুটি নহর। নীল ও ফোরাত নদী দেখানোর মধ্যে সম্ভবত ইঙ্গিত ছিল, ভবিষ্যতে ইসলাম এদুয়ের অববাহিকায় বিস্তৃতি লাভ করবে এবং এখানে দৃঢ় আসন পেতে বসবে।

• তিনি জাহান্নামের দারোয়ান ফেরেশতা মালিক আ. কে দেখতে পান। তিনি তখন সুস্মিত ছিলেন না। আর তাঁর চেহারায়ও এক ফোঁটা হাসি কিংবা আনন্দের লক্ষণ শোভা পাচ্ছিল না। মনে হচ্ছিল তিনি কখনো হাসেন না। এভাবে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জান্নাত ও জাহান্নাম দুটিকেই পরিদর্শন করলেন ।জাহান্নামে তিনি যারা ইয়াতীমের অর্থ-সম্পদ যুলুম ও অন্যায়ভাবে ভক্ষণ করে তাদেরকে দেখতে পান। তাদের ঠোঁট ছিল উটের ঠোঁটের ন্যায়। আর তাদের মুখ দিয়ে প্রস্তর খণ্ডের ন্যায় জ্বলন্ত অঙ্গার ঢুকাচ্ছিল আর এগুলি তাদের পেছনের রাস্তা দিয়ে বের হয়ে যাচ্ছিল।

• তিনি সেখানে সুদখোরদেরকেও দেখলেন। তাদের উদর ছিল সুবিশাল; যার কারণে তারা তাদের জায়গা থেকে নড়াচড়া করতে সক্ষম ছিল না। আর ফেরাউনের দলবলকে যখনই জাহান্নামের আগুনে ফেলার জন্য নিয়ে যাওয়া হতো তখন তারা তাদের পাশ দিয়ে যেত এবং যাওয়ার সময় তাদেরকে পায়ের নীচে ফেলে পিষে যেত।

• তিনি সেখানে ব্যভিচারীদেরকেও দেখলেন। তাদের সামনে ছিল মোটা ও সুস্বাদু গোশত আর তাদের পাশে রাখা ছিল পচা ও দুর্গন্ধময় গোশত। কিন্তু তারা সামনে রাখা সুস্বাদু ও তরতাজা গোশত ছেড়ে পাশের পচা ও গান্ধা গোশত খেয়ে যাচ্ছিল।

• তিনি সেখানে ঐ সকল নারীকে দেখলেন যারা নিজেদের স্বামীর ওপর অন্য কারও সন্তান যোগ করত। (অর্থাৎ যারা গোপনে পরপুরুষের সঙ্গে মেলা-মেশা করে গর্ভধারণ

করে বাচ্চা প্রসব করত কিন্তু তার স্বামীও জানত না যে, এ বাচ্চা তার নয়)। তাদেরকে দেখলেন তাদের গুনে বাঁকা কাঁটা ঢুকিয়ে আসমান ও জমিনের মধ্যবর্তী স্থানে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে।

• তিনি আসা যাওয়ার মধ্যে মক্কাবাসীদের একটি বাণিজ্যিক কাফেলা দেখতে পেলেন। তাদের একটি উট হারিয়ে গিয়েছিল। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের সে হারানো উটের ঠিকানা বলে দিয়েছিলেন। কাফেলার সবাই তখন ঘুমিয়ে ছিল। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের ঢেকে রাখা একটি পাত্র থেকে পানি পান করেছিলেন। এরপর পুনরায় পানির পাত্রটিকে ঢেকেই রেখেছিলেন। পরবর্তী সময়ে যখন ইসরা ও মিরাজের রাত ভোর হলো তখন তাঁর দাবির সত্যায়নের ক্ষেত্রে এগুলি দলীল ও প্রমাণ স্বরূপ কাজ করেছিল।[147]

ইবনুল কাইয়্যিম র. বলেন, রাতের আঁধার কেটে গিয়ে যখন ভোরের আলো চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন তমসাঘন রাতের কোলে ঘটে যাওয়া অশ্রুতপূর্ব মানবীয় শারাফাতের এক দুর্লভ কাহিনী মক্কাবাসীদের সামনে তুলে ধরলেন। তিনি তাদেরকে খুলে বললেন ভরা নিশির গর্ভে আল্লাহ তাআলা তাকে নিজের কাছে ডেকে নিয়ে কত বড় বড় নিদর্শনাবলি পরিদর্শন করিয়েছেন। কিন্তু এতে তাঁর প্রতি তাদের মিথ্যায়নই বেড়ে গেল। তাদের ভেতরে তাকে আরও বেশি কষ্ট দেওয়া ও ক্ষতি করার মানস জেগে উঠল। তারা তাকে বাইতুল মুকাদ্দাসের পূর্ণ বিবরণ তুলে ধরতে বলল। আল্লাহ তাআলা তখন তাঁর সামনে পুরো বাইতুল মুকাদ্দাসকে তুলে ধরলেন এবং তিনি তাকে নিজ চোখে দেখতে লাগলেন। সুতরাং রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কাফেরদেরকে একে একে তার নিদর্শন ও গুণাবলি বলে দিতে লাগলেন। কাফেররা তাঁর একটি কথায়ও দ্বিরুক্তি প্রকাশ করতে সক্ষম হলো না । তিনি তাঁর আসা যাওয়ার মধ্যে তাদের যে কাফেলাটিকে দেখেছেন সে সম্পর্কেও অবহিত করলেন। তিনি তাদেরকে সে কাফেলার মক্কায় এসে উপস্থিত হওয়ার নির্ধারিত একটি সময়ও বেঁধে দিলেন। সে কাফেলার সামনে যে উটটি চলছিল তারও কিছু লক্ষণ ও আলামত বলে দিলেন। পরবর্তী সময়ে সবকিছু হুবহু তা-ই দেখা গিয়েছিল যেমন তিনি বিবরণ দিয়েছিলেন। কিন্তু এতে তাদের পলায়নই বৃদ্ধি পেল। আর যালিমরা কুফরী ব্যতীত সবকিছু অস্বীকার করল।[148] কথিত আছে, যখন সকল

147 প্রাগুক্ত। ইবনে হিশাম ১/৩৯৭, ৪০২ ৪০৬।

148 যাদুল মাআদ ১/৪৮। আরও দেখুন সহীহ বুখারী ২/৬৮৪। সহীহ মুসলিম ১/৯৬। ইবনে হিশাম ১/৪০২, ৪০৩।

মানুষ ইসরা ও মি'রাজের এ ঘটনাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছিল তখন হযরত আবু বকর সিদ্দীক রা. বিনাবাক্যে একে সত্যায়ন করেছিলেন। আর তখন তাকে 'সিদ্দীক' উপাধি দেওয়া হয়েছিল।[149] এই বিশেষ আসমানী সফরের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও উল্লেখযোগ্য হিকমত ও কারণ ছিল আল্লাহ তাআলার বাণী (যাতে আমি তাঁকে কুদরতের কিছু নিদর্শন দেখিয়ে দিই) এর সফল বাস্তবায়ন। আর এটা আম্বিয়ায়ে কেরামের ক্ষেত্রে যুগ যুগ ধরে চলে আসা আল্লাহর রীতি ও নীতি। যেমন তিনি ইবরাহীম আ. সম্পর্কে ইরশাদ করেন,"আমি এরূপ ভাবেই ইবরাহীমকে নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের অত্যাশ্চর্য বস্তুসমূহ দেখাতে লাগলাম-যাতে সে দৃঢ় বিশ্বাসী হয়ে যায়" [সূরা আনআম:৭৫]

তেমনিভাবে মূসা আ. সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা বলেন, "এটা এ জন্য যে, আমি আমার বিরাট নিদর্শনাবলীর কিছু তোমাকে দেখাই" [সূরা তোয়াহা : ২৩] পাশাপাশি এই বিশেষ সফরের লক্ষ্য-উদ্দেশ্যও কুরআনে কারীমে বলে দেওয়া হয়েছে ঠিক এভাবে যাতে সে দৃঢ় বিশ্বাসী হয়ে যায়।এভাবে আল্লাহর কুদরতের অপার নিদর্শনাবলির পরিদর্শন যখন আম্বিয়ায়ে কেরামের ইলমের সঙ্গে যোগ হয় তখন আল্লাহর ওপর তাদের এমন নিশ্চিত বিশ্বাস অর্জিত হয়ে যায়, যা পৃথিবীর অন্য কোনো মানুষের পক্ষে সম্ভব হয় না। আর এটা তো স্বতঃসিদ্ধ ব্যাপার যে, কানে শোনা চোখে দেখার মতো নয়। এ কারণে আম্বিয়ায়ে কেরাম আল্লাহর রাস্তায় যতটা কুরবানী করতে পারেন; যতটা কষ্ট ও মুসিবত ভোগ করতে পারেন পৃথিবীর অন্য কোনো বনী আদম তা পারে না। আর তখন পুরো দুনিয়ার সকল শক্তি ও ক্ষমতা তাদের কাছে একটি মশার ডানার মতো দুর্বল ও তুচ্ছ মনে হয়। যে কারণে তাদের পক্ষ থেকে আসা সম্ভাব্য যুলুম ও নির্যাতন আর কষ্ট ও তাকলীফের প্রতি তারা কোনো দিনও ভ্রুক্ষেপ করেন না।এই সফরের পরতে পরতে যে সকল হিকমত ও সুপ্ত রহস্যের ভাণ্ডার লুক্কায়িত আছে বক্ষ্যমাণ গ্রন্থ সেগুলো আলোচনার স্থান নয়; বরং সেগুলোর জন্য রয়েছে শরীয়তের গোপন তত্ত্বের বিভিন্ন গ্রন্থ। তবে আমাদের চোখের সামনে অনেক সাধারণ ও সরল বাস্তবতাও এমন রয়েছে, যা এই মুবারক সফরের ঝরনাধারা থেকে উৎসারিত হয়; এরপর তা বহমান প্রচণ্ড স্রোতধারায় পরিণত হয়; সমান তালে আর প্রবল বেগ ও আবেগ নিয়ে ছুটে চলে সীরাতে নববীর পুষ্পোদ্যানের দিকে। এখানে আমি সংক্ষেপে কয়েকটি বিষয় তুলে ধরছি:বিচক্ষণ পাঠক মাত্রই লক্ষ্য করবেন আল্লাহ তাআলা

149 ইবনে হিশাম ১/৩৯৯।

কুরআনের কারীমে সূরা বনী ইসরাঈলের কেবল একটি আয়াতেই ইসরার ঘটনা উল্লেখ করেছেন। এরপর তিনি ইহুদি জাতির অন্যায় ও অপরাধ আর লাঞ্ছনা ও গঞ্জনার ইতিহাস তুলে ধরেছেন। এরপর তাদেরকে সতর্ক করে দিয়েছেন যে, নিশ্চয়ই এই কুরআন কেবল ঐ পথেরই দিশা দেয়, যা সত্য ও সঠিক। সাধারণ দৃষ্টিতে দেখলে কখনো কখনো পাঠক এ আয়াতদুটির মাঝে বৈসাদৃশ্য দেখতে পাবেন। হয়তো তার মনে হবে এদুটির মাঝে কোনো মেলবন্ধন নেই। অথচ বাস্তবতা কিন্তু মোটেও এমন নয়। বরং আল্লাহ তাআলা তাঁর বর্ণনার এ নতুন ঢঙ আর রঙের মাধ্যমে ইঙ্গিত দিচ্ছেন যে, রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ইসরা হয়েছে বাইতুল মুকাদ্দাসের দিকে। আর ইহুদি জাতি নিকট ভবিষ্যতে খুব তাড়াতাড়িই বিশ্ব মানবতার নেতৃত্বের আসন হারিয়ে ফেলবে। ছিটকে পড়বে সভ্যতার প্রশ রাজপথ থেকে। কেননা, তারা এমন সব জঘন্য অন্যায় আর অপরাধে লিপ্ত হয়েছে, যার ফলে তারা এ আসনে অধিষ্ঠিত থাকার সব রকমের যোগ্যতা হারিয়ে ফেলেছে। আর এখন সক্রিয়ভাবে আল্লাহ তাআলার নির্দেশে এ আসনে অভিষেক হবে তাঁর প্রিয় রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর। দীনে ইবরাহীমের প্রধান উভয় কেন্দ্রের চাবিই আল্লাহ তাআলা এখন তার হাতে তুলে দিবেন। সুতরাং এখন এক নতুন শতাব্দীর উদ্বোধন হবে। এক নতুন পৃথিবীর জন্ম হবে। যে পৃথিবীতে আধ্যাত্মিক ও আত্মিক নেতৃত্বেরও পট পরিবর্তন হবে। হাত বদল হয়ে এক জাতি থেকে তা অন্য জাতির কাছে চলে যাবে। কারণ, এর নেতৃত্ব ও কর্তত্ব ছিল এমন একটি জাতির হাতে; বিশ্বাসঘাতকতা আর খেয়ানতের দ্বারা যে জাতি তার ইতিহাস ভরে রেখেছিল। যে জাতির প্রতিটি কদমে কদমে গাদ্দারি আর ধোঁকাবাজির ছাপ ছিল। সুতরাং, এ বিশাল গুরুত্বপূর্ণ আমানত আর তাদের হাতে থাকতে পারে না; বরং তা চলে যাবে এমন এক জাতির কাছে ভালো আর কল্যাণে উথলে ওঠা সমুদ্রে যে জাতি সর্বদা সাঁতরে বেড়াচ্ছিল। যে জাতির প্রতিটি অঙ্গ থেকে খায়র আর বরকতের সুমিষ্ট রসধারা চুইয়ে পড়ছিল। যে জাতির নবীর কাছে আজও সেই কুরআনে কারীমের ওহী অবতীর্ণ হচ্ছিল যেই কুরআনে কারীম সরল ও সত্য পথের দিশারী।কিন্তু নেতৃত্বের সিংহাসনে এখন যে জাতির অভিষেক হওয়ার কথা ছিল তাঁর রাসূল তো আজও মক্কার পাহাড়ে পাহাড়ে আর গিরি-কন্দরে পথহারা পথিকের ন্যায় মানুষের দ্বারে দ্বারে গলা ধাক্কা খেয়ে ফিরছিলেন। সুতরাং, কীভাবে আসবে নেতৃত্বের সেই পরিবর্তন? কী হবে তার রূপরেখা? আর এটা সম্ভবও বা কীরূপে? এই প্রশ্নটি আমাদের সামনে আরেকটি বাস্তবতা মেলে ও তুলে ধরে। আর

তা হলো, এতদিন ধরে এ জাতির যে যুগ চলে আসছিল এখন সে যুগের পতন ঘটতে যাচ্ছে। এ জাতির এখন খোলস বদল ঘটবে। দাওয়াতে ইসলামীর প্রথম যুগের যবনিকাপাত ঘটেছে। এখন বিশ্বের রঙ্গমঞ্চে এসে হাযির হবে আরেকটি নতুন যুগ। পৃথিবীর আকাশে বাতাসে শোনা যাবে এক নয়া অধ্যায়ের আগমনী বার্তা এটা হবে এমন এক নতুন যুগ; এমন এক নয়া অধ্যায়, যা তার আকার ও আদলে, আকৃতি ও প্রকৃতিতে পুরনো যুগ আর প্রাচীন অধ্যায়ের তুলনায় সম্পূর্ণ ভিন্ন হবে। যার স্রোতধারা ভিন্ন এক নতুন খাতে প্রবাহিত হবে। এ কারণেই তো এ সময়কার কিছু আয়াতে আমরা দেখতে পাই মুশরিকদের প্রতি দ্ব্যর্থহীন ও স্পষ্ট কণ্ঠের ধমক। ইরশাদ হয়েছে, “ যখন আমি কোন জনপদকে ধ্বংসকরার ইচ্ছা করি তখন তার অবস্থাপন্ন লোকদেরকে উদ্ধুদ্ধ করি অতঃপর তারা পাপাচারে মেতে ওঠে। তখন সে জনগোষ্ঠীর উপর আদেশ অবধারিত হয়ে যায় । অতঃপর আমি তাকে সমূলে ধ্বংস করে দিই। নূহের পর আমি অনেক উম্মতকে ধ্বংস করেছি। আপনার পালনকর্তাই বান্দাদের পাপাচারের সংবাদ জানা ও দেখার জন্যে যথেষ্ট” [সূরা বনী ইসরাঈল : ১৬-১৭] এর পাশাপাশি এ সময়কার বহু আয়াতে মুসলমানদের জন্য তাদের সভ্যতার মৌলিক রূপ-রেখা আর মূলনীতিগুলি বাতলে দেওয়া হয়; যার ওপর গড়ে উঠতে যাচ্ছে নতুন ইসলামী সভ্যতার গগণচুম্বী ইমারত। যেন তারা আল্লাহর দুনিয়ার এমন কোনো ভূখণ্ডে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছিল যেখানে জীবনের সব দিক তাদের আয়ত্তাধীন রয়েছে। যেখানে তাদের সকলের মিলনে এমন একটি মেলবন্ধন কায়েম হয়েছে, যা তাকে এক নতুন সভ্যতার কেন্দ্রবিন্দুর মর্যাদা দান করেছে। সুতরাং এর মধ্যেই ইঙ্গিত ছিল যে, অতি শীঘ্রই তিনি এমন একটি নিরাপদ আশ্রয়স্থল আর মজবুত শরণশিবির পেয়ে যাচ্ছেন, যেখানে বসে তাঁর সকল কাজ সুস্থির ও সুসম্পন্ন হবে। যা পরিণত হবে বিস্তীর্ণ দুনিয়ার প্রত্যন্ত অঞ্চলে তাঁর দাওয়াত ছড়িয়ে দেওয়ার প্রধান মারকায। এটাই ছিল এ মুবারক সফরের পেছনে লুক্কায়িত সুপ্ত রহস্য! আমাদের আলোচনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বলেই আমরা এখানে এ সম্পর্কে আলোচনা করাকে অগ্রাধিকার দিয়েছি।আর এমন কিছু হিকমত আর সূক্ষ্ম ইঙ্গিতের কারণেই মনে হয় ইসরা ও মি'রাজ সংঘটিত হয়েছিল আক্বাবার প্রথম বাইআতের সামান্য আগে কিংবা আক্বাবার দুই বাইআতের মধ্যবর্তী সময়ে। আল্লাহ সর্বজ্ঞ।

ইসলাম-ভিত্তিক মৈত্রী চুক্তি

যেভাবে মুসলমানদের মাঝে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ভ্রাতৃত্ব-সম্পর্ক স্থাপন করলেন, একইভাবে আরও একটি চুক্তি করলেন, যার মাধ্যমে জাহেলী আরবের সমস্ত ভোজবাজি আর ভেল্কির অবসান ঘটল। গোত্র আর কবীলাভিত্তিক দ্বন্দ্ব দূরীভূত হলো। আর এর মাধ্যমে তিনি একটি শাশ্বত ইসলামী ঐকমত্য প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হলেন। নীচে আমরা সেই চুক্তির শর্তগুলি সংক্ষিপ্ত আকারে উল্লেখ করছি:এটা আল্লাহর নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর পক্ষ থেকে লিখিত কুরাইশ ও ইয়াসরিবের মুমিন-মুসলমান এবং যারা তাদের অনুসরণ করেছে এবং তাদের সাথে সংযুক্ত হয়েছে এবং তাদের সাথে মিলিত হয়ে জিহাদ করেছে তাদের জন্য ফরমান:-

১. তারা অন্য সমস্ত মানুষ বাদে একই জাতি।

২. কুরাইশের মুহাজিররা নিজেদের আগের প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী দিয়ত আদায় করবে[150] এবং মুমিনদের মাঝে ইনসাফ ও নিয়ম অনুযায়ী বন্দীদের মুক্তিপণ আদায় করবে। আনাসারদেরও প্রত্যেক কবীলা নিজেদের আগের নিয়ম অনুযায়ী দিয়ত আদায় করবে এবং তাদের প্রত্যেকেই মুমিনদের মধ্যে নিয়ম ও ইনসাফের সঙ্গে নিজেদের বন্দীদের মুক্তিপণ আদায় করবে।

৩. মুমিনরা কোনো ঋণগ্রস্ত বা অভাবগ্রস্ত মুমিনকে ফিদইয়া কিংবা দিয়তের ক্ষেত্রে নিয়ম অনুযায়ী তাদের দান থেকে বঞ্চিত করবে না।

৪.সকল মুমিন ঐ ব্যক্তির বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ থাকবে, তাদের মধ্যে থেকে যে যুলুম করবে অথবা মুমিনদের মাঝে অন্যায়, পাপ, বাড়াবাড়ি অথবা বিশৃঙ্খলা উসকে দিবে।

৫. আর তাদের সকলের হাত ঐ ব্যক্তির বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ থাকবে। চাই সে তাদের কারও সন্তানই হোক না কেন।

৬. কোনো কাফেরের পরিবর্তে একজন মুমিন অপর মুমিনকে হত্যা করবে না।

৭.কোনো মুমিনের বিরুদ্ধে কোনো কাফেরকে সাহায্য করা যাবে না।

৮. আল্লাহর যিম্মাদারী এক ও অভিন্ন। একজন সাধারণ ব্যক্তি প্রদত্ত নিরাপত্তা সকলের পক্ষ থেকে প্রদত্ত বলে গণ্য হবে।

---

150 ইসলামের আগে তাদের যে অবস্থা ছিলো।

৯. ইহুদিদের মধ্য থেকে যারা আমাদের অনুসরণ করবে, তাদের জন্য রয়েছে সাহায্য ও অন্যান্য মুসলমানের মতো সহযোগিতা। তার ওপর যুলুম করা যাবে না। আবার তার বিরুদ্ধেও কাউকে সাহায্য করা যাবে না।

১০. সমস্ত মুমিনের সন্ধি এক হবে। কোনো মুমিন কোনো মুমিনকে রেখে আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধ করার ব্যাপারে সন্ধি চুক্তিতে আবদ্ধ হবে না। বরং সকলে মিলে ইনসাফের সাথে সন্ধি করবে।

১১. সকল মুসলমানের ঐ রক্তের মধ্যে সমান অধিকার থাকবে, তাদের কেউ আল্লাহর রাস্তায় প্রবাহিত করেছে,যেই রক্ত তাদের কেউ আল্লাহর রাস্তায় প্রবাহিত করেছে।

১২. মুশরিকরা কুরাইশের কোনো ব্যক্তি কিংবা ব্যক্তির মালের নিরাপত্তা প্রদান করার অধিকার রাখে না এবং মুমিনের বিরুদ্ধে তার হেফযতের জন্য বাঁধা সুষ্টি করতেও পারবে না।

১৩.যে ব্যক্তি বিনাপরাধে কোনো মুমিনকে হত্যা করবে এবং তার স্পষ্ট প্রমাণ মিলবে তবে তার বিনিময় হলো কেসাস। হ্যাঁ, নিহত ব্যক্তির পরিবারবর্গ ও আত্মীয়-স্বজন রাযি থাকলে অন্য কিছুও হতে পারে।

১৪. সমস্ত মুমিন তার বিপরীতে চলে যাবে। তাদের জন্য তার বিরুদ্ধে মামলা ঠোকা ব্যতীত অন্য কিছু জায়েয হবে না।

১৫. কেনো মুমিনের জন্য জায়েয হবে না কোনো হাঙ্গামাকারী কিংবা বেদআতীকে সাহায্য করা কিংবা আশ্রয় দেওয়া। আর যে তাকে সাহায্য করবে বা আশ্রয় দিবে তার ওপর আল্লাহর অভিশাপ ও ক্রোধ কেয়ামতের দিন। তার কোনো নফল কিংবা ফরয গ্রহণ করা হবে না।

১৬. এগুলোর মধ্য থেকে যে কোনো বিষয়ে তোমাদের মাঝে মতানৈক্য দেখা দিলে তোমরা আল্লাহর ও তাঁর নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছে তুলে ধরবে।[151] মানব সমাজে এগুলোর প্রভাবএ সকল হিকমত আর চিন্তা-ফিকির ও পরিকল্পনার পরে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একটি নতুন মানব সমাজের গোড়াপত্তন করেন । যার বাহ্যিক চেহারা সুরত দেখেই ঐ সকল গুণাবলী ও বৈশিষ্ট্যের সম্যক উপলব্ধি হয়ে যেত রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর পবিত্র সংস্পর্শে এসে যে সকল বৈশিষ্ট্য শোভায় শোভামণ্ডিত ছিলেন এ সকল মহাত্মা সাহাবায়ে কেরাম রা.। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে

---

151 ইবনে হিশাম ১/৫০২, ৫০৩।

সর্বদা দুনিয়া ও দীনের তা'লীম দিয়ে যাচ্ছিলেন। কোনটা হালাল আর কোনটা হারাম তা তাদের চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে যাচ্ছিলেন। মহান ও উত্তম চরিত্রের ওপর উৎসাহিত করতেন। আর তাদেরকে মহব্বত ও ভালোবাসা, ভ্রাতৃত্ব ও মর্যাদাবোধ, ইয্যত ও সম্মান, সর্বোপরি ইবাদত আর আনুগত্যের শিক্ষা দিতেন ।

এক ব্যক্তি তার কাছে এসে জিজ্ঞাসা করল, 'কোন ইসলাম উত্তম (অর্থাৎ ইসলামের কোন আমলটা উত্তম)? তিনি বললেন, 'মানুষদেরকে খানা খাওয়ানো, পরিচিত অপরিচিত সবাইকে সালাম দেওয়া।[152]

আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম রা. বলেন, নবীয়ে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন মদীনায় এলেন, আমার চোখ যখন তাঁর চেহারা মুহারক দেখতে পেল, আমি নিশ্চিত হলাম এ কোনো মিথ্যুকের চেহারা হতে পারে না । এসে সর্বপ্রথম তিনি যা বলেছিলেন তা ছিল, "হে লোক সকল! তোমরা সালামের প্রচার-প্রসার করো, অন্যকে খাবার দাও, আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে সুসম্পর্ক ধরে রাখো, গভীর রাতের কোলে যখন সবাই ঘুমিয়ে থাকে তখন উঠে নামাযে দাঁড়িয়ে যাও-এবং নির্বিঘ্নে সোজা জান্নাতে চলে যাও"।[153]

তিনি বলতেন, "সেই ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে না যার প্রতিবেশী তার অন্যায়-অত্যাচার থেকে নিরাপদ নয়"।[154]

তিনি আরও বলতেন, "প্রকৃত মুসলমান সেই ব্যক্তি অন্যান্য মুসলমান যার মুখ ও হাত (অর্থাৎ এগুলির অনিষ্ট) থেকে মুক্ত থাকে"।[155]

তিনি বলতেন, "তোমাদের মধ্য থেকে কেউ ততক্ষণ পর্যন্ত মুমিন হতে পারবে না, যতক্ষণ না সে তার অন্য ভাইয়ের জন্য ঠিক তা-ই পছন্দ করবে, যা সে নিজের জন্য পছন্দ করে"।[156]

তিনি আরও বলতেন, "সকল মুমিন একটি দেহের ন্যায়, যদি তার একটি চোখ পীড়িত হয় তবে গোটা শরীরের অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গেও তার বেদনা ও মর্ম ছড়িয়ে পড়ে, যদি তার মাথা ব্যাথা হয় তবে সব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ব্যথিত হয়ে ওঠে"।[157]

---

152 সহীহ বুখারী ১/৬,৯।

153 তিরমিযী, ইবনে মাজাহ, দারেমী- মিশকাতুল মাসাবীহ ১/১৬৮।

154 মুসলিম- মিশকাতুল মাসাবীহ ২/৪২২।

155 সহীহ বুখারী ১/৬।

156 সহীহ বুখারী ১/৬।

157 মুসলিম- মিশকাতুল মাসাবীহ ২/৪২২।

যুদ্ধ জীবন

বদরের যুদ্ধ:

বদরের যুদ্ধ (আরবি: غزوة بدر) ২ হিজরির ১৭ রমজান (১৩ মার্চ ৬২৪ খ্রিষ্টাব্দ) মদিনার মুসলিম ও মক্কার কুরাইশদের মধ্যে সংঘটিত যুদ্ধ। ইসলামের ইতিহাসে এটি প্রথম সবচেয়ে বড় যুদ্ধ। এতে জয়ের ফলে মুসলিমদের ক্ষমতা পূর্বের তুলনায় বৃদ্ধি পায়।

যুদ্ধের পূর্বে ৬২৩ থেকে ৬২৪ সালের মধ্যে মুসলিম ও কুরাইশদের মধ্যে বেশ কিছু খন্ডযুদ্ধ হয়। বদর ছিল দুই বাহিনীর মধ্যে প্রথম বড় আকারের যুদ্ধ। যুদ্ধে সুসংগঠিত মুসলিমরা মক্কার সৈনিকদের সারি ভেঙে ফেলতে সক্ষম হয়। যুদ্ধে মুসলিমদের বিপক্ষের আবু জাহল(আমর ইবনে হিশাম),উতবা ইবনে রাবিয়া,উমাইয়া ইবনে খালাফ,শায়বা ইবনে রাবিয়া' ওয়ালিদ ইবনে উতবা,'উক্বা ইবনে আবি মুইত নিহত হয়।[158] মুসলিমদের বিজয়ে অন্যদের কাছে বার্তা পৌছায় যে মুসলিমরা আরবে নতুন শক্তি হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে এবং এর ফলে নেতা হিসেবে মুহাম্মাদ সল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অবস্থান দৃঢ় হয়।[159]

বদরে যাত্রা

মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাথে মুসলিম বাহিনীতে ছিলেন আলি ইবনে আবি তালিব (রা:),হামজা ইবনে আবদুল মুত্তালিব (রা:),আবু বকর, উমর ইবনুল খাত্তাব(রাঃ), মুসআব ইবনে উমাইর(রাঃ), যুবাইর ইবনুল আওয়াম(রাঃ), আম্মার ইবনে ইয়াসির(রাঃ) ও আবু যার আল-গিফারী(রাঃ)। স্ত্রীর অসুস্থতার কারণে উসমান ইবনে আফফান(রাঃ) যুদ্ধে যেতে পারেননি।[160] সালমান ফারসি(রাঃ) এসময় অন্যের দাস ছিলেন তাই তিনিও যুদ্ধে অংশ নেননি।[161] বাহিনীতে সৈনিক সংখ্যা ছিল ৩১৩জন। এর মধ্যে মুহাজির ছিলেন ৮২ জন এবং আনসারদের মধ্যে আওস গোত্রের ছিলেন ৬১জন ও খাজরাজ গোত্রের ছিলেন ১৭০জন। মুসলিমদের সাথে ৭০টি উট ও দুইটি ঘোড়া ছিল। ফলে তাদের সামনে পায়ে হেটে যাওয়া বা প্রতি দুই বা তিনজনের জন্য

158 The Sealed Necter, Page 274

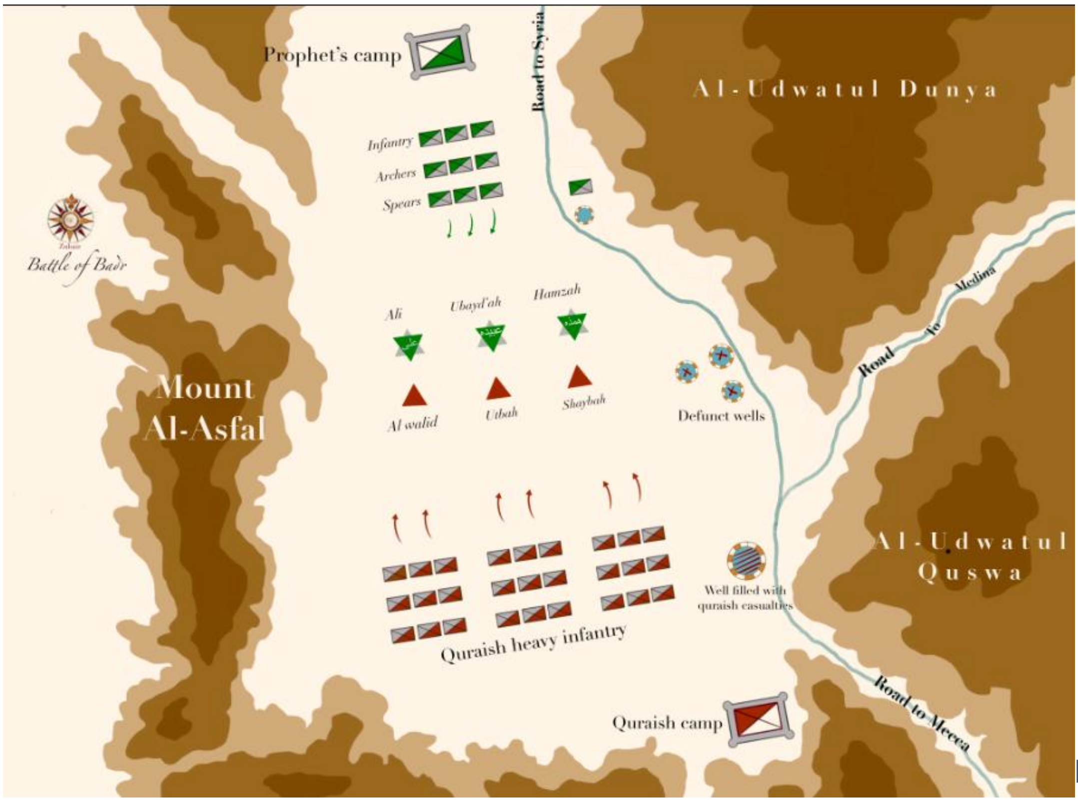
159 https://en.wikipedia.org/wiki/Battle_of_Badr

160 "Sahih al-Bukhari: Volume 4, Book 53, Number 359"। Usc.edu। ২০ জুলাই ২০১০ তারিখে মূল থেকে আর্কাইভ করা। সংগ্রহের তারিখ ১৬ সেপ্টেম্বর ২০১০।

161 "Witness-pioneer.org"। Witness-pioneer.org। ১৬ সেপ্টেম্বর ২০০২। ৫ ফেব্রুয়ারি ২০১০ তারিখে মূল থেকে আর্কাইভ করা। সংগ্রহের তারিখ ১৯ মার্চ ২০১০।

একটি উট ব্যবহার ছাড়া উপায় ছিল না।[162] একটি উটে পালাক্রমে দুই বা তিনজন আরোহণ করতেন। এই ব্যবস্থায় মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, আলি ইবনে আবি তালিব(রাঃ) ও মারসাদ ইবনে আবি মারসাদের জন্য(রাঃ) একটি উট বরাদ্দ হয়েছিল।[163]

মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সার্বিক নেতৃত্বের জন্য মুসআব ইবনে উমাইরকে(রাঃ) একটি সাদা পতাকা প্রদান করেন। মুহাজিরদের ও আনসারদের জন্য একটি করে কালো পতাকা যথাক্রমে আলি ইবনে আবি তালিব(রাঃ) এবং সাদ ইবনে মুয়াজকে(রাঃ) প্রদান করা হয়। বাহিনীর ডান ও বাম অংশের প্রধান হিসেবে যথাক্রমে যুবাইর ইবনুল আওয়াম(রাঃ) ও মিকদাদ ইবনে আমরকে(রাঃ) নিযুক্ত করা হয়। মুসলিম বাহিনীতে থাকা দুইটি ঘোড়ায় তারা আরোহণ করেছিলেন। পেছনের অংশের প্রধান হিসেবে কাইস ইবনে আবিকে(রাঃ) নিয়োগ দেয়া হয়। মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সমগ্র বাহিনীর প্রধান হিসেবে দায়িত্ব নেন।[164]



[165]

চিত্রঃ বদর যুদ্ধের ময়দান

162 আর-রাহীকুল মাখতুম, বদরের যুদ্ধ অধ্যায়। Lings, pp. 138–139.

163 আর-রাহীকুল মাখতুম, বদরের যুদ্ধ অধ্যায়। সিরাত ইবনে হিশাম, বদরের যুদ্ধ অধ্যায়।

164 আর-রাহীকুল মাখতুম, বদরের যুদ্ধ অধ্যায়।

165 https://en.wikipedia.org/wiki/Battle_of_Badr



[166]

চিত্রঃ বদর অভিযানের একটি মানচিত্র, যেখানে আবু সুফিয়ানের লেভান্ট থেকে মক্কা পর্যন্ত তার কাফেলা রক্ষা করার জন্য নেওয়া পথ, আমর ইবনে হিশাম (আবু জাহল) মক্কা থেকে বদর পর্যন্ত নেওয়া পথ এবং মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং মুসলমানদের মদিনা থেকে মক্কা পর্যন্ত নেওয়া পথ দেখানো হয়েছে।

166 https://en.wikipedia.org/wiki/Battle_of_Badr

এক নজরে বদর যুদ্ধ

বিবাদমান পক্ষ	
মদিনার মুসলিম	মক্কার কুরাইশ
সেনাধিপতি ও নেতৃত্ব প্রদানকারী	
মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আবু বকর(রাঃ) উমর ইবনুল খাত্তাব(রাঃ) হামজা ইবনে আবদুল মুত্তালিব(রাঃ) আলি ইবনে আবি তালিব(রাঃ)	আবু জাহল উতবা ইবনে রাবিয়া উমাইয়া ইবনে খালাফ
শক্তি	
৩১৩জন পদাতিক, ২টি ঘোড়া, ৭০টি উট	১০০০জন পদাতিক, ১০০টি ঘোড়া, ৭০০টি উট
হতাহত ও ক্ষয়ক্ষতি	
শহীদ ১৪	নিহত ৭০, বন্দী ৭০

[167]

167 https://en.wikipedia.org/wiki/Battle_of_Badr

উহুদের যুদ্ধ

উহুদের যুদ্ধ (আরবি: غزوة أحد *Ġazwat ‘Uḥud*) ৩ হিজরির ৭ শাওয়াল (২৩ মার্চ ৬২৫ খ্রিষ্টাব্দ[168] হিজরি ৩ শনিবার[169]) উহুদ পর্বতের সংলগ্ন স্থানে সংঘটিত হয়।[170] মদিনার মুসলিম ও মক্কার কুরাইশদের মধ্যে এই যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছে। এই দুই পক্ষের নেতৃত্বে ছিলেন যথাক্রমে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও আবু সুফিয়ান। ইসলামের ইতিহাসে সংঘটিত প্রধান যুদ্ধসমূহের মধ্যে এটি দ্বিতীয়। এর পূর্বে ৬২৪ সালে এই দুইপক্ষের মধ্যে বদরের যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল।

বদরের পরাজয়ের প্রতিশোধ নেয়ার জন্য মক্কার পক্ষ থেকে এই যুদ্ধের সূচনা করা হয়েছিল। যুদ্ধযাত্রার খবর পাওয়ার পর মুসলিমরাও তৈরী হয় এবং উহুদ পর্বত সংলগ্ন প্রান্তরে এই যুদ্ধ সংঘটিত হয়।

সংখ্যায় কম হওয়া সত্ত্বেও মুসলিমরা প্রথমদিকে সাফল্য লাভ করেছিল এবং মক্কার সৈনিকরা পিছু হটতে বাধ্য হয়। বিজয়ের খুব কাছাকাছি থাকা অবস্থায় মুসলিম বাহিনীর কিছু অংশের ভুল পদক্ষেপের কারণে যুদ্ধের মোড় ঘুরে যায়। মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুসলিম তীরন্দাজদেরকে নির্দেশ দিয়েছিলেন যে ফলাফল যাই হোক তারা তাদের অবস্থান থেকে সরে না আসে। কিন্তু তারা অবস্থান ত্যাগ করার পর মক্কার বাহিনীর অন্যতম সেনাপতি খালিদ বিন ওয়ালিদ মুসলিমদের উপর আক্রমণের সুযোগ পান ফলে মুসলিমদের মধ্যে বিশৃঙ্খলা তৈরী হয়। এসময় অনেক মুসলিম নিহত হয়। মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজেও আহত হয়েছিলেন। মুসলিমরা উহুদ পর্বতের দিকে পিছু হটে আসে। মক্কার বাহিনীকে এরপর মক্কায় ফিরে আসে। এই যুদ্ধে সংঘটিত হওয়ার পর ৬২৭ সালে দুই বাহিনী পুনরায় খন্দকের যুদ্ধে মুখোমুখি হয়।[171]

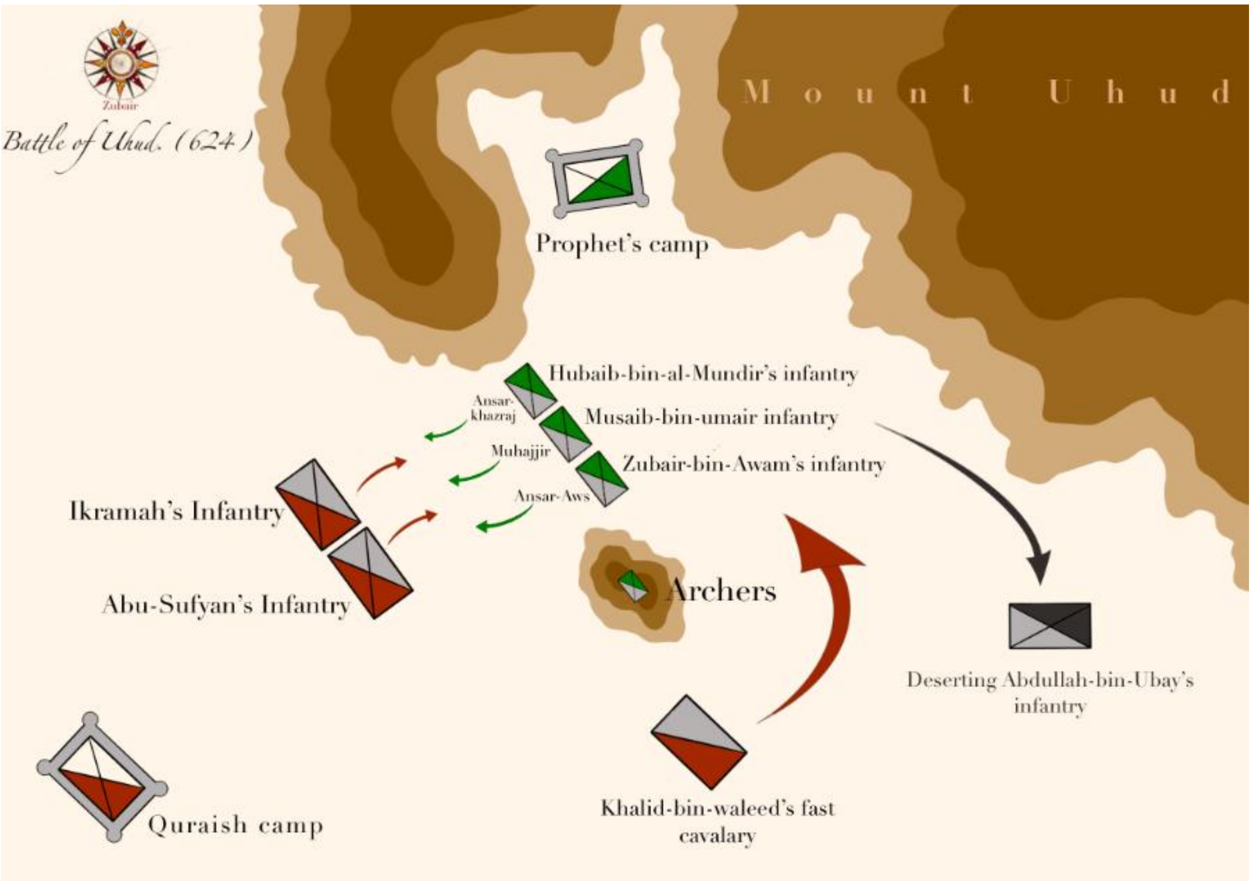
---

168 Jones, J.M.B. (১৯৫৭)। "The Chronology of the Ma gh āzī—A Trxtual Survey"। Bulletin of the School of Oriental and African Studies (ইংরেজি ভাষায়)।

169 মোবারকপুরী, সফিউর রহমান। The Sealed Nectar

170 Watt, W. Montgomery। Muhammad : prophet and statesman। London। পৃষ্ঠা ১৩৬।

171 Holt, P. M. (Peter Malcolm)। The Cambridge history of Islam। Lambton, Ann K. S., 1912-2008,, Lewis, Bernard, 1916-2018,। Cambridge [England]। পৃষ্ঠা ৪৭–৪৮।



[172]

চিত্রঃ বিশদ বিবরণ সহ উহুদের যুদ্ধ

যুদ্ধক্ষেত্রের লড়াই

মুসলিম সেনাবিন্যাস

যুদ্ধক্ষেত্রে পৌছানোর পর সেনাবিন্যাস করা হয়। আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের ইবনে নুমানের(রাঃ) নেতৃত্বে ৫০জন দক্ষ তীরন্দাজের একটি দলকে কানাত উপত্যকার দক্ষিণে মুসলিম শিবিরের পূর্বদক্ষিণে ১৫০মিটার দূরে জাবালে রুমাত নামক একটি ছোট পাহাড়ে অবস্থানের নির্দেশ দেয়া হয়। তারা মুসলিম বাহিনীকে পেছনের গিরিপথের দিক থেকে আক্রমণের হাত থেকে রক্ষা করে এবং তাদের অবস্থানের কারণে বাম

172 https://en.wikipedia.org/wiki/Battle_of_Uhud

পার্শ্বেও ঝুঁকি কমে যায়।[173] অন্যদিকে ডান পার্শ্ব উহুদ পর্বতের কারণে সুরক্ষিত ছিল। এর ফলে মুসলিমরা প্রতিপক্ষের হাতে আবদ্ধ হওয়ার ঝুকি ছিল না।

মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তীরন্দাজদের নির্দেশ দেন যাতে তিনি নির্দেশ দেয়ার পূর্ব পর্যন্ত তীরন্দাজরা কোনো অবস্থায় তাদের স্থান থেকে সরে না আসে। তিনি নির্দেশ হিসেবে বলেন,

তোমরা আমাদের পিছন দিক রক্ষা করবে। যদি তোমরা দেখ যে আমরা মৃত্যুমুখে পতিত হচ্ছি তবুও তোমরা আমাদের সাহায্য করার জন্য এগিয়ে আসবে না। আর যদি দেখতে পাও যে আমরা গনিমতের মাল একত্রিত করছি তবে তখনও তোমর আমাদের সাথে যোগ দেবে না।[174]

বাকি সৈন্যদের বিভিন্ন ভাগে বিন্যস্ত করা হয়। বাহিনীর ডান পার্শ্বের নেতৃত্ব মুনজির ইবনে আমর ও বাম পার্শ্বের নেতৃত্ব যুবাইর ইবনুল আওয়ামকে(রাঃ) দেয়া হয়। মিকদাদ ইবনে আসওয়াদকে(রাঃ) যুবাইরের(রাঃ) সহকারী নিযুক্ত করা হয়। বাম পার্শ্বের দায়িত্ব ছিল মক্কার বাহিনীর ডান পার্শ্বের নেতৃত্বে থাকা খালিদ বিন ওয়ালিদের অশ্বারোহীদের প্রতিরোধ করা। এছাড়াও সম্মুখসারিতে দক্ষ সৈনিকদের নিযুক্ত করা হয়।[175]

মক্কাবাহিনীর সেনাবিন্যাস

মক্কার বাহিনীর মূল ভাগের নেতৃত্বে ছিলেন আবু সুফিয়ান। তিনি বাহিনীর মধ্যস্থলে নিজ কেন্দ্র তৈরী করেন। বাম ও ডান পার্শ্বের নেতৃত্বে ছিলেন যথাক্রমে ইকরিমা ইবনে আবি জাহল এবং খালিদ বিন ওয়ালিদ।[176][177] পদাতিক ও তীরন্দাজদের নেতৃত্বে ছিলেন যথাক্রমে সাফওয়ান ইবনে উমাইয়া ও আবদুল্লাহ ইবনে রাবিয়াহ।[178] রীতি অনুযায়ী বনু আবদ আদ-দার গোত্রের একটি দল মক্কার বাহিনীর পতাকা বহন করছিল।[179]

173 আর-রাহীকুল মাখতুম, উহুদ যুদ্ধ অধ্যায়।

174 আর-রাহীকুল মাখতুম, উহুদ যুদ্ধ অধ্যায়।

175 আর-রাহীকুল মাখতুম, উহুদ যুদ্ধ অধ্যায়।

176 আর-রাহীকুল মাখতুম, উহুদ যুদ্ধ অধ্যায়।

177 Muir; Weir (1912) p. 258.

178 আর-রাহীকুল মাখতুম, উহুদ যুদ্ধ অধ্যায়।

179 আর-রাহীকুল মাখতুম, উহুদ যুদ্ধ অধ্যায়।

যুদ্ধের সূচনা

যুদ্ধ শুরু হওয়ার পূর্বে আনসারদেরকে আবু সুফিয়ান বার্তা পাঠিয়ে জানান যে তারা যদি মুহাজির মুসলিমদেরকে ত্যাগ করে তাহলে তাদের কোনো ক্ষতি করা হবে না এবং শহর আক্রমণ করা হবে না। কিন্তু আনসাররা এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে।[180]

মদিনাত্যাগী আবু আমর মক্কার পক্ষে প্রথম আক্রমণ চালায়। মুসলিমদের তীরের বৃষ্টিতে আবু আমর ও তার লোকেরা পিছু হটে মক্কার সারির পেছনের দিকে সরে আসে। এরপর মক্কার পতাকাবাহক তালহা ইবনে আবি তালহা আল-'আবদারি এগিয়ে গিয়ে দ্বন্দ্বযুদ্ধের আহ্বান করেন। যুবাইর ইবনুল আওয়াম(রাঃ) আহ্বান শুনে এগিয়ে যান এবং তালহাকে হত্যা করেন।[181] তালহার ভাই উসমান ইবনে আবি তালহা(রাঃ) এগিয়ে গিয়ে পড়ে যাওয়া পতাকা তোলেন। মুসলিমদের মধ্যে থেকে হামজা ইবনে আবদুল মুত্তালিব(রাঃ) এগিয়ে এসে তাকে হত্যা করেন। মক্কার পতাকা বহনের দায়িত্ব তাদের পরিবারের উপর ন্যস্ত ছিল। একারণে তালহার ভাই ও পুত্রসহ ছয়জন একের পর এগিয়ে আসে এবং সবাই নিহত হয়।[182][183]

দ্বন্দ্বযুদ্ধের পর দুই বাহিনীর মধ্যে মূল লড়াই শুরু হয়। যুদ্ধে আগত কুরাইশ নারীরা দফ বাজিয়ে সেনাদের উৎসাহ দিচ্ছিল। মুসলিমরা মক্কার সৈনিকদের সারি ভেঙে ফেলতে সক্ষম হওয়ায় মক্কার বাহিনীর মনোবল ভেঙে পড়ে। খালিদ বিন ওয়ালিদের নেতৃত্বে মক্কার অশ্বারোহীরা তিনবার মুসলিম বাহিনীর বাম পার্শ্বে আক্রমণ চালাতে চেষ্টা করে কিন্তু জাবালে রুমাতের উপর মোতায়েন করা তীরন্দাজদের আক্রমণের কারণে তারা বেশি অগ্রসর হতে পারেনি।[184][185] এর ফলে যুদ্ধক্ষেত্রে মুসলিমরা সুবিধাজনক অবস্থান লাভ করে এবং বিজয়ের নিকটে পৌছে যায়। এসময় মুসলিম তীরন্দাজদের একটি বড় অংশ নির্দেশ অমান্য করে পাহাড় থেকে নেমে আসে এবং মূল বাহিনীর সাথে যোগ দেয়। ফলে বাম পার্শ্বের প্রতিরক্ষা দুর্বল হয়ে পড়ে।[186]

180 আর-রাহীকুল মাখতুম, উহুদ যুদ্ধ অধ্যায়।

181 আর-রাহীকুল মাখতুম, উহুদ যুদ্ধ অধ্যায়।

182 আর-রাহীকুল মাখতুম, উহুদ যুদ্ধ অধ্যায়।

183 Muir; Weir (1912) p. 259.

184 আর-রাহীকুল মাখতুম, উহুদ যুদ্ধ অধ্যায়।

185 Muir; Weir (1912) p. 260.

186 "Uhud", Encyclopedia of Islam Online.

এই পরিস্থিতিতে খালিদের নেতৃত্বাধীন মক্কার অশ্বারোহীরা সুযোগ কাজে লাগায়। নির্দেশ মেনে অবস্থান ত্যাগ না করা অবশিষ্ট তীরন্দাজদের উপর তারা আক্রমণ চালালেও সংখ্যাস্বল্পতার কারণে খালিদের অশ্বারোহিদের প্রতিহত করতে ব্যর্থ হয়। এর ফলে মক্কার বাহিনী মুসলিম বাহিনীর পার্শ্বভাগ ও পেছনের ভাগে আক্রমণ করতে সক্ষম হয়। এই বিশৃঙ্খল অবস্থায় অনেক মুসলিম মারা যায়।[187] একটি ক্ষুদ্র অংশ দল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে এবং মদিনার দিকে অগ্রসর হয়।[188] মক্কার বাহিনীর আক্রমণে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আহত হন এবং তার একটি দাঁত ভেঙে যায়। কিন্তু গুজব ছড়ায় যে তিনি নিহত হয়েছেন।[189]

তীব্র সম্মুখযুদ্ধের পর অধিকাংশ মুসলিম উহুদ পর্বতের ঢালে জমায়েত হতে সক্ষম হয়। মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও পর্বতের উপরের দিকে আশ্রয় নেন। মক্কার সেনারা পর্বতের দিকে অগ্রসর হয় কিন্তু উমর ইবনুল খাত্তাব(রাঃ) ও মুসলিমদের একটি দলের প্রতিরোধের কারণে বেশি এগোতে সক্ষম হয়নি। ফলে লড়াই থেমে যায়।[190]

হিন্দ ও তার সঙ্গীরা এসময় মুসলিমদের লাশ টুকরো করে, লাশের কান, নাক কেটে পায়ের গয়নার মত পরিধান করে। যুদ্ধ চলাকালে হামজা ইবনে আবদুল মুত্তালিব(রাঃ) ইথিওপীয় দাস ওয়াহশি ইবনে হারবের বর্শার আঘাতে নিহত হয়েছিলেন। হামজাকে হত্যা করতে পারলে দাসত্ব থেকে মুক্তি দেয়া হবে এমন প্রতিশ্রুতি পাওয়ার কারণে ওয়াহশি হামজাকে হত্যা করেছিলেন। হিন্দ নিহত হামজার কলিজা বের করে চিবিয়েছিলেন।[191][192]

মুসলিমরা পর্বতে আশ্রয় নেয়ার পর আবু সুফিয়ানের সাথে উমরের কিছু উত্তপ্ত বাক্যবিনিময় হয়। কথোপকথনের সময় আবু সুফিয়ান এই দিনকে বদরের প্রতিশোধ বলে উল্লেখ করেন। প্রত্যুত্তরে উমর বলেন যে মুসলিমদের নিহতরা জান্নাতে এবং

---

187 "Uhud", Encyclopedia of Islam Online.

188 আর-রাহীকুল মাখতুম, উহুদ যুদ্ধ অধ্যায়।

189 আর-রাহীকুল মাখতুম, উহুদ যুদ্ধ অধ্যায়।

190 আর-রাহীকুল মাখতুম, উহুদ যুদ্ধ অধ্যায়।

191 আর-রাহীকুল মাখতুম, উহুদ যুদ্ধ অধ্যায়।

192 Ibn Ishaq (1955) 380—388, cited in Peters (1994) p. 218.

কাফির নিহতরা জাহান্নামে আছে।[193] এরপর মক্কার বাহিনী মক্কাভিমুখী যাত্রা করে। মুসলিমরা নিহত সৈনিকদেরকে যুদ্ধের ময়দানে দাফন করে।


[194]

চিত্রঃ উহুদ পর্বত।


[195]

চিত্রঃ উহুদ শহীদদের কবরস্থান থেকে উহুদ পাহাড়ের দৃশ্য

193 আর-রাহীকুল মাখতুম, উহুদ যুদ্ধ অধ্যায়।

194 https://en.wikipedia.org/wiki/Battle_of_Uhud

195 https://en.wikipedia.org/wiki/Battle_of_Uhud

[196]

চিত্রঃ উহুদ পর্বতের উপত্যকা (মিনার কাঠামোর সারিতে নীচে দ্বিখণ্ডিত পর্বতটি দেখা যাচ্ছে) যেখানে আঘাতের পর মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিশ্রামের জন্য নিয়ে যাওয়া হয়েছিল।

[197]

চিত্রঃ উহুদ পাহাড়ের কাছে হামজার(রাঃ) কবর।

196 https://en.wikipedia.org/wiki/Battle_of_Uhud
197 https://en.wikipedia.org/wiki/Battle_of_Uhud

এক নজরে উহুদ যুদ্ধ

বিবাদমান পক্ষ	
মদিনার মুসলিম	মক্কার কুরাইশ
সেনাধিপতি ও নেতৃত্ব প্রদানকারী	
মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আবু বকর (রাঃ) উমর ইবনুল খাত্তাব(রাঃ) উসমান ইবনে আফফান(রাঃ) আলি ইবনে আবি তালিব(রাঃ) হামজা ইবনে আবদুল মুত্তালিব (রাঃ) মুসআব ইবনে উমাইর (রাঃ) মুনজির ইবনে আমর(রাঃ) যুবাইর ইবনুল আওয়াম(রাঃ) উবাইদা ইবনে সামিত (রাঃ)	আবু সুফিয়ান খালিদ বিন ওয়ালিদ ইকরিমা ইবনে আবি জাহল সাফওয়ান ইবনে উমাইয়া আবদুল্লাহ ইবনে রাবিয়াহ হিন্দ বিনতে উতবা (মহিলাদের সেনাপতি)
শক্তি	
৭০০ পদাতিক, ৫০ তীরন্দাজ, ৪টি ঘোড়া	৩,০০০ পদাতিক, ৩,০০টি উট, ২০০টি ঘোড়া
হতাহত ও ক্ষয়ক্ষতি	
৭০ জন শহীদ	২২-৩৭ জন নিহত

[198]

198 https://en.wikipedia.org/wiki/Battle_of_Uhud

খন্দকের যুদ্ধ

খন্দকের যুদ্ধ (আরবি: غزوة الخندق, প্রতিবর্ণীকৃত: *Ghazwah al-Khandaq*) বা **আহযাবের যুদ্ধ** (আরবি: غزوة الاحزاب, প্রতিবর্ণীকৃত: *Ghazwah al-Ahzab*) ৫ হিজরিতে (৬২৭ খ্রিষ্টাব্দ) সংঘটিত হয়। এসময় ২৭দিন ধরে আরব ও ইহুদি গোত্রগুলি মদিনা অবরোধ করে রাখে। জোট বাহিনীর সেনাসংখ্যা ছিল প্রায় ১০,০০০ এবং সেসাথে তাদের ৬০০ ঘোড়া ও কিছু উট ছিল। অন্যদিকে মদিনার বাহিনীতে সেনাসংখ্যা ছিল ৩,০০০।

পারস্য থেকে আগত সাহাবি সালমান ফারসির(রাঃ) পরামর্শে হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) মদিনার চারপাশে পরিখা খননের নির্দেশ দেন।[199][200][201] প্রাকৃতিকভাবে মদিনায় যে প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ছিল তার সাথে এই ব্যবস্থা যুক্ত হয়ে আক্রমণকারীদেরকে নিষ্ক্রিয় করে ফেলে। জোটবাহিনী মুসলিমদের মিত্র মদিনার ইহুদি বনু কুরাইজা গোত্রকে নিজেদের পক্ষে আনে যাতে তারা দক্ষিণ দিক থেকে শহর আক্রমণ করে। কিন্তু মুসলিমদের তৎপরতার ফলে তাদের জোট ভেঙে যায়। মুসলিমদের সুসংগঠিত অবস্থা, জোটবাহিনীর আত্মবিশ্বাস হ্রাস ও খারাপ আবহাওয়ার কারণে শেষপর্যন্ত আক্রমণ ব্যর্থ হয়।

এই যুদ্ধে জয়ের ফলে ইসলাম পূর্বের চেয়ে আরো বেশি প্রভাবশালী হয়ে উঠে।

পটভূমি

কুরাইশদের সাথে বনু নাদির ও বনু কাইনুকা জোট গঠন করে মদিনা আক্রমণ করেছিল। ইতিপূর্বে বনু নাদির ও বনু কাইনুকা গোত্রকে বিশ্বাসঘাতকতার কারণে মদিনা থেকে বহিষ্কার করা হয়েছিল। তাই প্রতিশোধ হিসেবে তারা কুরাইশদের সাথে জোট গঠন করে।[202][203]

৬২৭ সালের শুরুর দিকে বনু নাদির ও বনু ওয়াইল গোত্রের একটি সম্মিলিত প্রতিনিধিদল মক্কার কুরাইশদের সাথে সাক্ষাত করে।[204][205] এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য

199 Islamiat for students.

200 Islam Beliefs and Practices.

201 The Sealed Nectar by Safi-ur-Rahman.

202 Sa'd, Ibn (১৯৬৭)। Kitab al-tabaqat al-kabir। 2। Pakistan Historical Society। পৃষ্ঠা 82–84।

203 Mubarakpuri, The Sealed Nectar, pp. 196–198.

204 আর-রাহীকুল মাখতুম, গাযওয়ায়ে আহযাব অধ্যায়।

205 সীরাতে ইবনে হিশাম, খন্দক যুদ্ধ অধ্যায়।

ছিলেন বনু নাদিরের সালাম ইবনে আবু হুকাইক, হুয়াই ইবনে আখতাব, কিনানা ইবনে আবুল হুকাইক এবং বনু ওয়াইলের হাওজা ইবনে কায়েস ও আবু আম্মার।[206] তারা মুসলিমদের সাথে যুদ্ধ করার জন্য কুরাইশদের উদ্বুদ্ধ করে এবং সহায়তার প্রতিশ্রুতি দেয়। তারা যুক্তি দেখায় যে কুরাইশরা মুসলিমদেরকে উহুদের পর পুনরায় বদরে লড়াইয়ের প্রতিশ্রুতি দিলেও তা পালন করতে না পারায় যোদ্ধা হিসেবে কুরাইশদের সম্মান নষ্ট হয়েছে। কুরাইশরা তাদের প্রস্তাব মেনে নেয়।[207]

কুরাইশদের সাথে সাক্ষাতের পর তারা নজদের বিভিন্ন গোত্রের সাথে সাক্ষাত করে। বনু গাতাফান গোত্রের কাছে গিয়ে তাদেরকেও যুদ্ধের জন্য রাজি করায়। পাশাপাশি তারা অন্যান্য গোত্রগুলির কাছে গিয়েও যুদ্ধের জন্য উদ্বুদ্ধ করে।[208]

আবু সুফিয়ানের সার্বিক নেতৃত্বে দক্ষিণ দিক থেকে কুরাইশ, কিনানা ও অন্যান্য গোত্রগুলি রওয়ানা হয়। এদের মধ্যে ৪,০০০ জন পদাতিক,[209] ৩০০ জন অশ্বারোহী এবং ১,০০০-১,৫০০ জন উষ্ট্রারোহী ছিল।[210] তারা মাররুজ জাহরানে পৌছানোর পর বনু সুলাইম গোত্র তাদের সাথে যোগ দেয়।[211]

একই সময় নজদের দিক থেকে বনু গাতাফানের ফাজারা, মুররা ও আশজা গোত্র মদিনের দিকে রওয়ানা হয়। এই তিন গোত্রের সেনাপতি ছিলেন যথাক্রমে উয়াইনা বিন হিসন, হারিস বিন আউফ ও মিসআর বিন রুহাইলা। তাদের নেতৃত্বে বনু আসাদসহ আরো অন্যান্য গোত্রে যোদ্ধারাও অগ্রসর হয়। নজদ থেকে আগতদের সংখ্যা ছিল ছয় হাজার এবং সম্মিলিতভাবে সেনাসংখ্যা ছিল প্রায় ১০,০০০। এই সংখ্যা মদিনার জনসংখ্যার চেয়েও বেশি ছিল।[212]

মূলত, উহুদের যুদ্ধকে কেন্দ্র করেই এই যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল ।

মুসলিমদের প্রতিরক্ষা

যুদ্ধযাত্রার খবর মদিনায় হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর কাছে পৌছায়। তাই গৃহীতব্য পদক্ষেপের বিষয়ে তিনি সভা আহ্বান করেন। সভায় বদরের মত খোলা ময়দানে লড়াই

206 সীরাতে ইবনে হিশাম, খন্দক যুদ্ধ অধ্যায়।

207 আর-রাহীকুল মাখতুম, গাযওয়ায়ে আহযাব অধ্যায়।

208 আর-রাহীকুল মাখতুম, গাযওয়ায়ে আহযাব অধ্যায়।

209 আর-রাহীকুল মাখতুম, গাযওয়ায়ে আহযাব অধ্যায়।

210 al-Halabi, al-Sirat al-Halbiyyah, p. 19.

211 আর-রাহীকুল মাখতুম, গাযওয়ায়ে আহযাব অধ্যায়।

212 আর-রাহীকুল মাখতুম, গাযওয়ায়ে আহযাব অধ্যায়।

এবং উহুদের ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে শহরের ভেতর থেকে প্রতিরক্ষা উভয় প্রকার মতামত উঠে আসে।[213] সালমান ফারসি পারস্যে থাকাকালীন অভিজ্ঞতার উল্লেখ করে পরিখা খনন করে প্রতিরক্ষামূলক অবস্থান গ্রহণের মত দেন। আলোচনায় শেষপর্যন্ত এই মত গৃহীত হয়। প্রতি দশজন ব্যক্তির উপর ৪০ হাত পরিখা খননের দায়িত্ব দেয়া হয়।[214]

পরিখা দ্রুত তৈরীর জন্য হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) সহ মদিনার প্রতিটি সবল পুরুষ এই খননকার্যে যোগ দিয়েছিলেন।[215][216] মদিনার বাকি অংশ পাথুরে পর্বত ও গাছপালা আবৃত হওয়ার কারণে সুরক্ষিত ছিল। তাই শুধুমাত্র শহরের উত্তর অংশে পরিখা খনন করা হয়েছিল। নারী ও শিশুদেরকে শহরের ভেতরের দিকে প্রেরণ করা হয়।[217][218][219] যুদ্ধকালীন অবস্থায় আবদুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতুমকে(রাঃ) মদিনার দায়িত্ব দেয়া হয়।[220]

সালা পাহাড়কে পেছনে রেখে মুসলিমদের প্রধান কেন্দ্র স্থাপন করা হয়[221] এবং সেনারা সেখানে জমায়েত হয়।[222] প্রতিপক্ষ পরিখা অতিক্রম করতে সফল হলে এই অবস্থান মুসলিমদেরকে সুবিধা প্রদান করত।[223]

শহর রক্ষার জন্য গঠিত বাহিনীতে সৈনিক ছিল ৩,০০০।[224][225]

---

213 Ramadan, In the Footsteps of the Prophet, pp. 137–145.

214 আর-রাহীকুল মাখতুম, গাযওয়ায়ে আহযাব অধ্যায়।

215 আর-রাহীকুল মাখতুম, গাযওয়ায়ে আহযাব অধ্যায়।

216 Rodinson, p. 209.

217 আর-রাহীকুল মাখতুম, গাযওয়ায়ে আহযাব অধ্যায়।

218 Nomani, Sirat al-Nabi, p. 368-370.

219 Rodinson, p. 209.

220 আর-রাহীকুল মাখতুম, গাযওয়ায়ে আহযাব অধ্যায়।

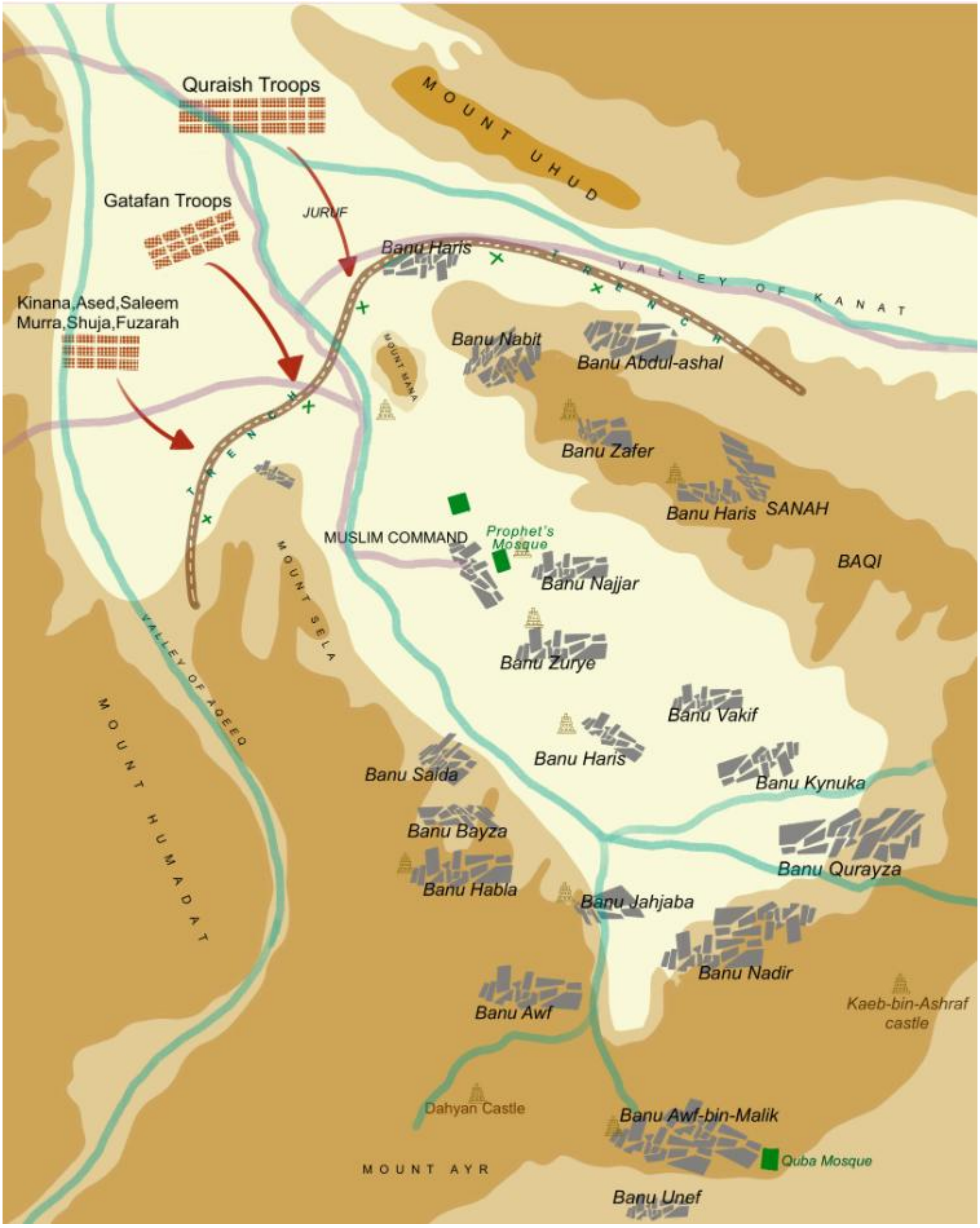
221 আর-রাহীকুল মাখতুম, গাযওয়ায়ে আহযাব অধ্যায়।

222 Nomani, Sirat al-Nabi, p. 368-370.

223 Watt, *Muhammad at Medina*, p. 34-37.

224 আর-রাহীকুল মাখতুম, গাযওয়ায়ে আহযাব অধ্যায়।

225 Glasse & Smith , New Encyclopedia of Islam: A Revised Edition of the Concise Encyclopedia of Islam, p. 81.



[226] মদিনা অবরোধের চিত্র

226 https://en.wikipedia.org/wiki/Battle_of_the_Trench

মদিনা অবরোধ

৬২৭ সালের জানুয়ারিতে মদিনা অবরোধ শুরু হয় এবং তা ২৭ দিন স্থায়ী ছিল।[227] মক্কা থেকে আগত কুরাইশ বাহিনী মদিনার নিকটে রুমা নামক স্থানের জুরফ ও জাগাবার মধ্যবর্তী মাজমাউল আসয়াল নামক স্থানে এবং নজদ থেকে আগত গাতাফান ও অন্যান্য বাহিনী উহুদ পর্বতের পূর্বে জানাবে নাকমায় শিবির স্থাপন করে।[228]

আরবীয় যুদ্ধকৌশলে পরিখা খনন প্রচলিত ছিল না তাই মুসলিমদের খননকৃত পরিখার কারণে জোটবাহিনী অপ্রস্তুত অবস্থায় পড়ে। পরিখা পার হওয়ার কোনো ব্যবস্থা তাদের ছিল না। তারা অশ্বারোহীদের সহায়তায় বাধা কাটিয়ে উঠার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়।[229] দুই বাহিনী পরিখার দুই পাশে এসে সমবেত হয়। আক্রমণকারীরা পার হওয়ার জন্য দুর্বল স্থানের সন্ধান করছিল। দিনের পর দিন দুই বাহিনী পরস্পরকে লক্ষ্য করে তীর নিক্ষেপ করে চলছিল।

এই অচলাবস্থায় কুরাইশ সেনারা অধৈর্য হয়ে পড়ে। আমর ইবনে আবদ উদ, ইকরিমা ইবনে আবি জাহল ও জারার বিন খাত্তাবসহ আক্রমণকারীদের একটি দল ঘোড়ায় চড়ে একটি সংকীর্ণ স্থান দিয়ে পরিখা পার হতে সক্ষম হন।[230] এরপর হযরত আলি ইবনে আবি তালিব(রাঃ) ও অন্য কয়েকজন সাহাবি সেখানে অবস্থান নিয়ে তাদের গতিরোধ করেন। আমর দ্বন্দ্বযুদ্ধের জন্য মুসলিমদেরকে আহ্বান জানালে হযরত আলি ইবনে আবি তালিব(রাঃ) লড়াইয়ের জন্য এগিয়ে যান।[231] দ্বন্দ্বযুদ্ধে আমর(রাঃ) নিহত হওয়ার পর আতঙ্কিত হয়ে বাকিরা পিছু হটতে বাধ্য হয়।[232][233]

রাতের বেলায়ও আক্রমণকারী সৈনিকরা পরিখা অতিক্রমের জন্য কয়েক দফা চেষ্টা চালিয়েছিল। কিন্তু এসকল চেষ্টা ব্যর্থ হয়। মুসলিমরা পরিখার অপর পাশ থেকে তীর নিক্ষেপ করে তাদের বাধা প্রদান করে। পরিখার পুরো দৈর্ঘ্য বরাবর পদাতিকদের মোতায়েন করা সম্ভব ছিল কিন্তু সম্মুখ যুদ্ধে মুসলিমদের সুবিধাজনক অবস্থানের কারণে

---

227 Watt, Muhammad at Medina, p. 36f.

228 আর-রাহীকুল মাখতুম, গাযওয়ায়ে আহযাব অধ্যায়।

229 Watt, Muhammad: Prophet and Statesman, pp. 167–174.

230 আর-রাহীকুল মাখতুম, গাযওয়ায়ে আহযাব অধ্যায়।

231 আর-রাহীকুল মাখতুম, গাযওয়ায়ে আহযাব অধ্যায়।

232 আর-রাহীকুল মাখতুম, গাযওয়ায়ে আহযাব অধ্যায়।

233 Zafrulla Khan, Muhammad, Seal of the Prophets, pp. 177–179.

তারা এই পদক্ষেপ নেয়নি।[234] পরিখা খননের সময় তোলা মাটি দিয়ে তৈরি বাধের পেছনের সুরক্ষিত অবস্থান থেকে মুসলিমরা তীর ও পাথর ছুড়ে আক্রমণ করার জন্য প্রস্তুত ছিল। ফলে কোনোপ্রকার আক্রমণ হলে ব্যাপক হতাহতের সম্ভাবনা ছিল।[235] লড়াই মূলত উভয় পক্ষের তীর নিক্ষেপের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। এতে মুসলিমদের মধ্যে ছয়জন এবং আক্রমণকারীদের মধ্যে দশজন মারা যায়। এছাড়াও দুয়েকজন তলোয়ারের আঘাতেও মারা যায়।[236]

যুদ্ধক্ষেত্রের পরিস্থিতির কারণে হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) সহ অন্য মুসলিমদের নামাজ কয়েকদিন কাজা হয়। সূর্যাস্তের পর এসব নামাজ আদায় করা হয়েছিল।[237]

---

234 Watt, Muhammad: Prophet and Statesman, pp. 167–174.

235 Rodinson , pp. 209f.

236 আর-রাহীকুল মাখতুম, গাযওয়ায়ে আহযাব অধ্যায়।

237 আর-রাহীকুল মাখতুম, গাযওয়ায়ে আহযাব অধ্যায়।

এক নজরে খন্দক যুদ্ধ

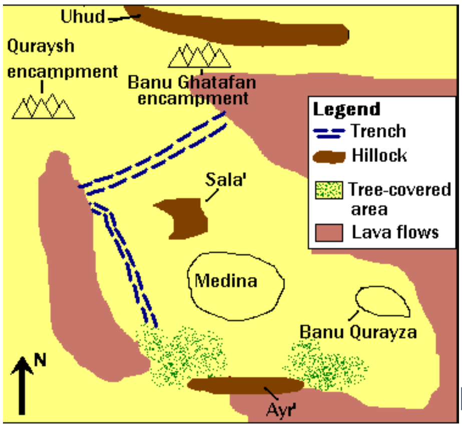
বিবাদমান পক্ষ	
মুসলিম বাহিনীতে ছিল • আউস ও খাজরাজের আনসার • মুহাজির	জোট বাহিনীতে ছিল • মক্কার কুরাইশ • নাদির ও কাইনুকার ইহুদি • অন্যান্য আরব গোত্র যেমন বনু গাতাফান, বনু মুররা ও অন্যান্য
সেনাধিপতি ও নেতৃত্ব প্রদানকারী	
হযরত মুহাম্মদ (সাঃ.) আবু বকর(রাঃ) উমর ইবনুল খাত্তাব(রাঃ) উসমান ইবনে আফফান(রাঃ) হযরত আলী(রাঃ) সালমান ফারসি(রাঃ) সাদ ইবনে মুয়াজ (রাঃ)	আবু সুফিয়ান ইবনে হারব ইকরিমা ইবনে আবি জাহল উয়াইনা বিন হিসন হারিস বিন আউফ মিসআর বিন রুহাইলা হুয়াই ইবনে আখতাব কাব ইবনে আসাদ
শক্তি	
৩,০০০	১০,০০০
হতাহত ও ক্ষয়ক্ষতি	
৭ শহীদ	নিহত ১৬

[238]

238 https://en.wikipedia.org/wiki/Battle_of_the_Trench

[239]

চিত্রঃ খন্দকের যুদ্ধের স্থান, মদিনা



[240]

চিত্রঃ খন্দকের যুদ্ধের মানচিত্র

[241]

চিত্রঃ সালমান ফারসি(রাঃ) মসজিদ, মদিনা

অবরোধ ব্যর্থ হওয়ার ফলে হযরত মুহাম্মদ(সাঃ) নেতা হিসেবে আরো বেশি উল্লেখযোগ্য হয়ে উঠেন।[242] মক্কা এসময় সর্বশক্তি দিয়ে মদিনা থেকে মুসলিমদেরকে উৎখাত করতে চেয়েছিল কিন্তু পরাজিত হওয়ার ফলে তারা সিরিয়ায় তাদের বাণিজ্য হারায় এবং তাদের সম্মান অনেকাংশে নষ্ট হয়। ওয়াটের মতে এসময় মক্কার লোকেরা

239 https://en.wikipedia.org/wiki/Battle_of_the_Trench

240 https://en.wikipedia.org/wiki/Battle_of_the_Trench

241 https://en.wikipedia.org/wiki/Battle_of_the_Trench

242 Watt, Muhammad: Prophet and Statesman, p. 96.

ভিন্নভাবে চিন্তা করতে শুরু করে এবং ইসলাম গ্রহণকে ইতিবাচক হিসেবে বিবেচনা করতে থাকে।[243]

খায়বারের যুদ্ধ

খায়বারের যুদ্ধ (আরবি: غزوة خيبر, হিব্রু: קרב ח'ייבר) ৬২৮ খ্রিষ্টাব্দে তৎকালীন আরবের মদিনা নগরী থেকে ১৫০ কিলোমিটার (৯৩ মাইল) দুরে অবস্থিত খায়বার নামক মরুভূমিতে বসবাসরত ইহুদিগণের সাথে মুসলিমগণের সঙ্ঘটিত একটি যুদ্ধ। মুসলিমদের ইতিহাস অনুসারে, মুসলিমগণ সেখানে দুর্গে আশ্রয় নেয়া ইহুদিদেরকে আক্রমণ করেছিল।[244]

সপ্তম হিজরিতে খায়বারের ইহুদিরা পরিকল্পনা করে মদীনা আক্রমণ করার কারণে খায়বার যুদ্ধ হয়। খায়বার মদীনা থেকে ৮০ মাইল দূরের একটি বড় শহর। এখানে ইহুদীদের অনেকগুলো দুর্গ ও ক্ষেত খামার ছিল। মূলত খায়বার ছিল ইহুদীদের একটি উপনিবেশ। খায়বারের ইহুদীরা বনু কোরাইজা গোত্রের ইহুদীদেরকে বিশ্বাসঘাতকায় উদ্দীপিত করেছিল। মুহাম্মাদ(সাঃ) কে হত্যা করার পরিকল্পনা এই খায়বার থেকে করা হতো। খায়বারের ইহুদীরা গাতাফান গোত্র ও বেদুঈনদের সাথে মিলিত হয়ে মদীনা আক্রমণ করার ব্যাপারে পরিকল্পনা করছিল। খায়বার যুদ্ধে পরাজিত ইহুদীদেরকে মুহাম্মাদ(সাঃ) কোন নির্বাসন দেন নি। প্রতি বছর তাদের উৎপাদিত ফল ফসলের অর্ধেক ইহুদীরা মুসলমানদের কে দিবে এই শর্তে খায়বারের ইহুদীরা খায়বারে থাকার অনুমতি পায়। কিন্তু এই খায়বার যুদ্ধের পর পর এক ইহুদী মহিলা মুহাম্মাদ(সাঃ) কে আমন্ত্রণ করে ছাগলের মাংসের ভিতরে বিষ মিশিয়ে মুহাম্মাদ(সাঃ) কে হত্যা করতে চেয়েছিল। এই ঘটনার পরেও মুহাম্মাদ(সাঃ) খায়বারের সকল ইহুদীদের কে ক্ষমা করে দিয়েছিলেন।

আক্রমণের কারণ প্রসঙ্গে, স্কটিশ ঐতিহাসিক উইলিয়াম মন্টগোমারি ওয়াট খায়বার যুদ্ধে বনু নাদির গোত্রের উপস্থিতি উদ্ধৃত করেন, যারা মদিনার ইসলামী সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবেশী আরব গোত্রগুলোর মধ্যে শত্রুভাবাপন্ন মানসিকতা জাগিয়ে তুলছিল। ইতালীয় প্রাচ্যবিদ লরা ভেক্সিয়া ভ্যাগ্লিয়েরি ওয়াটের তত্ত্বের সাথে সহমত পোষণ করে দাবী করেন যে, যুদ্ধের পেছনে আরও কারণ থাকতে পারে, যেগুলো হল, ইহুদিদের উক্ত

---

243 Watt, Muhammad: Prophet and Statesman, pp. 167–174.

244 "Ali"। Encyclopædia Britannica Online.

দুরভিসন্ধির প্রতিক্রিয়া মুহাম্মাদের সাহাবীদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ার সম্ভাবনা এবং ভবিষ্যতের যুদ্ধ অভিযানসমূহের রসদ হিসেবে যুদ্ধলব্ধ মালামালসমূহ লুণ্ঠনের উপযোগিতা।[245][246]

পরিশেষে খায়বারের ইহুদিগণকে অবরোধ করা হয় এবং উক্ত উপত্যকায় তাদেরকে থাকার অনুমতি দেয়া হয় এই শর্তে যে, তারা মুসলিমগণকে তাদের উৎপাদিত ফসলের অর্ধেক বাৎসরিকভাবে প্রদান করবে। খলিফা ওমররের সময়ে ওমর কর্তৃক বহিষ্কৃত হওয়ার আগ পর্যন্ত ওখানেই তাদের বসবাস অব্যাহত ছিল। এই বিজয়ের ফলাফলস্বরূপ বিজিত ইহুদিদের উপর ইসলামের বিধান অনুযায়ী জিজিয়া কর আরোপ করা হয় এবং তাদের অধিভুক্ত জমিসমূহ মুসলিমদের প্রশাসনিক দখলের অন্তর্ভুক্ত হয়।[247][248][249] বিনিময়ে, ইহুদিগণ তাদের ধর্মপালনের অনুমতি পায়, বৃহৎ পরিসরে নিজ সম্প্রদায়ের স্বায়ত্তশাসনের অধিকার লাভ করে, মুসলিমদের কাছ থেকে বহিঃশক্তির আক্রমণ থেকে প্রতিরক্ষা লাভের প্রতিশ্রুতি লাভ করে এবং তাদেরকে সামরিক অভিযানে অংশগ্রহণ এবং যাকাত প্রদানের দায়িত্ব থেকে অব্যহতি দেয়া হয়, যেগুলো মুসলিম নাগরিকদের জন্য বাধ্যতামূলক।

আল-হুদায়বিয়ার সন্ধি (আরবি: صُلح الْحُدَيْبِيَة) হল একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা, যা ইসলামের নবী মুহাম্মদ (সাঃ)-এর জীবদ্দশায় সংঘটিত হয়। এই চুক্তি ৬২৮ খ্রিষ্টাব্দে (৬ হিজরি, জিলকদ মাসে) মদিনার প্রতিনিধি হিসেবে মুহাম্মদ (সাঃ) এবং মক্কার কুরাইশ গোত্রের মধ্যে স্বাক্ষরিত হয়।

এই সন্ধির ফলে মদিনা ও মক্কার মধ্যে চলমান উত্তেজনা প্রশমিত হয়। এতে দুই পক্ষের মধ্যে ১০ বছরের জন্য শান্তিচুক্তি স্থাপিত হয় এবং মুহাম্মদ (সাঃ)-এর অনুসারীদের পরের বছর শান্তিপূর্ণভাবে তীর্থযাত্রা করার অনুমতি দেওয়া হয়। এই তীর্থযাত্রা পরবর্তীতে প্রথম উমরা নামে পরিচিত হয়।

তবে, এই চুক্তি দুই বছরের মধ্যেই ভঙ্গ হয়। ইসলামি সূত্র অনুযায়ী, কুরাইশ গোত্র এই সন্ধির শর্ত লঙ্ঘন করে। এর ফলস্বরূপ, ৬৩০ খ্রিষ্টাব্দে মুহাম্মদ (সাঃ) ১০,০০০ সৈন্য নিয়ে মক্কার দিকে অগ্রসর হন।

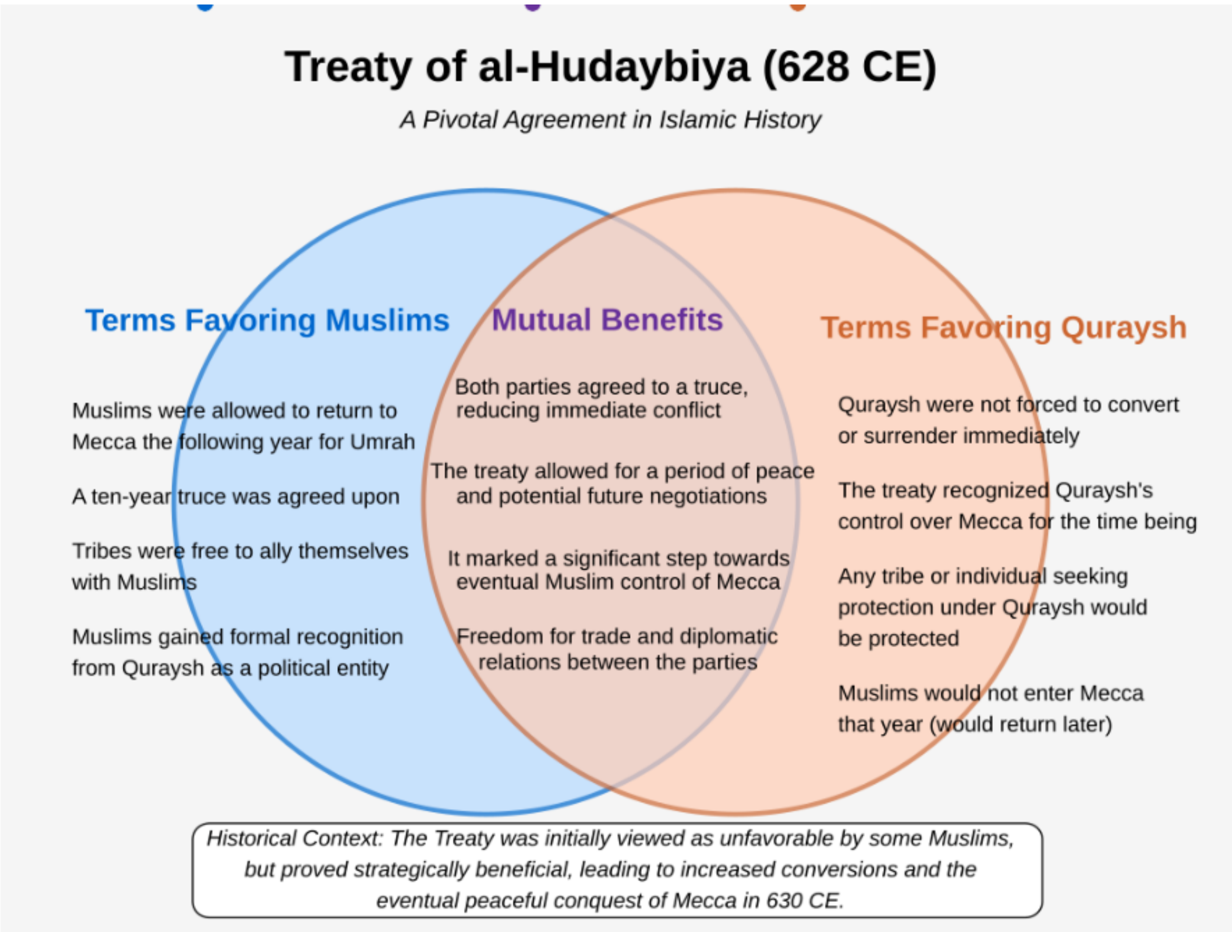
245 Veccia Vaglieri, L. "Khaybar", Encyclopaedia of Islam.

246 Stillman 19.

247 Veccia Vaglieri, L. "Khaybar", Encyclopaedia of Islam.

248 Stillman 18–19.

249 Lewis 10.



[250]

চিত্রঃ হুদায়বিয়ার সন্ধির শর্তাবলি

৬২৮ খ্রিষ্টাব্দের মার্চ মাসে, নবী মুহাম্মদ (সাঃ) একটি স্বপ্ন দেখেন, যেখানে তিনি কাবার তাওয়াফ করছেন। এই স্বপ্ন দেখে তিনি তীর্থযাত্রার উদ্দেশ্যে মক্কায় যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন।[251] মক্কার লোকদের প্রতিক্রিয়া সহিংস হতে পারে, এই আশঙ্কায় তিনি মদিনার আশেপাশের বেদুইন ও গোত্রীয় মিত্রদের আমন্ত্রণ জানান তাঁর সঙ্গে যোগ দিতে।

তবে অধিকাংশই যোগ দেয়নি, সম্ভবত তারা কোনো যুদ্ধলাভ বা লুটের আশাবাদী ছিল না অথবা সংঘর্ষের আশঙ্কা করেছিল।[252][253]

250 https://en.wikipedia.org/wiki/Treaty_of_al-Hudaybiya

251 Watt 1971.

252 Watt 1971.

253 Guillaume 1998, পৃ. 499.

মুহাম্মদ (সাঃ) প্রায় ১,৫০০ মুসলমান ও কিছু গোত্রীয় মিত্র নিয়ে উমরা পালনের জন্য মক্কার দিকে যাত্রা করেন।[254] কিছু সূত্রে মুসলমানরা অস্ত্র নিয়ে গিয়েছিল কিনা, তা নিয়ে মতভেদ রয়েছে।[255] তবে তারা তীর্থযাত্রীর পোশাকে ছিল এবং তাদের সঙ্গে কুরবানি করার পশুও ছিল।[256]

এ খবর পেয়ে মক্কার কুরাইশরা ভেবেছিল এটি একটি আক্রমণ। তারা ২০০ জন অশ্বারোহী পাঠিয়ে পথরোধ করার চেষ্টা করে। মুহাম্মদ (সাঃ) সাধারণ পথ পরিহার করে বিকল্প পথে হেঁটে হুদায়বিয়া নামক স্থানে তাঁবু স্থাপন করেন। এই স্থানটি কাবার পবিত্র সীমার সীমানায় ছিল।[257]

কুরাইশরা তাদের দূত পাঠিয়ে আলোচনা শুরু করে। মুহাম্মদ (সাঃ) জানিয়ে দেন, তিনি শুধু তীর্থযাত্রার উদ্দেশ্যেই এসেছেন, কোনো শত্রুতা তাঁর উদ্দেশ্য নয়। তবুও কুরাইশরা এটি দুর্বলতা এবং পরাজয় হিসেবে দেখেছিল। তারা বলেছিল, "যদি সে যুদ্ধ করতে না এসেও থাকে, তবে আল্লাহর কসম, আমাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে সে কখনও এই পবিত্র স্থানে প্রবেশ করতে পারবে না, এবং বেদুইনরা যেন এমন কিছু আমাদের সম্পর্কে না বলে"।[258]

এক পর্যায়ে, মুহাম্মদ (সাঃ) তাঁর ঘনিষ্ঠ সাহাবী উসমানকে(রাঃ) আলোচনার জন্য মক্কায় পাঠান। এর মধ্যে গুজব ছড়ায় যে উসমানকে(রাঃ) হত্যা করা হয়েছে। মুহাম্মদ (সা.) তাঁর অনুসারীদের কাছ থেকে প্রতিশোধ নেওয়ার অঙ্গীকার নেন। এই অঙ্গীকার 'গাছতলায় বাইআত' (*bay'at al-shajara*) নামে পরিচিত হয়। পরে জানা যায়, গুজবটি ভুল ছিল, এবং কুরাইশরা তাদের প্রতিনিধি সুহাইল ইবন আমরকে আলোচনার জন্য পাঠায়। আলোচনা শেষে একটি শান্তিচুক্তি সম্পাদিত হয়।[259][260]

---

254 Watt 1956, পৃ. 46.

255 Donner 1979, পৃ. 240.

256 Guillaume 1998, পৃ. 499–500.

257 Watt 1956, পৃ. 46.

258 Donner 1979, পৃ. 240.

259 Goerke 2000, পৃ. 241.

260 Ali 1981, পৃ. 61.

চুক্তির প্রধান শর্তাবলি ছিল:[261]

- দুই পক্ষের মধ্যে ১০ বছরের জন্য যুদ্ধবিরতি থাকবে।
- কুরাইশ থেকে কেউ মুহাম্মদ (সাঃ)-এর কাছে পালিয়ে এলে এবং তার অভিভাবকের অনুমতি না থাকলে, তাকে ফেরত পাঠাতে হবে; তবে মুসলমানদের কেউ কুরাইশে গেলে তাকে ফেরত পাঠানো হবে না।
- কেউ মুহাম্মদ (সা.)-এর সঙ্গে চুক্তি করতে চাইলে তা করতে পারবে, আবার কেউ কুরাইশের সঙ্গে চুক্তি করলে সেটিও গ্রহণযোগ্য হবে।
- মুসলমানরা এ বছর তীর্থযাত্রা না করে মদিনায় ফিরে যাবে, তবে পরের বছর তারা মক্কায় তিনদিন অবস্থান করতে পারবে। সে সময় কুরাইশরা শহর খালি করে দেবে। মুসলমানরা কেবল খাপে বাঁধানো তলোয়ার নিয়ে প্রবেশ করতে পারবে।

চুক্তিপত্রটি লেখেন আলি। তিনি যখন লিখছিলেন, "এটি হল আল্লাহর রাসূল মুহাম্মদের পক্ষ থেকে সুহাইল ইবন আমরের সঙ্গে চুক্তি", তখন সুহাইল আপত্তি জানান। তিনি বলেন, তিনি মুহাম্মদের(সাঃ) নবুয়ত মেনে নেন না, তাই শুধুমাত্র ‘মুহাম্মদ’ নাম ব্যবহার করতে হবে। মুহাম্মদ (সাঃ) এতে সম্মতি দেন।[262]

চুক্তি শেষ হওয়ার পর, সুহাইলের পুত্র আবু জন্দাল ইসলাম গ্রহণ করে মুসলমানদের সঙ্গে যোগ দিতে আসেন। তবে চুক্তির শর্ত অনুযায়ী তাকে সুহাইলের হাতে ফেরত দেওয়া হয়।[263] উমর ও কিছু সাহাবী এই চুক্তিতে অসন্তুষ্ট ছিলেন, কারণ তারা কুরাইশকে আল্লাহর শত্রু বলে মনে করতেন।[264]

পরবর্তীতে মুহাম্মদ (সাঃ) তাঁর অনুসারীদের পশু কোরবানি ও মাথা মুণ্ডন করার নির্দেশ দেন। তারা প্রথমে অনিচ্ছুক থাকলেও, নবী(সাঃ) নিজে উদাহরণ সৃষ্টি করলে তারা তাঁর অনুসরণ করে। পরে মুসলমানরা মদিনায় ফিরে যায় এবং এই সময় সূরা আল-ফাতহ (সূরা ৪৮) অবতীর্ণ হয়।[265]

---

261 Watt 1956, পৃ. 47–48.

262 Guillaume 1998, পৃ. 504.

263 Goerke 2000, পৃ. 241.

264 Ali 1981, পৃ. 61–62.

265 Goerke 2000, পৃ. 241.

পরবর্তী ঘটনা

সন্ধির শর্ত অনুযায়ী, যারা ইসলাম গ্রহণ করে মদিনায় পালিয়ে গিয়েছিল, তাদের কুরাইশদের কাছে ফিরিয়ে দেওয়া হয়। আবু বাসির নামের একজন মুসলমানকে ফেরত দেওয়ার পর, তিনি পালিয়ে সাগরতট অঞ্চলে আশ্রয় নেন। পরে প্রায় ৭০ জন মুসলমান, যাদের মধ্যে আবু জন্দালও ছিলেন, তাঁর সঙ্গে যোগ দেন। তাঁরা একটি গেরিলা বাহিনী গঠন করে মক্কার সিরিয়া-মুখী বাণিজ্য কাফেলায় আক্রমণ শুরু করেন।

এতে কুরাইশরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পড়ে এবং পরে মুহাম্মদ (সাঃ)-কে অনুরোধ জানায় যেন তিনি এই গেরিলা দলকে মদিনায় নিয়ে আসেন।

পরবর্তীতে মুসলমানরা একতরফাভাবে সন্ধিতে একটি ব্যতিক্রম সৃষ্টি করে। কিছু মুসলিম নারী মক্কা থেকে পালিয়ে মদিনায় চলে আসেন। তখন মুহাম্মদ (সাঃ) সূরা আল-মুমতাহিনা (৬০:১০) অবতীর্ণ লাভ করেন, যাতে অবিশ্বাসীদের কাছে এসব নারীদের ফিরিয়ে না দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়।[266]

মূল্যায়ন ও উত্তরাধিকার

দীর্ঘমেয়াদে হুদায়বিয়ার সন্ধি মুসলমানদের জন্য লাভজনক প্রমাণিত হয়। অনেক ঐতিহাসিক এটিকে মুহাম্মদ (সা.)-এর ক্ষমতা সংহতকরণের একটি "গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ" হিসেবে গণ্য করেন।[267] এই চুক্তির মাধ্যমে কুরাইশরা পরোক্ষভাবে মুহাম্মদ (সা.)-কে নিজেদের সমমর্যাদাসম্পন্ন নেতা হিসেবে স্বীকার করে।[268] পাশাপাশি, কাবায় তীর্থযাত্রার সুযোগ পাওয়ার মাধ্যমে ইসলামকে এমনসব গোত্রের কাছে আকর্ষণীয় করে তোলা সম্ভব হয়, যারা কাবাকে অত্যন্ত মর্যাদার চোখে দেখত।[269]

জীবনীকার ইবন হিশাম লিখেছেন, "ইসলামের ইতিহাসে এর চেয়ে বড় কোনো বিজয় হয়নি... যখন যুদ্ধ বন্ধ হয়, নিরাপদে মানুষের সাক্ষাৎ হয় এবং আলাপ-আলোচনা চলে, তখন কেউ ইসলাম নিয়ে যুক্তিযুক্তভাবে আলোচনা করে এবং তা গ্রহণ না করে থাকে না।"[270]

এই সন্ধির ফলে মুহাম্মদ (সাঃ)-এর পক্ষে আরবের অন্যান্য অঞ্চলে প্রভাব বিস্তার সহজ হয়ে ওঠে। ঐতিহাসিক ফ্রেড ডোনার ধারণা করেন, মূলত এই তীর্থযাত্রার উদ্দেশ্যই ছিল

---

[266] Goerke 2000, পৃ. 241.

[267] Donner 1979, পৃ. 241.

[268] Watt 1956, পৃ. 48.

[269] Donner 1979, পৃ. 241.

[270] Guillaume 1998, পৃ. 507.

মক্কার সঙ্গে একটি শান্তিচুক্তি অর্জন করা, কারণ মদিনা ছিল দুটি শত্রুপূর্ণ শহরের মাঝে অবস্থিত — উত্তরে খায়বার ও দক্ষিণে মক্কা — ফলে শহরটি খুবই ঝুঁকিপূর্ণ ছিল। কিন্তু তিনি সরাসরি মক্কাবাসীদের কাছে শান্তির আবেদন করতে পারেননি। তিনি এমন কৌশল অবলম্বন করেন, যাতে পরিস্থিতি সৃষ্টি হয় এবং শান্তিচুক্তি স্বয়ংক্রিয়ভাবে অর্জিত হয়। যদিও এটি ছিল একটি "বিপজ্জনক দুঃসাহসিক পদক্ষেপ", কারণ কুরাইশরা যদি সন্ধি না করে যুদ্ধ বেছে নিত, তাহলে তা বিপর্যয় ডেকে আনতে পারত।[271]

চুক্তির অল্প কিছুদিন পর মুহাম্মদ (সাঃ) খায়বার অবরোধ করেন এবং তাদের নিরস্ত করেন।[272] এরপর অন্যান্য গোত্র তাদের পছন্দমতো পক্ষ বেছে নিতে স্বাধীনতা পায় এবং মুহাম্মদ (সাঃ) কিছু কুরাইশ-সমর্থিত গোত্রকেও নিজের পক্ষে আনতে সক্ষম হন।[273]

ইসলাম-বিশেষজ্ঞ মন্টগোমারি ওয়াট মনে করেন, এই সন্ধির মাধ্যমে মদিনার অবরোধ ভেঙে মক্কার সিরিয়াগামী বাণিজ্য পুনরায় সচল করা এবং কুরাইশদের জন্য কিছু ছাড় দেওয়া মুহাম্মদ (সাঃ)-এর পরিকল্পিত পদক্ষেপ ছিল, যাতে সম্পর্কোন্নয়ন ঘটে এবং কুরাইশদের ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট করা যায়।[274]

রাজনৈতিক পরিস্থিতি

মুহাম্মাদের(সাঃ) সাথে যুদ্ধ আসন্ন বলে মনে হওয়ায় খায়বারের ইহুদিগণ ফাদাক মরুভূমির ইহুদিগণের সাথে একটি মৈত্রীবন্ধন বা জোট স্থাপন করে। এছাড়াও তারা বেদুঈন গাতাফান গোত্রকেও ফসলের অর্ধেক প্রদানের প্রতিশ্রুতি দিয়ে যুদ্ধে তাদের পক্ষে যোগ দেয়ার জন্য রাজি করিয়ে ফেলে। যাই হোক, উক্ত তিন শক্তির তুলনায় মুহাম্মাদের(সাঃ) সৈন্যবাহিনীকে খায়বারবাসীর মুকাবেলা করার জন্য সেরকম শক্তিশালী ও প্রস্তুত বলে মনে হচ্ছিল না। মুহাম্মাদের(সাঃ) সেনাবাহিনী ছোট জানতে পেরে তারা আসন্ন যুদ্ধে প্রতিরক্ষার জন্য সাংগঠনিক প্রস্তুতি নেয়া প্রায় বন্ধই করে দিল, তাছাড়া তাদের পরিবারগুলোর মধ্যে চলমান পূর্ববর্তী ঝগড়া তাদেরকে তাদেরকে পূর্বের মতই বিশৃঙ্খল করে রাখল।[275] বনু গাতাফানের সাথে সংশ্লিষ্ট গোত্র বনু ফাজারাও

271 Donner 1979, পৃ. 242–244.

272 Donner 1979, পৃ. 245.

273 Watt 1956, পৃ. 48–49.

274 Watt 1956, পৃ. 49.

275 Veccia Vaglieri, L. "Khaybar", Encyclopaedia of Islam.

মুসলিমদের সাথে সন্ধি স্থাপনে ব্যর্থ হওয়ার পর খায়বারবাসীকে যুদ্ধে সহায়তা প্রদানের প্রস্তাব করে।[276]

বনু গাতাফান গোত্রের ব্যর্থতা

যুদ্ধ চলাকালে, মুসলিমগণ গাতাফান গোত্রকে খায়বারবাসীর সহায়তায় ৪০০০ সেনা প্রদান করার গৃহীত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন থেকে বিরত রাখতে সক্ষম হয়। এর একটি কারণ হিসেবে মনে করা হয় যে, মুসলিমগণ ইহুদিদের বেদুঈন মিত্রদের অর্থ দিয়ে কিনে ফেলতে সক্ষম হয়েছিলেন। পাশাপাশি ওয়াট আরও দাবি করেন যে, গাতাফানদের দুর্গে মুসলিমদের হামলা করার গুজবও এক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা রেখেছে।[277][278] তাবারির মতে, খায়বার যুদ্ধে মুহাম্মাদ(সাঃ) আল রাযী উপত্যকায় প্রথম যাত্রাবিরতি করেন। টানা এক দিন সফরের পর গাতাফানের লোকেরা মুসলিম বাহিনীর আগমন টের পায় এবং নিজ পরিবার ও সম্পদ রক্ষা করার জন্য খায়বারবাসীকে সাহায্যের সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করে, যা মুহাম্মাদের(সাঃ) সেনাবাহিনীর বিজয়ের পথকে আরও প্রশস্ত করে দেয়। [279] আরেকটি বর্ণনা প্রচলিত আছে যে, একটি রহস্যময় কণ্ঠ গাতাফান গোত্রকে বিপদ সম্পর্কে সতর্ক করে তাদেরকে নিজ নিজ ঘরে ফিরে যাওয়ার জন্য প্রভাবিত করে।[280]

যুদ্ধের ক্রমোন্নতি

৭ম হিজরীর মুহাররম মাসে, অর্থাৎ ৬২৮ খ্রিষ্টাব্দের মে মাসে মুসলিমগণ খাইবার যুদ্ধের জন্য রওয়ানা হয়।[281] বিভিন্ন সূত্র অনুযায়ী, সে সময় মুসলিম বাহিনীর সদস্য সংখ্যা ছিল আনুমানিক ১৪০০ থেকে ১৮০০ জন এবং সাথে ঘোড়া ছিল ১০০ থেকে ২০০ টি। উম্মে সালামা(রাঃ) সহ বেশ কিছু মুসলিম মহিলা আহত সৈন্যদের দেখাশুনা করার

---

276 Nomani (1979), vol. II, pg. 159.

277 Stillman 18.

278 Watt (1956), pg. 93.

279 al-Tabari (১৯৯৭)। The History of al-Tabari: The Victory of Islam। Albany : State University Of New York। পৃষ্ঠা 116.

280 P. Bearman, Th. Bianquis, C.E. Bosworth, E. van Donzel, W.P. Heinrichs, Editors। "Khaybar"। Encyclopaedia of Islam, Second Edition। Brill Online.

281 Watt 1956, pg. 341.

জন্য যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন।[282] খায়বারের ১০০০০ সৈন্যের তুলনায় মুসলিম সেনাবাহিনীর সদস্য সংখ্যা ছিল নগণ্য, কিন্তু এই নগণ্য সদস্য সংখ্যাই মুসলিমদের সুবিধা করে দিয়েছিল। স্বল্প সংখ্যক হওয়ার কারণেই মুসলিমগণ নীরবে ও দ্রুতবেগে খায়বারের দিকে মাত্র তিনদিনের মধ্যে অগ্রসর হয়ে আকস্মিকভাবে নগরীতে প্রবেশ করতে পেরেছিল।[283] এছাড়া বৃহৎসংখ্যক সৈন্য খাইবারবাসীকে অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাসী করে তুলেছিল।[284] ফলস্বরূপ, ইহুদিগণ কেন্দ্রীয়ভাবে সংগঠিত হয়ে মুসলিমদের প্রতিহত করতে ব্যর্থ হয়, এবং ইহুদি পরিবারগুলোর হাতে নিজ নিজ দুর্গ রক্ষা করার দায়িত্ব ছেড়ে দেয়।[285][286][287] খাইবারের ইহুদিগণ মুসলিমদের শক্তিকে ছোট করে দেখার কারণেই মুহাম্মাদের(সাঃ) পক্ষে আপেক্ষিক স্বচ্ছন্দে একটির পর একটি করে প্রতিটি দুর্গ জয় করা সহজ হয়ে গিয়েছিল, এবং সাথে খাদ্য, যুদ্ধাস্ত্র এবং পারিপার্শ্বিক জমিসমূহ দখলও।[288] আনাস ইবনে মালিক(রাঃ) বলেন:"আমরা খায়বারে পৌঁছে দেখতে পেলাম সকাল বেলা খাইবারের শ্রমিকরা কোদাল ও ঝুড়ি নিয়ে দিনের কাজে বেরুচ্ছিল। রাসূলুল্লাহ(সাঃ) ও তাঁর বাহিনিকে দেখে তারা সবিস্ময়ে বলে উঠলো, “সর্বনাশ! মুহাম্মাদ তার বাহিনীসহ হাজির হয়েছে দেখছি”- বলেই তারা পালিয়ে পেছনে ফিরে যেতে লাগলো। সে দৃশ্য দেখে রাসূলুল্লাহ বললেন, “আল্লাহু আকবার! খাইবারের পতন ঘটেছে। আমরা কোন জনপদে আগমন করলেই তার অধিবাসীর সকাল বেলাটা দুর্ভাগ্যময় হয়ে ওঠে।”[289]

কোন একটি দুর্গের সম্মুখে একটি উল্লেখযোগ্য রক্তক্ষয়ী দাঙ্গার পর ইহুদিগণ প্রকাশে লড়াই এড়িয়ে যায়। লড়াইয়ের অধিকাংশ অংশই অনেক দূর থেকে তির নিক্ষেপণের মাধ্যমে চালিয়ে যাওয়া হয়। প্রতিটি দুর্গেই মুসলিমগণ কমপক্ষে একবার করে আক্রমণ করে। অবরুদ্ধ ইহুদিদের দুর্গের প্রতিরোধ ক্ষমতা অপেক্ষাকৃত দুর্বল হওয়ার কারণে

---

282 Nomani (1979), vol. II, pg. 162.

283 Haykal, Muhammad Husayn. Ch. "The Campaign of Khaybar and Missions to Kings". The Life of Muhammad. Shorouk International, 1983.

284 Lings (1983), pg. 263.

285 Veccia Vaglieri, L. "Khaybar", Encyclopaedia of Islam.

286 Stillman 18.

287 Stillman 18.

288 al-Tabari (১৯৯৭)। The History of al-Tabari: The Victory of Islam। Albany : State University Of New York। পৃষ্ঠা 117.

289 Spencer, Robert (১৪ আগস্ট ২০০৬)। "'Khaybar, Khaybar, O Jews.'"। Human Events। **62** (27): p12–12.

তারা অন্ধকারের আশ্রয় নিয়ে দুর্গের লোকজনকে মালামালসহ এক দুর্গ থেকে আরেক দুর্গে সরিয়ে নেয়।[290]

ইহুদি এবং মুসলিমগণ কেহই এই দীর্ঘ সময়ের অবরোধের জন্য প্রস্তুত ছিল না, এবং এই অপরিণামদর্শিতার কারণে উভয় পক্ষই ক্ষতিগ্রস্ত হয়। প্রথমদিকে ইহুদিগণ তাদের লোকবল নিয়ে অতিমাত্রায় আত্মবিশ্বাসী হওয়ার কারণে একটি ক্ষুদ্র অবরোধের মধ্যে পরিমাণমত পানি সরবরাহ করতেও ব্যর্থ হয়।[291] অভিযানের শুরুর দিকে ক্ষুধার্ত মুসলিমগণ তাদের ক্ষুধা মেটাতে যুদ্ধের প্রয়োজনে নিয়ে আসা কিছু গাধা জবাই করতে বাধ্য হয়। পূর্বে মুহাম্মাদ(সাঃ) ঘোড়া, খচ্চর এবং গাধার গোশত খেতে নিষেধ করলেও উক্ত পরিস্থিতিতে একটি বতিক্রম নীতি প্রদান করেন যে, কোন পরিস্থিতিতে যদি কোন হালাল খাদ্য পাওয়া না যায় তবে জীবন বাঁচানোর তাগিদে কোন ব্যক্তির জন্য নিষিদ্ধ খাদ্যসমূহ খাওয়া বৈধ হবে।[292]

কামুস দুর্গের পতন

নাতাত ও শিক দুর্গ দখলের পর, অবশেষে কঠোরভাবে প্রহরায় পরিবেষ্টিত কামুস দুর্গ অবরোধ করা বাকি ছিল, যা মুসলিমগণ ১৩তম থেকে ১৯তম দিন পর্যন্ত অবরোধ করে রেখেছিলেন।[293]

উক্ত দুর্গ দখলের জন্য একাধিক একক দলে বিভক্ত হয়ে মুসলিমদের বেশ কিছু উদ্যোগ ব্যর্থ হয়।[294] নবী মুহাম্মাদ(সাঃ) দুর্গটি অধিকার করার জন্য সর্বপ্রথম আবু বকর সিদ্দীককে(রাঃ) পতাকা দিয়ে পাঠালেন। তিনি যুদ্ধ করলেন। অনেক চেষ্টা করেও তিনি দুর্গ জয় করতে না পেরে ফিরে এলেন। পরদিন উমার ইবনুল খাত্তাবকে(রাঃ) পাঠালেন। তিনিও তুমুল যুদ্ধ করলেন। কিন্তু অকৃতকার্য হয়ে ফিরে এলেন। তখন মুহাম্মাদ(সাঃ) বললেন, “কাল সকালে আমি এমন একজনকে পতাকা দেবো যিনি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে ভালোবাসেন। আল্লাহ তার হাতেই দুর্গ জয় করাবেন।[295] তিনি যুদ্ধের ময়দান থেকে কখনো পালাবার মত লোক না।” নবী

---

290 Veccia Vaglieri, L. "Khaybar", Encyclopaedia of Islam.

291 Watt (1956), pg. 219.

292 P. Bearman, Th. Bianquis, C.E. Bosworth, E. van Donzel, W.P. Heinrichs, Editors। "Khaybar"। Encyclopaedia of Islam, Second Edition। Brill Online.

293 al-Tabari (১৯৯৭)। *The History of al-Tabari: The Victory of Islam*। Albany : State University Of New York। পৃষ্ঠা 117.

294 Watt (1956), pg. 218.

295 "Sahih Bukhari"

মুহাম্মাদ(সাঃ) আলী ইবনে আবি তালিবকে(রাঃ) ডাকলেন।[296] তিনি তখন চোখের রোগে ভুগছিলেন। মুহাম্মাদ(সাঃ) তার চোখে থু থু দিলেন এবং বললেন, “এই পতাকা নিয়ে এগিয়ে যাও। আল্লাহ যতক্ষণ তোমার হাতে বিজয় না দেন ততক্ষণ লড়াই করে যাও।” এরপর তিনি এগিয়ে গেলেন। তিনি ছিলেন প্রচন্ড বলবীর্যবান ও পরাক্রমশালী। তিনি শুধু হেলেদুলে পায়তারা দিয়ে ছুটে বেড়াচ্ছিলেন। তিনি কিল্লার নিচে একটা পাথর স্তুপের মধ্যে পতাকা স্থাপন করলেন। ওপর থেকে একজন ইয়াহুদী তাকে দেখে জিজ্ঞেস করলো, “তুমি কে?” তিনি বললেন, “আমি আবু তালিবের পুত্র আলী।” ইয়াহুদী বললো “তাওরাতের শপথ! তোমরা বিজয়ী হয়েছো।” তিনি দুর্গের নিকট পৌঁছুলে ইহুদি সেনাদল দুর্গ থেকে বেরিয়ে এলো এবং যুদ্ধ শুরু হল। যুদ্ধ চলাকালে এক ইহুদির ধাক্কায় আলী(রাঃ) তার ঢাল হারিয়ে ফেলেন। বিকল্প হিসেবে নিজেকে রক্ষা করার জন্য তিনি দেয়াল থেকে একটি দরজা তুলে নেন। বলা হয়ে থাকে, দরজাটি এতোই ভারি ছিল যে পুনরায় একে এর কব্জায় বসানোর জন্য আটজন লোককে মিলে এটিকে তুলতে হয়েছিল।[297] কিছু শিয়া সূত্র আরও দাবি করে যে, "দুর্গ ভেঙ্গে ফেলার সময় এসে পরলে আলী(রাঃ) দরজাটিকে এমনভাবে ছুঁড়ে ফেলেন যার ফলে তা দুর্গের দেয়ালের উপর একটি সেতুর আকার নেয় এবং সৈন্যরা এর উপর দিয়ে গিয়ে দুর্গের ভিতরে প্রবেশ করার সুযোগ পায়।" এভাবে যুদ্ধের এক পর্যায়ে মুসলিমদের বিজয় অর্জিত হয়। নবী মুহাম্মাদ(সাঃ) আলীকে(রাঃ) উদাহরণ হিসেবে উপস্থাপন করে তার অনুসারী সাহাবীদের বিশ্বাসকে জাগিয়ে তুললেন এবং আলীকে(রাঃ) আসাদুল্লাহ বা আল্লাহর সিংহ উপাধিতে ভূষিত করলেন।[298]

ইহুদিগণ আত্মসমর্পণের শর্তসমূহ আলোচনা করার জন্য তড়িৎ মুহাম্মাদের(সাঃ) সাথে সাক্ষাৎ করল।[299] আল ওয়াতি এবং এবং আল সুলাইম গোত্রের লোকেরা মুসলিমদের কাছে এই শর্তে আত্মসমর্পণ করল যে তাদের প্রতি সদয় আচরণ করা হবে এবং মুসলিমগণ তাদের রক্তপাত করা থেকে বিরত থাকবে। মুহাম্মাদ(সাঃ) উক্ত শর্তসমূহ

---

296 al-Tabari (১৯৯৭)। The History of al-Tabari: The Victory of Islam। Albany : State University Of New York। পৃষ্ঠা 119–121.

297 P. Bearman, Th. Bianquis, C.E. Bosworth, E. van Donzel, W.P. Heinrichs, Editors। "Khaybar"। Encyclopaedia of Islam, Second Edition। Brill Online.

298 Gibbon, D&F of Roman Empire Vol V. page 365.

299 Watt (1956), pg. 218.

মেনে নিলেন এবং উক্ত দুই দুর্গ থেকে কোন মালামাল ও সম্পদ অধিগ্রহণ করলেন না।[300]

মারহাবকে হত্যা

ঐতিহাসিকগণ ইহুদি পালওয়ান মারহাবকে হত্যার ঘটনা সম্পর্কে বিভিন্নরকম বর্ণনা দিয়েছেন।[301][302][303] কিছু উৎসে বলা হয়েছে যে কামুস দুর্গের অভিযানের সময় অথবা নাইম দুর্গ দখলের সময় আলী ইবনে আবি তালিব(রাঃ) মারহাবকে হত্যা করেন। অপরদিকে ইবনে হিশাম রচিত মুহাম্মাদের(সাঃ) জীবনী সহ আরও কিছু উৎসে বলা হয়েছে যে, সাহাবী মুহাম্মাদ ইবনে মাসলামা নবী মুহাম্মাদের(সাঃ) নির্দেশে মারহাবকে হত্যা করেন এবং তা কামুস দুর্গ দখলের ঘটনার পূর্বেই সঙ্ঘটিত হয়।[304]

আলীর(রাঃ) সাথে সম্পর্কিত বহুল প্রচলিত বর্ণনাটি নিম্নরূপ:

আলী(রাঃ) কামুসের দরজায় এসে পৌঁছুলে ইহুদিদের অন্যতম দলপ্রধান এবং অভিজ্ঞ যোদ্ধা মারহাব তার সাথে দেখা করল। মারহাব বলে উঠলো: "খায়বার খুব ভাল করেই জানে যে আমি মারহাব, যার অস্ত্র ক্ষুরধার ও যুদ্ধের জন্য পরিক্ষিত। কখনো আমি বর্শা দ্বারা বিদ্ধ করি, কখনোবা তরবারি দ্বারা আঘাত করি, যখন আমার অগ্নিসম ক্রোধ সিংহের মত খেপে ওঠে।"[305]

উভয় যোদ্ধাই একে অপরকে আঘাত করলেন। দ্বিতীয় আঘাতের পর আলী(রাঃ) তরবারি দিয়ে মারহাবের মস্তকবর্ম দু'টুকরো করে মাথা চিরে ফেললেন, এবং তার তরবারি মারহাবের দাঁতে গিয়ে ঠেকল। [306]

---

300 Ibn Hisham. Al-Sira al-Nabawiyya (The Life of Muhammad). English translation in Guillame (1955), pp. 145–146.

301 Bukhari, Chap. Ghazwah Khaybar, Muslim, Naza'i. 3. The encounter between 'Ali and marhabah has been reported by different persons – some say they fought for the fort of Na'im while other relate it connextion with the forth of Qamus. Bukhari has given different portions of the story but has not mentioned the name forth. Ibn Hisham relates that Marhab killed by Muhammad B. Maslama but report in the Sahi Muslim mentions 'Ali while some verse by 'Ali leave no doubt that he fought and killed Marhab. (Musli, Kitab-ul-Jihad, tradition No. 1807).

302 "The Conquest of Khyber"। al-islam.org.

303 "The Battle of Khaybar"। a2youth.com.

304 Harun, Abdus Salam. M.। English Translation of Sirat Ibn Hisham। Al-Falah Foundation.

305 al-Tabari (১৯৯৭)। The History of al-Tabari: The Victory of Islam। Albany : State University Of New York। পৃষ্ঠা 120.

306 al-Tabari (১৯৯৭)। The History of al-Tabari: The Victory of Islam। Albany : State University Of New York। পৃষ্ঠা 121.

সহিহ মুসলিমেও উক্ত বর্ণনাটির উল্লেখ রয়েছে এভাবে: রাসুলুল্লাহ আলীর হাতে পতাকা দিলেন। এবারো মুরাহহাব (মারহাব) বেরিয়ে এল এবং কবিতা আওড়াতে লাগল " খায়বার জানে যে, আমি মুরাহহাব, যুদ্ধের অস্ত্রে সজ্জিত এক অভিজ্ঞতাপূর্ণ বীর বাহাদুর ব্যক্তি। যখন যুদ্ধ তাঁর লেলিহান শিখা নিয়ে অগ্রসর হয়, তখন আলী বললেন, "আমি সে ব্যক্তি যাকে আমার মা 'হায়দার' (সিংহ) নাম রেখেছেন, যার দর্শন বন্য সিংহের মত ভয়ঙ্কর। আমি তাদের (দুশমনদের) প্রতিদান দেই বড় বড় পাত্র দিয়ে (অর্থাৎ তাদের অবলীলায়) হত্যা করি"। এরপর তিনি মুরাহহাবের মাথায় তলোয়ার মারলেন এবং তাকে হত্যা করলেন।[307]

ইবনে হিশামের সিরাত থেকে প্রাপ্ত মুহাম্মাদ ইবনে মাসলামা সম্পর্কিত বর্ণনাটি নিম্নরূপ: "এক এক করে খাইবারের কিল্লাগুলো এবং তাদের ধনসম্পদ রাসূলুল্লাহ(সাঃ) -এর হস্তগত হচ্ছিল। কেবল ওয়াতীহ ও সুলালিম নামক কিল্লা দুটি দখল করা তখনও বাকী ছিল। সবশেষে তিনি এ দুটি কিল্লা জয় করেন। এ দুটিকে তিনি দশদিনের অধিক সময় ধরে অবরোধ করে রাখেন।

ইয়াহুদ নেতা মরারহাব অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ করে মুহাম্মাদের(সাঃ) মুকাবিলায় এগিয়ে এসে একটি রণোদ্দীপক কবিতা আবৃত্তি করতে লাগলো। কবিতাটি হলোঃ

"সমগ্র খাইবার জানে যে, আমি মারহাব। (অর্থাৎ খুব প্রতাপশালী)
অস্ত্র দিয়ে আঘঅত করতে পারদর্শী, অভিজ্ঞ ও বহুদর্শী বীর।
কখনো এফোঁড় ওফোঁড় করে দিই আবার কখনো শক্ত আঘাত করি।
শার্দুলেরা যখন ক্রুদ্ধ হয়ে ধেয়ে আসে তখন আমার ধারে কাছেও
কেউ ঘেঁষতে পারে না।"

সে চ্যালেঞ্জ করলো,, "এসো আমার সাথে দ্বন্দ্বযুদ্ধ করতে কে প্রস্তুত আছ?" কা'ব ইবনে মালিক রণসংগীত আবৃত্তি করেই তার জবাবে বললেন,

"খাইবার জানে যে আমি কা'ব। আমি দুঃখ দুর্দশা ঘুচাই, সাহসী ও অনমনীয়।
যখন যুদ্ধ বেঁধে যায় তখন যুদ্ধের পর যুদ্ধই চলতে থাকে।
আমার আছে বিজলীর আলোকচ্ছটার মত ধারালো তরবারীটা।
আমরা তোমাদেরকে পদদলিত করবো যাতে সব জটিলতার অবসান ঘটে।
এতে আমরা পুরস্কৃত হবো অথবা আমাদের কাছে
প্রচুর যুদ্ধলব্ধ সম্পদ চলে আসবে! (সে সম্পদ আসবে) বজ্রমুষ্ঠির আঘাতে

307 Sahih Muslim, Book #019, Hadith #4450.

এবং তাতে কোন তিরস্কারের অবকাশ থাকবে না।"

মুহাম্মাদ(সাঃ) বললেন, "এই লোকটির সাথে কে লড়তে প্রস্তুত আছে?" মুহাম্মাদ ইবনে মাসলামা বললেন, "ইয়া রাসূলাল্লাহ(সাঃ), আমি তার সাথে লড়তে প্রস্তুত আছি। আল্লাহর কসম, আমি ভীষণ লড়াকু। আমি ওর থেকে স্বজন হত্যার প্রতিশোধ নিতে চাই। গতকাল সে আমার ভাইকে (মাহমুদ ইবনে মাসলামা) হত্যা করেছে।" মুহাম্মাদ(সাঃ) বললেন "যাও। হে আল্লাহ, মারহাবকে পর্যুদস্ত করতে ওকে সাহায্য কর।" অতঃপর মুহাম্মদ ইবনে মাসলামা ও মারহাবকে মধ্যে তুমুল যুদ্ধ শুরু হলো। একটি পুরনো বৃক্ষ তাদের মাঝখানে আড় হয়ে দাঁড়ালো। উভয়ে পালাক্রমে ঐ গাছের আড়ালে আশ্রয় নিতে লাগলো। এক সময় মারহাবের তরবারী মুহাম্মাদ ইবনে মাসলামার ঢালে আটকে গেল। তৎক্ষণাৎ মুহাম্মাদ ইবনে মাসলামা তরবারীর আঘাতে মরহাবকে হত্যা করলেন।[308]

যদিও, এ বিষয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে কোন সন্দেহ নেই যে, মুহাম্মাদ বিন মাসলামা(রাঃ)ও খায়বারের যুদ্ধে সাহসিকতার সাথে যুদ্ধ করেন এবং বেশ কিছু প্রসিদ্ধ ইহুদি নেতাকে হত্যা করেন।[309]

ফলাফল

নবী মুহাম্মাদ (সাঃ) খাইবারবাসীকে তাদের দুই দুর্গ ওয়াতীহ ও সুলালিমে অবরোধ করলেন। যখন তারা নিশ্চিতভাবে বুঝলো যে মৃত্যু ছাড়া আর কোন উপায় নেই তখন তারা তার কাছে প্রাণভিক্ষা চাইল এবং খাইবার থেকে তাদেরকে বহিস্কার করার প্রস্তাব দিল। নবী মুহাম্মাদ (সাঃ) এ প্রস্তাব মেনে নিলেন ও প্রাণভিক্ষা দিলেন। ইতঃপূর্বেই তিনি তাদের আশঙ্কা আন্ নাতাহাহ ও আল কুতাইবার ভূমিসহ সমস্ত স্থাবর অস্থঅবর সম্পদ এবং ঐ দুটি দুর্গ ছাড়া সকল দুর্গ অধিকার করে নিয়েছিলেন। ফদাকবাসী যারা যুদ্ধের সময় খায়বারের মিত্র ছিল, তারা সমস্ত খবর জানতে পারলো। তারা মুহাম্মাদ(সাঃ) কে তাদের প্রাণভিক্ষা দিয়ে বিতাড়িত করণ এবং জমিজমা ও ধনসম্পদ

---

308 Harun, Abdus Salam. M.। English Translation of Sirat Ibn Hisham। Al-Falah Foundation.

309 Bukhari, Chap. Ghazwah Khaybar, Muslim, Naza'i. 3. The encounter between 'Ali and marhabah has been reported by different persons – some say they fought for the fort of Na'im while other relate it connextion with the forth of Qamus. Bukhari has given different portions of the story but has not mentioned the name forth. Ibn Hisham relates that Marhab killed by Muhammad B. Maslama but report in the Sahi Muslim mentions 'Ali while some verse by 'Ali leave no doubt that he fought and killed Marhab. (Musli, Kitab-ul-Jihad, tradition No. 1807).

হস্তগত করার অনুরোধ জানালো। মুহাম্মাদ(সাঃ) তাদের অনুরোধ গ্রহণ করলেন। ইয়াহুদীদের পক্ষ থেকে যারা এই অনুরোধ নিয়ে মুহাম্মাদ(সাঃ) এর নিকট গিয়েছিল তাদের মধ্যে মুহাইসা ইবনে মাসউদ ছিলো অন্যতম। সে ছিল বনু হারেসার লোক। খাইবারবসী এই ব্যবস্থা প্রথমে মেনে নেয়। কিন্তু পরে অনুরোধ করে যে আমাদেরকে বহিস্কার না করে অর্ধেক বর্গাভাগের ভিত্তিতে জমি চাষের কাজে নিয়োজিত করুন। তারা যুক্তি দেখাতে গিয়ে বলে যে এখানকার জমিজমা আমরাই ভাল আবাদ করতে সক্ষম এবং এ কাজে আমরাই সবচেয়ে অভিজ্ঞ ও পারদর্শী। মুহাম্মাদ(সাঃ) এ প্রস্তাব মঞ্জুর করে তাদের সাথে আপোষরফা করলেন। তবে শর্ত আরোপ করলেন যে, আমরা ইচ্ছা করলেই তোমাদেরকে উচ্ছেদ করার অধিকার আমাদের থাকবে। ফাদাকবাসীও এই শর্তে তার সাথে আপোস করলো। এভাবে খায়বারবাসীর ন্যায় ফাদাকবাসীদের সাথেও একটি সন্ধিচুক্তি করা হল এবং খাইবার মুসলামানদের যৌথ সম্পদ এবং ফাদাক মুহাম্মাদ(সাঃ) এর ব্যক্তিগত সম্পদে পরিণত হলো। কেননা ফাদাক জয় করতে সামরিক অভিযানের প্রয়োজন পড়েনি।[310]

'কামূস' দুর্গ বিজয়কালে মুহাম্মাদ(সাঃ) কিছুসংখ্যক ইয়াহুদীকে আটক করেন। তাদের মধ্যে হুয়াই ইবনে আখতাবের কন্যা সাফিয়া(রাঃ) অন্যতম। সে বনু নাদির গোত্রের কোষাধ্যক্ষ কিনানা ইবনে রাবীর স্ত্রী ছিল। তার দু'জন চাচাতো বোনও গ্রেফতার হয়। সাহাবীগণ নবীর কাছে সাফিয়াকে গ্রহণ করার অনুরোধ করলে মুহাম্মাদ সাফিয়াকে নিজের জন্য মনোনীত করেন এবং তাঁকে দাসত্ব হতে মুক্তি দিয়ে নিজের স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করেন।[311] দাহইয়া ইবন খালীফা কালবী মুহাম্মাদ(সাঃ) নিকট সাফিয়াকে চেয়েছিলেন। তিনি সাফিয়াকে(রাঃ) নিজের জন্য গ্রহণ করে নিয়েছিলেন বলে দাহইয়াকে তার চাচাতো বোনকে দিয়ে দেন। ক্রমে খাইবারের গ্রেফতারকৃত লোকদেরকে সাহাবীদের সকলের মধ্যে বণ্টন করা হয়।

কেনানা ইবনে রাবিকে প্রশ্ন করা হয় যে, মদিনা প্রস্থানের সময় তারা যে গুপ্ত সম্পদ নিয়ে গিয়েছিল তা কোথায় রেখেছে, তিনি উত্তরে ওই সম্পদের দাবি অস্বীকার করেন। তাকে বলা হল যে, যদি সেরকম কোন সম্পদ খুঁজে পাওয়া যায়, তবে মিথ্যে দাবির শাস্তিস্বরূপ তাকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হবে। কেনানা তাতে রাজি হলেন। এরপর কোন এক

310 Ibn Hisham. Al-Sira al-Nabawiyya (The Life of Muhammad). English translation in Guillame (1955), pp. 145–146.

311 Haykal (2008), p. 400.

সময় এক ইহুদি মুহাম্মাদ(সাঃ) কে বললেন যে, লা রাবিকে প্রতিদিন সকালে একটি নির্দিষ্ট স্থানে দেখা যেতো। যখন ওই স্থানটি খোঁড়া হল, তখন সেখানে ওই সম্পদের কিছু অংশ পাওয়া গেল। ফলশ্রুতিতে কেনানা মৃত্যুদণ্ড প্রাপ্ত হল।[312][313][314] শিবলী নোমানী এই বর্ণনাকে অস্বীকার করে দাবি করেন যে, কেনানাকে হত্যা করা হয়েছিল কারণ পূর্বে সে মুহাম্মাদ ইবনে মাসলামার ভাই মাহমুদ ইবনে মাসলামাকে হত্যা করেছিল।[315] কিন্তু আল ওয়াকিদির বর্ণনার সাথে নোমানীর এই দাবির পরস্পরবিরোধিতা খুঁজে পাওয়া যায়, যেখানে বলা হয় মারহাব নিজে নিহত হবার অল্প কিছুদিন আগে মাহমুদকে হত্যা করেছিলেন।[316]

আপোষরফার পর সাল্লাম ইবনে মুসকামের স্ত্রী যায়নাব বিনতে হারেস তাঁকে একটি ভুনা বকরী উপহার দিল। ভুনা ছাগলটি পাঠানোর আগে সে জিজ্ঞেস করে, "রাসূলুল্লাহ(সাঃ) বকরীর কোন্ অংশ খেতে বেশি পছন্দ করেন?" তাকে জানানো হলো যে, তিনি উরু বা রানের গোশত বেশি পছন্দ করেন। তখন সে উরুতে বেশি করে বিষ মিশিয়ে দেয়। অতঃপর পুরো ছাগলটিকে মুহাম্মাদ(সাঃ) এর নিকট নিয়ে আসে। তা থেকে মুহাম্মাদ এক টুকরো গোশত চিবালেন কিন্তু গিললেন না। সাহাবী বিশর ইবনে বারা ইবনে মা'রুরও তাঁর সাথে বসে খাচ্ছিলেন। বিশরও এক টুকরো গোশত মুখে নিয়ে চিবালেন। তিনি গেলে ফেললেন। কিন্তু মুহাম্মাদ(সাঃ) উগরিয়ে ফেলে দিলেন। তিনি বললেন, "এই হড্ডিটা আমাকে জানিয়ে দিচ্ছে যে, তা বিষাক্ত।" অতঃপর তিনি মহিলাকে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন। সে স্বীকারোক্তি করলো। তিনি তাকে জিজ্ঞেস করলেন, "এমন কাজ কেন করলে?" সে বললো, "আপনি আমার কওমের সাথে কি আচরণ করেছেন তা আপনার জানা আছে। আমি ভাবলাম আপনাকে এভাবে বিষ খাওয়াবো। আপনি যদি কোন রাজা-বাদশাহ হয়ে থাকেন তাহলে আপনার হাত থেকে উদ্ধার পাবো আর যদি নবী হয়ে থাকেন হাহলে তো আপনাকে (আল্লাহর তরফ থেকে) সাবধান করে দেয় হবে।" এ কথা শুনে মুহাম্মাদ(সাঃ) তাকে মাফ করে দিলেন। কিন্তু

312 Haykal (2008), p. 400.

313 Ibn Ishaq, Guillaume, p. 515.

314 Muhammad ibn Umar al-Waqidi. Kitab al-Maghazi. Translated by Faizer, R., Ismail, A., & Tayob, A. (2011). The Life of Muhammad, pp. 330-331. Oxford & New York: Routledge.

315 Nomani (1979), vol. II.

316 Waqidi/Faizer pp. 317, 323-324, 344.

বিশর যে টুকরাটি খেয়েছিলেন তাতেই তিনি মারা গেলেন।[317][318] খাইবার বিজয় সম্পন্ন করার পর মুহাম্মাদ(সাঃ) ওয়াদিউল কুরাতে চলে গেলেন। সেখানকার অধিবাসীদের কয়েকদিন অবরোধ করে রাখেলেন, অতঃপর মদীনা চলে গেলেন।

খায়বার বিজয়ের কারণে সাহাবীগণ এবং স্থানীয় বেদুঈন গোত্রগুলোর কাছে মুহাম্মাদের(সাঃ) মর্যাদা অনেক বেড়ে যায়। স্থানীয় বেদুঈনগণ মুহাম্মাদের(সাঃ) ক্ষমতা অনুধাবন করে তার আনুগত্য স্বীকার করে এবং ইসলাম ধর্মে ধর্মান্তরিত হয়। খায়বার যুদ্ধের যুদ্ধলব্ধ মালামাল এবং অস্ত্রসমূহ তার সেনাবাহিনীকে আরও শক্তিশালী করে, এবং খায়বার বিজয়ের মাত্র ১৮ মাস পরেই মুহাম্মাদ(সাঃ) মক্কা দখল করতে সক্ষম হন।[319][320]



[321]

চিত্রঃ খায়বারের আটটি ইহুদি উপজাতি কনফেডারেশন দুর্গের মধ্যে একটি, কামুস দুর্গ

317 Ibn Ishaq/Guillaume, pp. 515-516.

318 Ibn Saad/Haq, pp. 133, 143-144, 251-252.

319 Veccia Vaglieri, L. "Khaybar", Encyclopaedia of Islam.

320 Stillman 18.

321 https://en.wikipedia.org/wiki/Battle_of_Khaybar

এক নজরে খায়বার যুদ্ধ

বিবাদমান পক্ষ	
মুসলিম সেনাবাহিনী	খায়বার মরুভূমির ইহুদিগণ
সেনাধিপতি ও নেতৃত্ব প্রদানকারী	
মুহাম্মাদ(সাঃ) আলী ইবনে আবি তালিব(রাঃ)	আল-হারিস ইবনে আবু জয়নব মারহাব ইবনে আবু জয়নব
শক্তি	
১,৬০০	খায়বার ১০,০০০ বনু গাফতান ৪,০০০
হতাহত ও ক্ষয়ক্ষতি	
২০ জনের কম নিহত হন ৫০ আহত	৯৩ জন নিহত

[322]

মক্কা বিজয়

বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) খ্রিস্টীয় ৬৩০ অব্দে রক্তপাতহীনভাবে মক্কা নগরী জয় করেন। ইতিহাসে এই ঘটনা **মক্কা বিজয়** (আরবি: فتح مكة *fatḥ makkah*) নামে খ্যাত।[323] ঐতিহাসিকদের মতে মক্কা বিজয় ইসলামের ইতিহাসে সর্বশ্রেষ্ঠ বিজয়। এই

322 https://en.wikipedia.org/wiki/Battle_of_Khaybar

323 Muhammad: Islam's First Great General, by Richard A. Gabriel, p176.

বিজয়ের ফলে মুসলমানদের পক্ষে আরবের অন্যান্য এলাকা বিজয় করা সহজসাধ্য হয়ে পড়ে।

হুদাইবিয়ার সন্ধি মোতাবেক সন্ধির পরবর্তী বছর মুহাম্মাদ(সাঃ) ২০০০ সাহাবা নিয়ে মক্কায় উমরাতুল ক্বাযা পালন করতে আসেন এবং এ সময়ই তিনি মক্কার কুরাইশদের মধ্যে নেতৃত্বের শুন্যতা লক্ষ্য করেন। তাদের ক্ষাত্রশক্তির সঠিক পরিমাপ করতে পেরেছিলেন তিনি এবং এজন্যই অধীর ছিলেন মক্কা বিজয়ের জন্য। এর এক বছরের মাথায়ই তিনি তা সম্পন্ন করার জন্য মনস্থির করেন।

আল কুরআনে হুদাইবিয়ার সন্ধিকে প্রকাশ্য বিজয় বলে উল্লেখ করা হয়েছে। হুদাইবিয়ার সন্ধি এবং **মক্কা বিজয়** দুটিই মুহাম্মাদ (সাঃ) অতুলনীয় দূরদর্শীতার ফল। হুদাইবিয়ার সন্ধির মাধ্যমে যে বিজয়ের সূত্রপাত হয়েছিল তার চূড়ান্ত রূপই ছিল মক্কা বিজয়।

হুদাইবিয়ার সন্ধি রদ

হুদাইবিয়ার সন্ধির অল্প কিছুদিন পরেই ইসলাম ব্যাপক হারে প্রসারিত হতে শুরু করে যা কুরাইশদের শঙ্কিত করে তোলে। তারা দেখতে পায় এভাবে চলতে থাকলে মক্কার দক্ষিণাঞ্চলের গোত্রগুলো অচিরেই ইসলাম গ্রহণ করবে। তাই তারা তায়েফের সাকীফ গোত্র এবং হুনায়নের হাওয়াজিন গোত্রদ্বয়ের সাথে জোটবদ্ধ হয়ে মদীনা আক্রমণের পরিকল্পনা করে। কিন্তু ১০ বছরের এই চুক্তির কারণে তারা আক্রমণ করতে পারছিলনা। তাই তারা প্রথমে চুক্তি বাতিলের ষড়যন্ত্র শুরু করে।

সন্ধির চুক্তিমতে বনু বকর গোত্র কুরাইশদের সাথে এবং বনু খুযাআ গোত্র মদীনার ইসলামী সরকারের সাথে মৈত্রীসূত্রে আবদ্ধ হয়েছিল। এই দুটি গোত্রের মধ্যে অনেক আগে থেকেই শত্রুতা চলে আসছিলো। এর কারণ অনেকটা এরকম। ইসলামের আবির্ভাবের পূর্বে বনু হাদরামি গোত্রের জনৈক এক ব্যক্তি বসবাসের উদ্দেশ্যে খুযাআ গোত্রের এলাকা দিয়ে যাওয়ার সময় খুযাআ গোত্রের লোকেরা তাকে হত্যা করে। এরপর বনু বকরের লোকেরা খুযাআ গোত্রের এক ব্যক্তিকে হত্যা করে। এর প্রতিশোধ নেয়ার জন্য আবার খুযাআ গোত্রের লোকেরা বনুবকরের একাংশ বনু দায়েলের সরদার *আসওয়াদের* তিন সন্তান *সালমা, কুলসুম ও যুবাইরকে* হারাম শরীফের সীমানার কাছে হত্যা করে। তখন থেকেই বনু দায়েল তথা সমগ্র বনু বকরের সাথে বানু খুযাআর বিরোধ চরে আসছিলো যা ইসলামের আবির্ভাবের ফলে অনেকটা স্তিমিত হয়ে যায়। কিন্তু হুদাইবিয়ার সন্ধির পর আবার বনু বকর সুযোগ খুঁজতে থাকে।

এরই জের ধরে একদিন বুন দায়েল পরিবারের প্রধান *নাওফেল ইবনে মুয়াবিয়া* বনু খুযাআ গোত্রের *মুনাব্বিহ* নামক এক ব্যক্তিকে *ওয়াতির* নামক জলাশয়ের নিকট ঘুমন্ত অবস্থায় হত্যা করে। এতে পূর্ব শত্রুতা আবার মাথাচাড়া দিয়ে উঠে এবং দুই গোত্রে তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ হয়। কুরাইশরা সন্ধি বাতিলের জন্য একে একটি সুযোগ হিসেবে গ্রহণ করে এবং এই যুদ্ধে বনু বকরকে অস্ত্র সাহায্য দেয়। তারা ভেবেছিলো বিস্তারিত তথ্য হযরত মুহাম্মাদ সঃ কাছে পৌছাবেনা; তাই তারা রাতের অন্ধকারে বনু বকরের পক্ষে যুদ্ধেও অবতীর্ণ হয়। খুযাআ গোত্রের উপর রাতের অন্ধকারে নিরস্ত্র অবস্থায় আক্রমণ করা হয় এবং নিরুপায় হয়ে তারা হারাম শরীফে আশ্রয় গ্রহণ করে। খুযাআর লোকেরা বলে যে তারা হারাম শরীফে প্রবেশ করেছে যেখানে রক্তপাত নিষিদ্ধ। কিন্তু নাওফেল সবকিছু অমান্য করে এবং কুরাইশ ও বনু বকরকে নিয়ে হারাম শরীফের অভ্যন্তরে ঝাপিয়ে পড়ে খুযাআ গোত্রের প্রচুর লোককে হত্যা করে। এটি ছিল হুদায়বিয়ার চুক্তির সুস্পষ্ট লঙ্ঘন।

এই ঘটনার পর খুযাআ গোত্রের *আমর ইবনে সালিম* এবং বনু কা'ব গোত্রের এক ব্যক্তিসহ মোট ৪০ জন উষ্ট্রারোহীকে নিয়ে মুহাম্মদ(সাঃ) এর কাছে এসে সব ঘটনা বিবৃত করে এবং তার সাহায্যের জন্য আবেদন করে। মুহাম্মদ(সাঃ) তাদেরকে সাহায্য করা হবে বলে আশ্বাস দেন এবং তখনই মক্কা বিজয়ের ব্যাপারে মনস্থির করেন। খুযাআর লোকেরা তখন মক্কায় ফিরে যায়। এর পরপরই মুহাম্মাদ(সাঃ) এই হত্যাকান্ডের কঠোর প্রতিবাদ জানিয়ে এবং তিনটি শর্তারোপ করে কুরাইশদের কাছে একজন দূত প্রেরণ করেন। কথা ছিলো এই শর্তত্রয়ের যেকোন একটি মেনে নিতে হবে। শর্তত্রয় ছিল:

- খুযাআ গোত্রের নিহতদের রক্তপণ শোধ করতে হবে। অথবা
- কুরাইশদের কর্তৃক বনু বকরের সাথে তাদের মৈত্রীচুক্তি বাতিল ঘোষণা করতে হবে। অথবা
- এ ঘোষণা দিতে হবে যে, হুদাইবিয়ার সন্ধি বাতিল করা হয়েছে এবং কুরাইশরা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত।

কুরাইশদের পক্ষ হতে *কারতা বিন উমর* তৃতীয় শর্তটি গ্রহণ করে। পরবর্তীকালে তারা অবশ্য এর জন্য অনুতপ্ত হয়েছিল। ফলস্বরূপ, ঐতিহাসিক হুদাইবিয়ার সন্ধি রদ হয়ে যায়।

সন্ধি নবায়নের প্রচেষ্টা

প্রকৃতপক্ষে সন্ধিচুক্তি অগ্রাহ্য করে বনু বকরকে সহযোগিতা করাটা ছিল প্রচন্ড অন্যায় আর চুক্তি বাতিলের সিদ্ধান্তটিও যে তদনুরুপ অন্যায় ও নির্বুদ্ধিতার পরিচায়ক হয়েছে কুরাইশ নেতারা তা অচিরেই উপলব্ধি করতে শুরু করে। তাই তারা চুক্তি নবায়নের জন্য শীঘ্রই তাদের অন্যতম নেতা আবু সুফিয়ানকে মদীনায় প্রেরণ করে। আবু সুফিয়ান কাজটি সহজে আদায় করে নেয়ার লক্ষ্যে প্রথমেই তার কন্যা উম্মে হাবীবার(রাঃ) গৃহে যায়। উল্লেখ্য উম্মে হাবীবা(রাঃ) ছিল হযরত মুহাম্মদ(সাঃ) সম্মানিত স্ত্রীদের একজন। কিন্তু হাবীবার(রাঃ) গৃহে যেয়ে আবু সুফিয়ান কোন সুবিধা করতে পারেননি; এমনকি উম্মে হাবীবা(রাঃ) তাকে বসতেও দেয়নি। কারণ হিসেবে উম্মে হাবীবা বলে যে তার গৃহের বিছানাটি আল্লাহর রাসূলের। পিতা হিসেবে আবু সুফিয়ান শ্রদ্ধেয় হলেও হযরত মুহাম্মদের(সাঃ) বিছানায় একজন নাপাক মুশরিক বসুক এটা সে চায়না। আবু সুফিয়ান এতে মনঃক্ষুণ্ণ হয়ে বেরিয়ে যায়। হযরত মুহাম্মদের(সাঃ) কাছে সে সন্ধি নবায়নের প্রস্তাব পেশ করলে হযরত মুহাম্মদ(সাঃ) কোন উত্তর দেননি। এরপর আবু সুফিয়ান একে একে আবু বকর(রাঃ), উমর(রাঃ) এবং সবশেষে হযরত আলীর কাছে যায়। আবু বকর(রাঃ) ও উমর(রাঃ) তাদের অপারগতার কথা প্রকাশ করেন এবং হযরত আলী(রাঃ) তামাশা করে বলেন যে আবু সুফিয়ান যেন কারো উত্তরের অপেক্ষা না করে মদীনার মসজীদে নববীতে তার প্রস্তাবের কথা ঘোষণা করে চলে যায়। উপায়ন্তর না দেখে আবু সুফিয়ান তা-ই করে এবং মক্কায় ফিরে যায়। সন্ধি নবায়নের সব প্রচেষ্টাই ব্যর্থ হয়। আর এদিকে মুহাম্মদ(সাঃ) মক্কা বিজয়ের জন্য অতি গোপনে প্রস্তুতি নেয়া শুরু করেন।

গোপন প্রস্তুতি

মক্কা অভিযানের পূর্বে মূতার যুদ্ধে যাবার প্রস্তুতির কথা প্রকাশিত হয়ে পড়ায় অনেক ক্ষতি হয়েছিল। তাই নবী মুহাম্মদ(সাঃ) মক্কা অভিযানের প্রস্তুতি সর্বোচ্চ গোপনীয়তার মাধ্যমে শুরু করেন। তিনি কাউকে বলেননি কোথায় অভিযানে বের হবেন। এমনকি তার ঘনিষ্ঠ সহচর আবু বকর বা তার স্ত্রীদেরকেও কিছু বলেননি। তবে একটি উপায়ে তা প্রায় প্রকাশিত হয়ে পড়েছিল। হাতিব ইবনে আবী বালতা নামক একজন সাহাবী, যিনি বদর যুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন, অনুমান করেন যে নবী মক্কা অভিমুখে যাবেন। তিনি অনুমানভিত্তিক এই সংবাদ একটি পত্রের মাধ্যমে কুরাইশদের জানানোর উদ্যোগ নেন এবং সারাহ নামক এক মহিলার মাধ্যমে তা মক্কা পাঠিয়ে দেন। কিন্তু ঐ মহিলা মক্কা পৌছানোর পূর্বেই নবী এই সংবাদ জেনে যান এবং তিনজন সাহাবীকে সেই পত্রটি

উদ্ধারের জন্য প্রেরণ করেন। এই তিনজন হলেন হযরত আলী(রাঃ), যুবায়ের(রাঃ) এবং মিকদাদ(রাঃ)। তারা মক্কা অভিমুখে রওযায়ে খাখ নামক স্থানে উক্ত মহিলার সন্ধান পান। প্রথমে অস্বীকার করলেও হুমকির, মুখে সে চিঠিটি দিয়ে দেয়। এটি মদীনায় আনার পর জানা যায় যে তা হাতিবের লিখা। প্রকৃতপক্ষে হাতিব ইসলামের প্রতি বিদ্বেষের বশে নয় বরং নির্বুদ্ধিতার কারণে কেবল কুরাইশদের সহানুভূতি আদায়ের জন্য এই পত্র লিখেছিলেন। তাই তাকে ক্ষমা করে দেয়া হয়।

মক্কা অভিমুখে যাত্রা ও শিবির স্থাপন

সম্পূর্ণ গোপনে মক্কা অভিযান শুরু হয়। বনু সুলাইম, বনু আশজা, বনু মুযায়না, বনু গিফার এবং বনু আসলাম গোত্রের অনেকেই প্রস্তুতি নিয়ে মদীনা থেকে মুহাম্মাদ(সাঃ) সাথে বের হয়। এই দলের সাথে খালীদ বিন ওয়ালিদ(রাঃ) ছিলেন। আবার অনেকেই পথিমধ্যে মিলিত হয়। এভাবে মুসলমানদের মোট সৈন্যসংখ্যা দাড়ায় ১০,০০০। মুসলিম বাহিনী ৮ম হিজরী সালের ১০ রমযান তারিখে মদীনা থেকে মক্কা অভিমুখে যাত্রা করে।[324] তখন মুসলমানদের সবাই রোযা রেখেছিল এবং কাদীদ নামক স্থানে কুদাইদ এবং উসফান নামক এলাকার মধ্যবর্তী একটি ঝর্ণার নিকট আসার পর তারা রোযা ভঙ্গ করেন। এরপর ঐ রমযানে আর কেউ রোযা রাখেনি। ১২ দিন চলার পর মুসলিম বাহিনী মার-উজ-জাহরান নামক গিরি-উপত্যকায় পৌছে। এখানেই এশার নামায আদায়ের পর মুসলিম বাহিনী শিবির স্থাপন করে।

মক্কায় প্রবেশ

একই সময়ে, আবু সুফিয়ান ইবনে হারব মুহাম্মদ(সাঃ) এবং মক্কার মাঝখানে যাতায়াত অব্যাহত রাখেন এবং মক্কা বিজয় ঠেকাতে একটি সমঝোতায় পৌঁছানোর চেষ্টা করতে থাকেন। তথ্যসূত্র অনুসারে, তিনি মুহাম্মাদ(সাঃ) চাচা ইবনে আব্বাসের(রাঃ) সাহায্য পান, যদিও কিছু পণ্ডিত মনে করেন যে, আব্বাসীয় রাজবংশের শাসনাধীন ইতিহাসবিদগণ তাদের লেখায় আব্বাসের ভূমিকাকে বাড়িয়ে তুলে ধরেছেন এবং আবু সুফিয়ানের ভূমিকাকে ছোটো করে দেখিয়েছেন, যিনি কিনা আব্বাসীয় শত্রুদের পূর্বপুরুষ।[325]

মক্কা ইব্রাহিমীয় উপত্যকায় অবস্থিত, যা প্রায় ১০০০ ফিট উচু কালো অসমতল পাহাড় দ্বারা পরিবেষ্টিত। পাহাড়গুলোর খাঁদের মাঝে চল্লিশটি প্রবেশপথ ছিল। এগুলো ছিল

---

324 Lt.Gen. A.I. Akram। The Sword of Allah – Khalid bin Al-Waleed.

325 John Glubb, The Life and Times of Muhammad, Lanham, 1998, pp. 304–310.

উত্তর-পশ্চিম, দক্ষিণ-পশ্চিম, দক্ষিণ ও উত্তর-পূর্ব দিকে অবস্থিত। মুহাম্মাদ সঃ মুসলিম সেনাবাহিনীকে চারটি সারিতে বিভক্ত করেন: যেগুলোর প্রত্যেকটি এক এক পথ দিয়ে অগ্রসর হবে। মুহাম্মাদ(সাঃ) যে সারিতে উপস্থিত ছিলেন তার নেতৃত্ব দেন আবু উবাইদুল্লাহ ইবনে জাররাহ(রাঃ)। মদিনার প্রধান প্রবেশ পথের মধ্য দিয়ে আজাখিরের নিকটবর্তী উত্তর-পশ্চিম দিক থেকে মক্কায় প্রবেশের কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। মুহাম্মাদ(সাঃ) চাচাতো ভাই আল-যুবায়ের(রাঃ) দ্বিতীয় সারির নেতৃত্ব দিলেন এবং উক্ত সারিটি দক্ষিণ-পশ্চিম দিক হতে কুদা পাহাড়ের পশ্চিমের একটি পথ দিয়ে মক্কায় প্রবেশ করে। দক্ষিণ দিক হতে কুদাইর মধ্য দিয়ে প্রবিষ্ট সারিটি মুহাম্মাদ(সাঃ) চাচাতো ভাই আলীর(রাঃ) নেতৃত্বাধীন ছিল। সর্বশেষ কলামটি ছিল খালিদ ইবনে ওয়ালিদের নেতৃত্বাধীন, যা খান্দামা ও লাইসের মধ্য দিয়ে উত্তর-পূর্ব দিক দিয়ে প্রবেশের জন্য এগিয়ে যায়।[326]

তাদের রণকৌশলটি ছিল একই সময়ে একটি নির্দিষ্ট লক্ষ্য হিসেবে মক্কাকে কেন্দ্র করে চারদিক থেকে অগ্রসর হওয়া। এর ফলে শত্রুপক্ষের শক্তি ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়বে এবং অগ্রসরমান কোন সারির দিকেই তারা আলাদাভাবে মনোযোগ দিতে পারবে না। এই কৌশলের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ ছিল যদি একটি বা দুটি আক্রমণকারী সারি প্রবল বাধার সম্মুখীনও হয় এবং বাধা ভাঙতে অক্ষম হয়, তবুও অন্য পাশের সারিগুলো থেকে আক্রমণ চালিয়ে যাওয়া যাবে। এর কৌশল কুরাইশদের পালিয়ে যাওয়াকেও রোধ করা সম্ভব হবে।[327]

মুহাম্মাদ(সাঃ) কুরাইশরা আক্রমণ না করলে যুদ্ধ হতে বিরত থাকার প্রতি গুরুত্ব দিয়েছিলেন। মুসলিম সেনাবাহিনী রবিবার ১১ ডিসেম্বর ৬২৯ সালে মক্কায় প্রবেশ করে (১৮ রমজান ৮ হিজরি)। খালিদের সারি ছাড়া বাকি তিনটি সারির প্রবেশ ছিল শান্তিপূর্ণ ও রক্তপাতবিহীন। ইকরিমা ও সুফিয়ানের মত কট্টর মুসলিম-বিরোধীগণ কুরাইশ যোদ্ধাদের একটি দলকে একত্রিত করে খালিদের শারীর মুখোমুখি প্রেরণ করে। কুরাইশগণ মুসলিমদের তলওয়ার ও বর্শা দ্বারা আক্রমণ করে, মুসলিমগণ কুরাইশদের আক্রমণ প্রতিরোধ করে। একটি স্বল্পকালীন খণ্ডযুদ্ধের পর ১২ জন কুরাইশ সেনা

326 Akram 2007, p. 60.

327 Akram 2007, p. 61.

নিহত হবার পর কুরাইশগণ মুসলিমদেরকে প্রবেশের জন্য জায়গা ছেড়ে দেয়। মুসলিমদের ২ জন সেনা নিহত হয়।[328]

বিজিতদের প্রতি আচরণ

মক্কা বিজয় সূচনার শেষলগ্নে, আবু সুফিয়ান ইসলাম গ্রহণ করেন। হযরত মুহাম্মদ(সাঃ) তাকে প্রশ্ন করলে তিনি উত্তরে বলেন তিনি স্বীকার করেছেন যে, মক্কার দেবদেবীগণ ক্ষমতাহীন বলে প্রমাণিত হয়েছে এবং প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ ছাড়া কোন উপাস্য নেই, যা হল ইসলামী বিশ্বাসমূলক স্বীকারোক্তির প্রথমাংশ। বিনিময়ে, মুহাম্মাদ(সাঃ) আবু সুফিয়ানের ঘরকে নিরাপদ আশ্রয়কেন্দ্র হিসেবে ঘোষণা করেন কারণ সে ছিল গোত্রের তৎকালীন সর্দার, এবং সকলেই তার আয়ত্তাধীন এলাকায় জমায়েত হয়েছিল, যা তিনি এভাবে বলেন:

"এমনকি যে আবু সুফিয়ানের গৃহে প্রবেশ করবে সে সেও নিরাপদে থাকবে, যে অস্ত্র সমর্পণ করবে সেও নিরাপদে থাকবে, যে নিজ ঘরের দরজা বন্ধ করে থাকবে সেও নিরাপদে থাকবে।".[329]

তিনি আরও ঘোষণা করেন:

আল্লাহ তখন থেকেই মক্কাকে একটি পবিত্র আশ্রয়স্থল বানিয়েছেন যখন তিনি স্বর্গ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছিলেন, এবং পুনুরুত্থান দিবসের আগ পর্যন্ত এটি আল্লাহ প্রদত্ত পবিত্রতার কারণে পবিত্র স্থান হিসেবে বহাল থাকবে। আমার পূর্বে কাওকে এতে এই (দাঙ্গা হাঙ্গামা করার) বৈধতা দেয়া হয়নি। আমার পরে কাওকে বৈধতা দেয়াও হবে না, এবং একটি ক্ষুদ্র সময় ছাড়া আমার জন্যও এটি বৈধ ছিল না। এর পশুদেরকে (শিকারযোগ্য) তাড়া করা যাবে না, এর গাছ কাঁটা যাবে না, এর ঘাস বা কোন গাছ উপড়ে ফেলা যাবে না, এবং প্রকাশ্যে ঘোষণা দেওয়া ব্যতিরেকে এর লুকাতা (অধিকাংশ জিনিস) কেউ তুলে নিতে পারবে না।[330]

এরপর, হযরত মুহাম্মদ(সাঃ) তার সাহাবাদের সাথে নিয়ে কাবা ঘর পরিদর্শন করলেন। সকল দেব-দেবীর মূর্তি ভেঙ্গে ধ্বংস করে ফেলা হল। এরপর হযরত মুহাম্মদ(সাঃ) কুরআন মাজিদের নিম্নোক্ত আয়াত পাঠ: *"বলো, সত্য এসেছে এবং মিথ্যা বিলুপ্ত হয়েছে। নিশ্চয়ই মিথ্যা বিলুপ্ত হতে বাধ্য।"*(১৭:৮১)

---

328 Akram 2007, p. 61.

329 Al-Kamil fi al-Tarikh by Ibn al-Athir (আরবি)

330 Sahih Bukhari, Volume 5, Book 59, Number 603.

জনগণ মক্কায় সমবেত হল, এবং হযরত মুহাম্মদ(সাঃ) নিম্নোক্ত বক্তব্য দিলেন:
"আল্লাহ ছাড়া কোন উপাস্য নেই। তার কোন সহকারী নেই। তিনি তার অনুগতর কাছে করা অঙ্গীকার পূর্ণ করেছেন, তাকে সাহায্য করেছেন এবং তার সকল প্রতিপক্ষকে পরাজিত করেছেন। মনে রেখো, কাবা ঘরের অভিভাবকত্ব ও মক্কায় তীর্থযাত্রীদের পানি সরবরাহকারী ছাড়া সকলের বংশ বা সম্পদ সম্পর্কিত জাত্যাভিমানের দাবি বাতিল করা হল। মনে রেখো, যে হত্যা করবে তার রক্তপণ হল ১০০ উট। কুরাইশের লোকসকল, নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের কাছ থেকে অজ্ঞতার যুগের সকল অহংকার এবং তোমাদের পূর্বপুরুষ-সম্পর্কিত সকল গরিমা রহিত করেছেন, কারণ সকল লোকই আদমের উত্তরসূরি, আর আদম আঃ ছিলেন মাটির তৈরি।"
এরপর হযরত মুহাম্মদ(সাঃ) জনগণকে উদ্দেশ্য করে বললেন:
"হে কুরাইশগণ, তোমাদের প্রতি আমার কি রকম আচরণ করা উচিত বলে মনে কর?" এবং তারা বলল, "করুণা, হে আল্লাহর নবী। আমরা আপনার কাছ থেকে ভালো ছাড়া কিছুই আশা করি না।"
এরপর হযরত মুহাম্মদ(সাঃ) ঘোষণা করলেন:
"আমি তোমাদের ঠিক তাই বলবো যা নবী ইউসুফ তার ভাইদেরকে বলেছিলেন। আজ তোমাদের প্রতি আমার কোন অভিযোগ নেই; তোমরা যেতে পারো কারণ তোমরা মুক্ত।"[331] মক্কাবাসীর আত্মসমর্পণের পর মুহাম্মাদ(সাঃ) সম্মান বৃদ্ধি পায়। আরব অঞ্চল হতে সকল কূটনৈতিক প্রতিনিধিগণ তাকে স্বীকৃতি দিতে মদিনায় আসেন।[332]
দশজন লোককে মৃত্যুদণ্ডের নির্দেশ দেয়া হল:[333] ইকরিমা ইবনে আবু জেহেল, আবদুল্লাহ ইবনে সাদ ইবনে আবি সারহ, হাবার ইবনে আসওয়াদ, মিক্বাস সুবাবাহ লাইসি, হুয়াইরাস বিন নুকাইদ, আবদুল্লাহ হিলাল ও চারজন মহিলা যারা হত্যার বা অপরাধের দায়ে দোষী ছিল অথবা যুদ্ধ উস্কে দিয়েছিল অথবা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করেছিল।[334]
দুইজন গায়িকাকে হযরত মুহাম্মদ(সাঃ) আইন অমান্যের দায়ে অভিযুক্ত করেন, একজনকে হত্যা করা হয় কিন্তু অপরজন ইসলাম গ্রহণের কারণে মুক্তি পায়। আবদুল্লাহ ইবনে সাদ উসমান ইবনে আফফানের সুপারিশে নিরাপত্তা পায় এবং প্রাথমিকভাবে সে

---

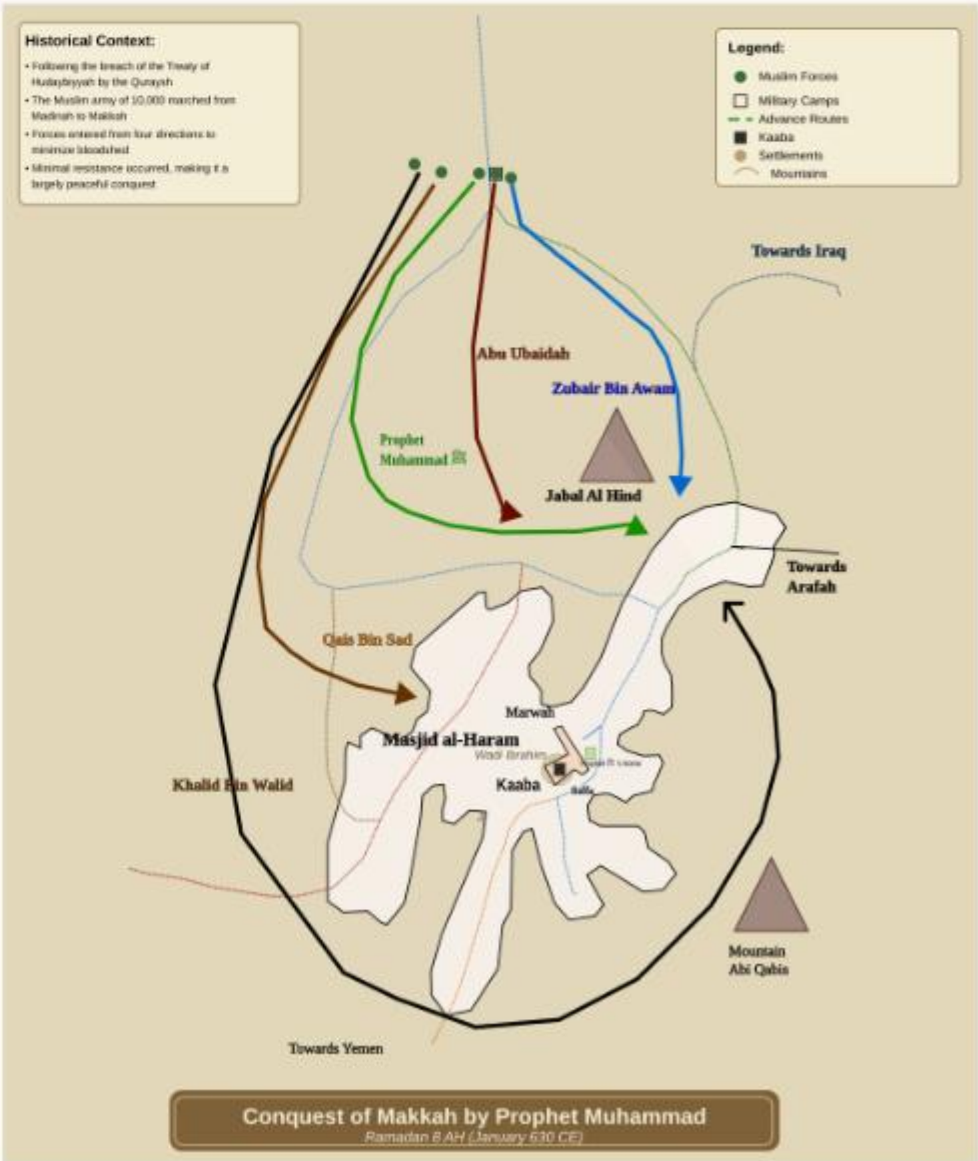
331 Related by Ibn Kathir, recorded by Ibn al-Hajjaj Muslim.
332 Abu Dawood 8:2677 at International Islamic University Malaysia.
333 The Message by Ayatullah Ja'far Subhani referencing Sirah by Ibn Hisham, vol. II, page 409.
334 The Message by Ayatullah Ja'far Subhani referencing Sirah by Ibn Hisham, vol. II, page 409.

হযরত মুহাম্মদ(সাঃ) আনুগত্য মেনে নিতে অস্বীকার করে, তবুও হযরত মুহাম্মদ(সাঃ) জারিকৃত আদেশকে ভুল বোঝার কারণে প্রত্যক্ষদর্শীরা তাকে হত্যা করেনি।

প্রতিক্রিয়া

মক্কা বিজয়ের পর মুহাম্মদ সঃ দয়াসুলভ আচরণ এবং মুসলমানদের সাথে মেলামেশার ফলে একদিকে মক্কায় দলে দলে লোকেরা ইসলাম গ্রহণ করতে লাগলো; অন্যদিকে তামাম আরব গোত্রের ওপর বিজয়ের ব্যাপক বিরাট প্রভাব পড়লো। তারা বুঝতে পারলো, ইসলামের প্রতি আহবানকারী বাস্তবিকই ধন-দৌলত বা রাজত্বের কোনো কাঙাল নন; বরং তিনি আল্লাহরই পয়গাম্বর। পরন্ত এ সময়ে ইসলাম ও তার বৈশিষ্ট্য কোনো চোরা-গুপ্তা জিনিস ছিলো না; বরং ইসলামী আদর্শের স্বরূপটা প্রায় গোটা আরব দেশই জেনে ফেলেছিলো। যাদের হৃদয়ে বুঝবার শক্তি ছিলো, তারা বুঝে নিয়েছিলো যে, এই হচ্ছে আসল সত্য। তাই মক্কা বিজিত হবার সঙ্গে সঙ্গেই আরবের দূর-দূরাঞ্চল থেকে বিভিন্ন গোত্রের লোকেরা এসে ইসলাম কবুল করতে লাগলো।

এতদসত্ত্বেও যে সব লোকের অন্তরে ইসলামী আন্দোলনের প্রতি ঘৃণা ও বিদ্বেষ বর্তমান ছিলো, তারা এ দৃশ্য দেখে যারপর নাই অস্তির হয়ে উঠলো। তাদের ভেতরে বিদ্বেষ ও বিরুদ্ধতার আগুন দাউ দাউ করে জ্বলে উঠলো। এদিক দিয়ে হুনাইনের অধিবাসী হাওয়াজেন ও সাকীফ নামক দুটি গোত্র অত্যন্ত অগ্রবর্তী ছিলো। তারা মুসলমানদের মুকাবিলার প্রস্তুতি নিতে থাকে। তারা মালিক ইবনে আওফ নাযারী নামক তাদের জনৈক সর্দারকে বাদশাহ মনোনীত করলো এবং মুসলমানদের মুকাবিলা করার জন্যে সর্বাত্মক প্রস্তুতি শুরু করে দিলো। এ ব্যাপারে তারা আরো বহু গোত্রকে নিজেদের সঙ্গী বানিয়ে নিলো। এ প্রস্তুতির কথা জানতে পেরে হযরত মুহাম্মাদ(সাঃ) সাহাবীদের সঙ্গে পরামর্শ করে সিদ্ধান্ত নিলেন যে এই ক্রমবর্ধমান ফিতনাকে সময় থাকতেই মিটিয়ে ফেলার চেষ্টা করতে হবে। এই সিদ্ধান্তের অনুবর্তিতায় হুনাইনের যুদ্ধ সংঘটিত হয়।



Schematic Diagram of the Conquest of Makkah (8 AH / 630 CE) [335]

চিত্রঃ মক্কা বিজয়ের পরিকল্পিত চিত্র

335 https://en.wikipedia.org/wiki/Conquest_of_Mecca

এক নজরে মক্কা বিজয়

বিবাদমান পক্ষ	
মুসলমান	কুরাইশ
সেনাধিপতি ও নেতৃত্ব প্রদানকারী	
মুহাম্মদ (সাঃ)	আবু সুফিয়ান ইবনে হারব
শক্তি	
১০,০০০	অজানা
হতাহত ও ক্ষয়ক্ষতি	
২	১২

[336]

336 https://en.wikipedia.org/wiki/Conquest_of_Mecca

গাজওয়া এ হুনাইন

গাজওয়া এ হুনাইন (আরবি: غَزوة حُنين, **হুনাইনের যুদ্ধ**) নবী হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) ও তার অনুসারীগণ কর্তৃক বেদুঈন গোত্র হাওয়াজিন ও তার উপশাখা সাকিফ এর বিরুদ্ধে মক্কা থেকে তাইফের পথে একটি রাস্তায় ৬৩০ সালে লড়াইকৃত একটি যুদ্ধ। মুসলিমদের বিজয়ের মাধ্যমে যুদ্ধটি সমাপ্ত হয়, তারা অসংখ্য গনিমতের মাল দখল করে নেয়। সূরা তওবাতে এই যুদ্ধের উল্লেখ আছে, যা কুরআনে উল্লেখিত স্বল্পসংখ্যক যুদ্ধের মধ্যে অন্যতম।[337][338]

হুনাইনের যুদ্ধ মক্কা বিজয়ের প্রভাব

হযরত (সাঃ)-এর দয়া সুলভ আচরণ এবং মুসলমানদের সাথে মেলামেশার ফলে একদিকে মক্কায় দলে দলে লোকেরা ইসলাম গ্রহণ করতে লাগলো, অন্যদিকে তামাম আরব গোত্রের ওপর বিজয়ের এর বিরাট প্রভাব পড়লো। তারা বুঝতে পারলো, ইসলামের প্রতি আহবানকারী বাস্তবিকই ধন-দৌলত বা রাজত্বের কোনো কাঙাল নন; বরং তিনি আল্লাহরই পয়গাম্বর। পরন্ত এ সময়ে ইসলাম ও তার বৈশিষ্ট্য কোনো চোরা-গুপ্তা জিনিস ছিলো না; বরং ইসলামী আদর্শের স্বরূপটা প্রায় গোটা আরব দেশই জেনে ফেলেছিলো। যাদের হৃদয়ে বুঝবার শক্তি ছিলো, তারা বুঝে নিয়েছিলো যে, এই হচ্ছে আসল সত্য। তাই মক্কা বিজিত হবার সঙ্গে সঙ্গেই আরবের দূর-দূরাঞ্চল থেকে বিভিন্ন গোত্রের লোকেরা এসে ইসলাম কবুল করতে লাগলো। এতদসত্ত্বেও যে সব লোকের অন্তরে ইসলামী আন্দোলনের প্রতি ঘৃণা ও বিদ্বেষ বর্তমান ছিলো, তারা এ দৃশ্য দেখে যারপর নাই অস্তির হয়ে উঠলো। তাদের ভেতরে বিদ্বেষ ও বিরুদ্ধতার আগুন দাউ দাউ করে জ্বলে উঠলো। এদিক দিয়ে হুনাইনের অধিবাসী হাওয়াজেন ও সাকীফ নামক দুটি গোত্র অত্যন্ত অগ্রবর্তী ছিলো। তারা এমনিতেও খুব যুদ্ধবাজ লোক ছিলো; তদুপরি ইসলামের অগ্রগতি দেখে তারা আরো অস্তির হয়ে পড়লো। তারা স্পষ্টত বুঝতে পারলো, মক্কার পর এবার তাদের পালা। তাই উভয় গোত্রের প্রধানদ্বয় একত্র হয়ে পরামর্শ করলো এবং এই সিদ্ধান্ত নিলো যে, পরিস্তিতি যা-ই হোক না কেন, দৃঢ়তার সাথে মুসলমানদের মুকাবিলা করতে হবে। কারণ ক্রমবর্ধমান বিপদকে প্রতিরোধ করতে না পারলে তাদের কল্যাণ নেই। এই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী তারা মালিক ইবনে

---

337 কুরআন ৯:২৫–২৭

338 Lammens, H. and Abd al-Hafez Kamal.। "Hunayn"। P.J. Bearman; Th. Bianquis; C.E. Bosworth; E. van Donzel; W.P. Heinrichs। Encyclopaedia of Islam Online Edition। Brill Academic Publishers.

আওফ নাযারী নামক তাদের জনৈক সর্দারকে বাদশাহ মনোনীত করলো এবং মুসলমানদের মুকাবিলা করার জন্যে সর্বাত্মক প্রস্তুতি শুরু করে দিলো। এ ব্যাপারে তারা আরো বহু গোত্রকে নিজেদের সঙ্গী বানিয়ে নিলো।[339]

হুনাইনের যুদ্ধ

এ প্রস্তুতির কথা জানতে পেরে নবী করীম -ও সাহাবীদের সঙ্গে পরামর্শ করে সিদ্ধান্ত নিলেন যে, এই ক্রমবর্ধমান ফিতনাকে সময় থাকতেই মিটিয়ে ফেলার চেষ্টা করতে হবে। এই সিদ্ধান্ত অনুসারে অষ্টম হিজরীর ১০ শাওয়াল মাসে ১০,০০০ বা ১১,৫০০ বা ১২,০০০ বা ১৬,০০০ মুসলিম সৈন্য নিয়ে মুহাম্মাদ(সাঃ) দুশমনের মুকাবিলার জন্যে রওয়ানা হলেন।[340] ঐ সময় মুসলমানদের সৈন্য সংখ্যা ছিলো বিপুল আর তাদের যুদ্ধ-সরঞ্জামও ছিলো প্রচুর। এটা দেখেই তাদের মনে পূর্ণ প্রত্যয় জন্মালো যে, দুশমনরা তাদের মুকাবিলা করতে কিছুতেই সমর্থ হবে না; বরং অচিরেই তারা ময়দান ছেড়ে পালিয়ে যাবে। এমন কি, কোনো কোনো মুসলমানের মুখ থেকে এ উক্তি পর্যন্ত বেরিয়ে পড়লো: 'আজ আর আমাদের ওপর কে জয়লাভ করতে পারে কিন্তু এরূপ ধারণা মুসলমানদের বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে কিছুমাত্রও সামঞ্জস্যশীল ছিল না। কারণ তাদের কখনো আপন শক্তি-সামর্থ্যের ওপর ভরসা করা উচিত নয়। তাদের শক্তি হওয়া উচিত শুধুমাত্র আল্লাহ তা'আলার দয়া ও করুণা। কুরআন পাকে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন: 'হুনাইনের দিনকে স্মরণ করো, যখন তোমরা নিজেদের সংখ্যাধিক্যতে তুষ্ট ছিলে; কিন্তু তাতে তোমাদের কোনো কাজ হয়নি; বরং জমিন প্রশস্ত থাকা সত্ত্বেও তা তোমাদের জন্যে সংকীর্ণ হয়ে গিয়েছিলো এবং তোমরা পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে পালিয়েছিলে। অতঃপর আল্লাহ তাঁর রাসূল এবং মুসলমানদের ওপর নিজের তরফ থেকে সান্ত্বনা ও প্রশান্তির ভাবধারা নাযিল করলেন এবং তোমরা দেখতে পাওনি এমন সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করে কাফিরদের শাস্তি দিলেন। কাফিরদের জন্যে এমনি শাস্তিই নির্ধারিত।'[341]

এ যুদ্ধে আল্লাহ পাক মুসলমান বাহিনীকে আত্মিক প্রশান্তি ও ৫,০০০ বা ৮,০০০ বা ১৬,০০০ ফেরেশতা দ্বারা সাহায্য করেছিলেন। আর নবী মুহাম্মদ(সাঃ) এক মুষ্টি মাটি

339 রাহীখুল মাখতুম,যুদ্ধ অধ্যায়।

340 আব্দুর রহমান, জামালুদ্দীন (তাবি)। যাদুল মাআদ ফী ইলমিত তাফসির। মক্কা: মাকতাবাতে শামেলা। পৃষ্ঠা খ ৩, পৃ ২৬২।

341 সূরা তাওবাঃ ২৫,২৬।

আল্লাহর নাম নিয়ে কাফেরদের দিকে নিক্ষেপ করলেন। এর মাটি সব কাফেরের চোখে পড়ে। ফলে তারা আর দেখতে পারে না। কাফেররা পরাজিত হলো।[342]

হুনাইন হচ্ছে মক্কা ও তায়েফের মধ্যবর্তী একটি উপত্যকা। এখানেই এই ঐতিহাসিক যুদ্ধ সংঘটিত হয়। মুসলমানরা সামনে আসা মাত্র দুশমনরা আশ-পাশের পাহাড় থেকে এলোপাথাড়ি তীর নিক্ষেপ করতে শুরু করলো। এ পরিস্থিতির জন্যে মুসলমানরা মোটেও প্রস্তুত ছিলো না। এর ফলে তাদের সৈন্যদলে বিশৃংখলা দেখা দিলো এবং কিছুক্ষণের জন্যে তারা ময়দান ত্যাগ করলো। অনেক বেদুইন গোত্র ময়দান থেকে পালিয়ে গেলো। এদের মধ্যে সবেমাত্র ঈমান এনেছে এবং পূর্ণ প্রশিক্ষণ পায়নি এমন অনেক নও-মুসলিমও ছিলো। এই বিশৃংখল পরিস্থিতিতে হযরত অত্যন্ত দৃঢ়তা ও প্রশান্ত চিত্তে যুদ্ধ ক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে রইলেন এবং দুশমনদের মুকাবিলা করা ও ময়দান থেকে পৃষ্ঠ প্রদর্শন না করার জন্যে মুসলমানদের প্রতি ক্রমাগত আহবান জানাতে লাগলেন। তার এই অপূর্ব ধৈর্য-স্থৈর্য এবং তার চারপাশে বহু সাহাবীর অকৃত্রিম দৃঢ়তা দেখে মুসলিম সৈন্যরা পুনরায় ময়দানে আসতে শুরু করলো এবং নবতর উৎসাহ-উদ্দীপনা ও শৌর্য-বীর্যের সঙ্গে দুশমনদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো। নবী করীম (স) এবং তার সাহাবীদের এই ধৈর্য ও দৃঢ়তাকেই আল্লাহ তা'আলা তাঁর তরফ থেকে অবতীর্ণ সান্ত্বনা ও প্রশান্তির লক্ষণ বলে উল্লেখ করেছেন। এর ফলে আল্লাহর অনুগ্রহে অল্পক্ষণের মধ্যেই যুদ্ধের মোড় ঘুরে গেলো এবং মুসলমানরা পুরোপুরি জয়লাভ করলো। কাফিরদের প্রায় ৭০ ব্যক্তি নিহত এবং সহস্রাধিক লোক বন্দী হলো।

দুশমনদের পশ্চাদ্ধাবন ও কল্যাণ কামনা কাফিরদের বাকি সৈন্যদের পালিয়ে গিয়ে তায়েফে আশ্রয় গ্রহণ করলো। কারণ তায়েফকে একটি নিরাপদ স্থান মনে করা হতো। হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) তাদের পশ্চাদ্ধাবন করলেন এবং তায়েফ অবরোধ করলেন। তয়েফে একটি মশহুর ও মজবুত দুর্গ ছিলো। এর ভেতরেই কাফিরগণ আশ্রয় গ্রহণ করেছিলো। অবরোধ প্রায় বিশ দিন অব্যাহত রইলো। হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) যখন ভালোমতো বুঝতে পারলেন যে, দুশমনদের মেরুদণ্ড ভেঙে পড়েছে এবং এখন আর তাদের মাথা উঁচু করে দাঁড়াবার কোনো আশঙ্কা নেই, তখন তিনি অবরোধ তুলে নিলেন এবং তাদের জন্যে দোআ করলেন: 'হে আল্লাহ! সাকীফ গোত্রকে সুপথ প্রদর্শন করো এবং তাদেরকে আমার কাছে হাযির হবার তাওফিক দাও।' কেবল দ্বীন-ইসলামের

---

342 আব্দুর রহমান, জামালুদ্দীন (তাবি)। যাদুল মাআদ ফী ইলমিত তাফসির। মক্কা: মাকতাবাতে শামেলা। পৃষ্ঠা খ ৩, পৃ ১৬৩।

জন্যে সংগ্রামকারী খোদার নবী ছাড়া কে এমনি পরিস্থিতিতে একখানি দয়ার্দ্র হৃদয় ও স্নেহশীল হতে পারে এবং বিরুদ্ধবাদীদের জন্যে কল্যাণ কামনা করতে পারে?[343]

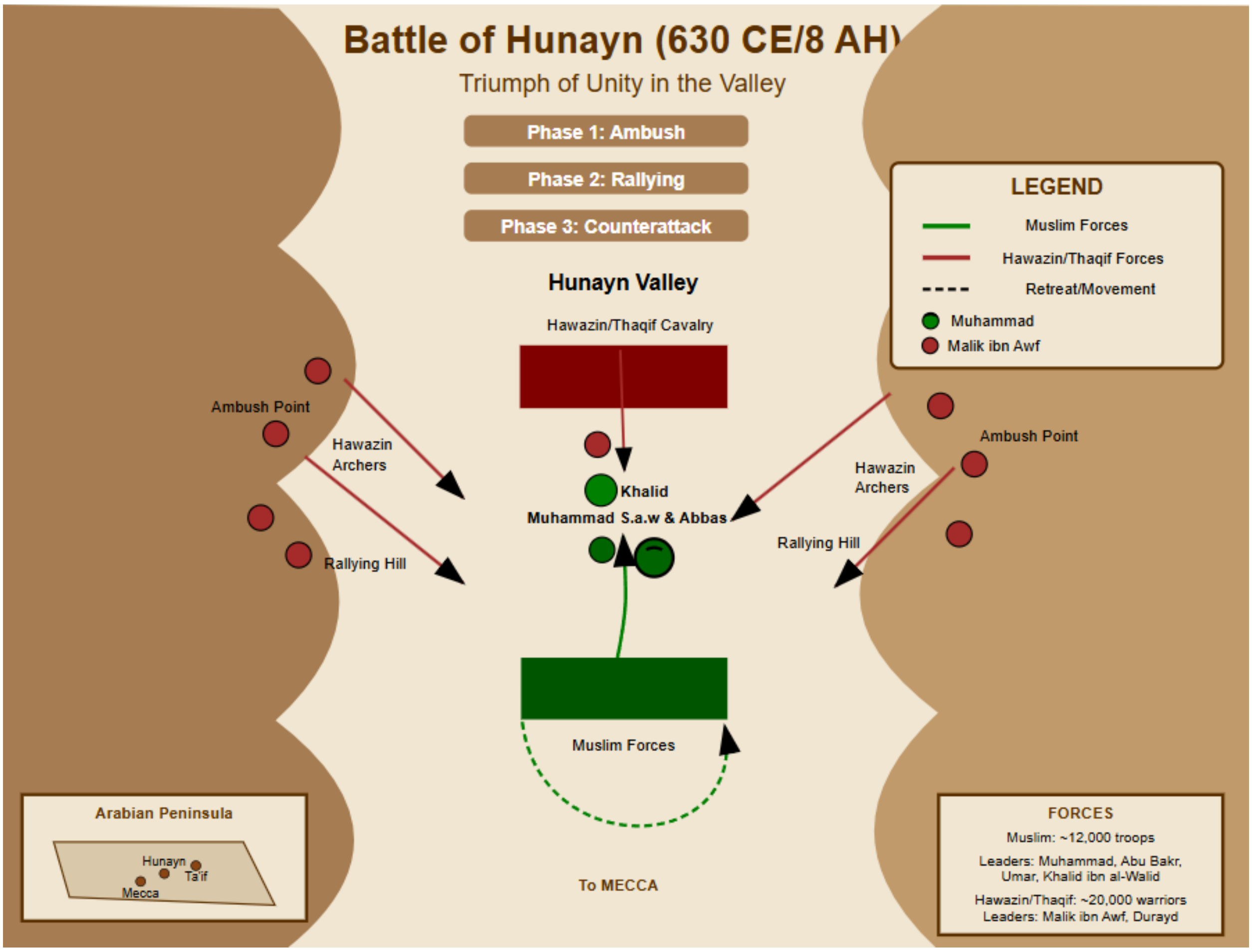
এক নজরে হুনাইনের যুদ্ধ

বিবাদমান পক্ষ	
মুসলিম	কুরাইশ,হাওয়াজিন,সাকিফ,কাইস,নাসর,জুশম, সাদ ইবন বকর,বনু হিলাল,বনু 'আমর বিন আমির, বনু 'অউফ বিন আমির
সেনাধিপতি ও নেতৃত্ব প্রদানকারী	
মুহাম্মদ(সাঃ) আলী(রাঃ) আব্বাস ইবনে আব্দুল মুত্তালিব(রাঃ)	মালিক ইবন অউফ আল-নাসরি
শক্তি	
১২,০০০	২০,০০০
হতাহত ও ক্ষয়ক্ষতি	
	৭০ নিহত ৬,০০০ বন্দী ২৪,০০০ উট গনিমতের মাল হিসেবে জব্দ করা হয়।

[344]

343 আর রাহিখুল মাখতুম।

344 https://en.wikipedia.org/wiki/Battle_of_Hunayn



[345]

চিত্রঃ হুনাইনের যুদ্ধ (৬৩০ খ্রিস্টাব্দ) - পরিকল্পিত মানচিত্র

345 https://en.wikipedia.org/wiki/Battle_of_Hunayn


[346]

চিত্রঃ হুনাইনের জারানা মসজিদের কাছে যুদ্ধের কবরস্থান

346 https://en.wikipedia.org/wiki/Battle_of_Hunayn

মু'তার যুদ্ধ (আরবি: مَعْرَكَة مُؤْتَة, অথবা আরবি: غَزْوَة مُؤْتَة *Ghazwat Muʿtah*) সংঘটিত হয় ৬২৯ খ্রিস্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে (১ জুমাদাল আউয়াল, ৮ হিজরি)।[347] এ যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর বাহিনী এবং বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্য ও তাদের মিত্র ঘাসানিদদের বাহিনীর মধ্যে।

এই যুদ্ধের স্থান ছিল প্যালেস্টিনা সালুটারিস অঞ্চলের মু'তা গ্রামে, যা জর্ডান নদীর পূর্বে এবং বর্তমান কারাক শহরের নিকটবর্তী।

ইসলামি ঐতিহাসিক সূত্র অনুযায়ী, এই যুদ্ধের উদ্দেশ্য ছিল এক ঘাসানিদ নেতা কর্তৃক এক মুসলিম দূতকে হত্যার প্রতিশোধ নেওয়া। অপরদিকে, বাইজেন্টাইন সূত্রে বলা হয়, মুসলমানরা একটি ধর্মীয় উৎসবের দিনে হামলার পরিকল্পনা করেছিল। কিন্তু স্থানীয় বাইজেন্টাইন ভিকারিয়াস এ পরিকল্পনা জেনে ফেলেন এবং বিভিন্ন দুর্গ থেকে সৈন্য একত্র করেন। শত্রু বাহিনীর বিশাল সংখ্যা দেখে মুসলিম বাহিনী দক্ষিণে সরে আসে। পরে মু'তা গ্রামে যুদ্ধ শুরু হয়। সেই যুদ্ধে মুসলমানরা পরাজিত হয়েছিল অথবা মূল লক্ষ্য অর্জন না করেই পিছু হটে গিয়েছিল।[348][349][350]

ইসলামি সূত্রে বলা হয়, যুদ্ধ চলাকালীন মুসলিম বাহিনীর তিনজন সেনানায়ক শহিদ হন। এরপর খালিদ ইবনুল ওয়ালিদ(রাঃ) নেতৃত্ব গ্রহণ করেন এবং অবশিষ্ট সৈন্যদের নিরাপদে ফিরিয়ে আনতে সক্ষম হন।[351]

এই যুদ্ধের তিন বছর পর, মুসলমানরা উসামা ইবন যায়েদ অভিযানে বাইজেন্টাইন বাহিনীর বিরুদ্ধে পুনরায় অভিযান পরিচালনা করে এবং বিজয় অর্জন করে।

পটভূমি

৬২৯ খ্রিস্টাব্দের জুলাই মাসে সম্রাট হেরাক্লিয়াস ও সাসানিদ সেনাপতি শাহরবারাজের মধ্যে শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরের পর, বাইজেন্টাইনরা পুনরায় বিভিন্ন এলাকা দখল করতে শুরু করে।[352] বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্যের *সাকেল্লারিওস* থিওডোরকে সেনাবাহিনীর নেতৃত্বে নিয়োগ করা হয়। তিনি

---

347 Kaegi 1992, পৃ. 72.

348 Watt 1956, পৃ. 54.

349 Buhl 1993, পৃ. 756-757.

350 Kaegi 1992, পৃ. 67.

351 Buhl 1993, পৃ. 756-757.

352 Kaegi 1992, পৃ. 72-73.

যখন বালকায় অবস্থান করছিলেন, তখন আরব গোত্রগুলোকেও সৈন্য হিসেবে নিয়োগ করা হয়।[353]

এই সময়েই, মুহাম্মদ (সা.) বুসরা-এর শাসকের কাছে এক দূত প্রেরণ করেন।[354] কিন্তু সেই দূত মু'তা গ্রামের পথে থাকাকালীন ঘাসানিদ কর্মকর্তা শুরাহবিল ইবন আমর-এর আদেশে নিহত হন।[355]

সেনাবাহিনীর প্রস্তুতি

এই ঘটনার প্রতিশোধ নিতে, মুহাম্মদ (সা.) ৬২৯ খ্রিস্টাব্দে (৭ হিজরি, জুমাদাল আউয়াল মাসে) ৩,০০০ সৈন্য প্রেরণ করেন।[356] বাহিনীর নেতৃত্বে ছিলেন জায়দ ইবন হারিসা(রাঃ), তার পরপরই দায়িত্বে ছিলেন জাফর ইবন আবি তালিব(রাঃ), এবং তৃতীয় কমান্ডার ছিলেন আবদুল্লাহ ইবন রাওয়াহা(রাঃ)।[357]

মুসলিম বাহিনী যখন জর্ডান নদীর পূর্বাঞ্চলে পৌঁছে বাইজেন্টাইন বাহিনীর সংখ্যার কথা জানতে পারে, তখন তারা মদিনা থেকে সাহায্য পাঠানোর অনুরোধ করে অপেক্ষা করতে চায়। কিন্তু আবদুল্লাহ ইবন রাওয়াহা(রাঃ) তাদের স্মরণ করিয়ে দেন, তারা শহিদ হওয়ার আকাঙ্ক্ষা নিয়ে এসেছে; এমন সুযোগ যখন সামনে, তখন পিছিয়ে পড়ার কোনো মানে হয় না। ফলে তারা অগ্রসর হয়।

যুদ্ধ

প্রথমে মুসলিম বাহিনী বাইজেন্টাইনদের মুশারিফ গ্রামের শিবিরে আক্রমণ করে। এরপর তারা মু'তার দিকে সরে যায়, এবং সেখানেই মূল যুদ্ধ সংঘটিত হয়। কিছু মুসলিম সূত্র অনুযায়ী, যুদ্ধটি দুই পাহাড়ের মাঝের উপত্যকায় হয়, ফলে বাইজেন্টাইনদের সংখ্যাগত সুবিধা কাজে লাগেনি।

যুদ্ধে মুসলিম বাহিনীর তিন নেতা একে একে শহিদ হন—প্রথমে জায়দ(রাঃ), এরপর জাফর(রাঃ), শেষে আবদুল্লাহ(রাঃ)। অপরদিকে, আরব অনুগত বাহিনীর নেতা মালিক ইবন জাফিলাও নিহত হন।[358]

---

353 Kaegi 1992, পৃ. 72-73.

354 El Hareir ও M'Baye 2011, পৃ. 142.

355 El Hareir ও M'Baye 2011, পৃ. 142.

356 El Hareir ও M'Baye 2011, পৃ. 142.

357 Powers 2014, পৃ. 58-59.

358 Ibn Ishaq (২০০৮)। The Life of Muhammad। A. Guillaume (trans.)। Oxford University Press, USA। পৃষ্ঠা 532, 536। They went on their way as far as Maʻān in Syria where they heard that Heraclius had come down to Ma'āb in the Balqā' with 100,000 Greeks joined by 100,000 men from Lakhm and

আবদুল্লাহর মৃত্যুর পর মুসলিম সেনারা ছত্রভঙ্গ হওয়ার মুখে পড়ে। তখন থাবিত ইবন আকরাম পতাকা তুলে নিয়ে সৈন্যদের সংগঠিত করেন এবং সেনাবাহিনীকে সম্পূর্ণ ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করেন। যুদ্ধশেষে তিনি খালিদ ইবন আল-ওয়ালিদকে(রাঃ) নেতৃত্ব গ্রহণ করতে বলেন।[359]

মুসলিম ক্ষয়ক্ষতি

যুদ্ধে নিহত মুসলমানদের মধ্যে চারজন ছিলেন মুহাজির (মক্কা থেকে মদিনায় হিজরতকারী প্রারম্ভিক মুসলিম), এবং আটজন ছিলেন আনসার (মদিনার স্থানীয় প্রারম্ভিক মুসলিম)। ঐতিহাসিক সূত্রে যাঁদের নাম পাওয়া যায়, তাঁরা হলেন: জায়দ ইবন হারিসা(রাঃ), জাফর ইবন আবি তালিব(রাঃ), আবদুল্লাহ ইবন রাওয়াহা(রাঃ), মাসউদ ইবন আল-আসওয়াদ(রাঃ), ওহব ইবন সা'দ(রাঃ), আব্বাদ ইবন কায়েস(রাঃ), আমর ইবন সা'দ(রাঃ), হারিস ইবন নুয়মান(রাঃ), সুরাকা ইবন আমর(রাঃ), আবু কুলাইব ইবন আমর(রাঃ), জাবির ইবন আমর(রাঃ) ও আমির ইবন সা'দ(রাঃ)।

ব্রিগহ্যাম ইয়াং বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামি অধ্যয়নের অধ্যাপক ড্যানিয়েল সি. পিটারসন মন্তব্য করেছেন, সাধারণ সৈন্যদের তুলনায় নেতাদের মধ্যে হতাহতের অনুপাত সন্দেহজনকভাবে বেশি।[360] কর্নেল বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডেভিড পাওয়ার্স-ও মুসলিম ঐতিহাসিকদের নিকৃষ্টসংখ্যক হতাহতের তথ্য নিয়ে সংশয় প্রকাশ করেন।[361] মন্টগোমারি ওয়াট মনে করেন, যদি যুদ্ধটি ছোটখাটো সংঘর্ষ (skirmish) হয়ে থাকে অথবা মুসলমানরা শত্রুপক্ষকে ছত্রভঙ্গ করতে সক্ষম হয়ে থাকে, তাহলে হতাহতের সংখ্যা কম হওয়াটা সম্ভব।[362] তিনি আরও বলেন, আরবদের যুদ্ধ কৌশল বিবেচনায় নেতাদের বেশি ক্ষয়ক্ষতি হওয়া অসম্ভব নয়।[363]

Judhām and al-Qayn and Bahrā' and Balī commanded by a man of Balī of Irāsha called Mālik b. Zāfila. (p. 232) Quṭba b. Qatāda al-'Udhrī who was over the right wing had attacked Mālik b. Zāfila (Ṭ. leader of the mixed Arabs) and killed him, (p. 236).

359 Jafar al-Tayyar, Al-Islam.org.

360 Peterson 2007, পৃ. 142.

361 Powers 2009, পৃ. 80.

362 Watt 1956, পৃ. 54.

363 Watt 1956, পৃ. 55.

পরিণতি

যখন মুসলিম বাহিনী মদিনায় ফিরে আসে, তখন তাদের সমালোচনার মুখে পড়তে হয় এবং পালিয়ে আসার অভিযোগও ওঠে।[364] আবু জাহলের ভাই সালামা ইবন হিশাম মসজিদে না গিয়ে ঘরে নামাজ পড়তেন, যাতে তাকে কোনো ব্যাখ্যা দিতে না হয়। এই অবস্থায় মুহাম্মদ (সা.) সবাইকে থামতে বলেন এবং ঘোষণা করেন, তারা আবার বাইজেন্টাইনদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে যাবে।[365]

ওয়াটের মতে, এই ধরনের বর্ণনাগুলো অনেকাংশে খালিদের(রাঃ) পিছু হটার সিদ্ধান্তকে নেতিবাচকভাবে চিত্রিত করতে এবং কোনো পরিবারের সদস্যদের বীরত্ব বাড়িয়ে দেখানোর উদ্দেশ্যে রচিত হয়েছিল।[366] তৃতীয় হিজরি শতাব্দী পর্যন্ত কোনো সুন্নি মুসলিম ইতিহাসকার লিখে যাননি যে, মুহাম্মদ (সা.) খালিদকে(রাঃ) "সাইফুল্লাহ" (আল্লাহর তরবারি) উপাধি দিয়েছিলেন।[367]

আজ মুসলিমদের মধ্যে মু'তা যুদ্ধে নিহতদের শহিদ (*শুহাদা*) হিসেবে গণ্য করা হয়। পরবর্তীতে মু'তায় তাঁদের কবরের উপর একটি মাজার নির্মাণ করা হয়।[368]

মু'তার দ্বিতীয় যুদ্ধ

৬৩২ খ্রিস্টাব্দের জুন মাসে উসামা ইবন যায়েদ বাইজেন্টাইন শাসিত সিরিয়ার বিরুদ্ধে একটি সামরিক অভিযান পরিচালনা করেন। এটি মু'তা যুদ্ধে নিহতদের, বিশেষ করে তার পিতা এবং মুহাম্মদ (সা.)-এর দত্তক পুত্র জায়দের প্রতিশোধ নেওয়ার উদ্দেশ্যে পরিচালিত হয়। এই অভিযানের আদেশ মুহাম্মদ (সা.) বিদায় হজ শেষে দিয়েছিলেন এবং তিনি উসামাকে বালকা অঞ্চলে আক্রমণের জন্য সেনাপ্রধান হিসেবে নিযুক্ত করেন।

উসামার এই অভিযান সফল হয়। তাঁর বাহিনী ছিল প্রথম মুসলিম বাহিনী যারা বাইজেন্টাইন ভূখণ্ডে প্রবেশ করে সফলভাবে লুণ্ঠন চালায়। এর মাধ্যমে পরবর্তীতে লেভান্ত বিজয় এবং মিসর বিজয়-এর পথ সুগম হয়।

---

364 Powers 2009, পৃ. 81.

365 Powers 2009, পৃ. 81.

366 Watt 1956, পৃ. 54.

367 Powers 2009, পৃ. 80.

368 Buhl 1993, পৃ. 756-757.

ইতিহাস-লিপি

আল-ওয়াকিদি (মৃ. ৮২৩) ও ইবন ইসহাক (মৃ. ৭৬৭)-এর বর্ণনায়, মুসলমানরা জানতে পারেন যে বালকা অঞ্চলে ১ লক্ষ[369] বা ২ লক্ষ[370] শত্রু সৈন্যের ছাউনির অবস্থান ছিল।[371][372] অনেক আধুনিক ঐতিহাসিক মনে করেন, এই সংখ্যাগুলো অত্যন্ত অতিরঞ্জিত।[373][374][375] শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইজেন্টাইন ইতিহাসের অধ্যাপক ওয়াল্টার এমিল কায়েগির মতে, সপ্তম শতকে বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্যের সমগ্র সেনাবাহিনীর সম্ভাব্য সর্বোচ্চ সংখ্যা হতে পারে ১ লক্ষ, এমনকি এর অর্ধেকও হতে পারে।[376] মু'তা যুদ্ধে বাইজেন্টাইন বাহিনী সম্ভবত ১০,০০০ জনের বেশি ছিল না।[377] মন্টগোমারি ওয়াট মনে করেন, বাইজেন্টাইন বাহিনীর সংখ্যা ৩,০০০ থেকে ২০,০০০ এর মধ্যে হতে পারে, তবে মুসলমানরা সম্পূর্ণ বাহিনীর মুখোমুখি হয়েছে—এমনটা সম্ভাব্য নয়।[378]

মুসলিম সূত্রগুলিতে যুদ্ধের ফলাফলের ভিন্নতা দেখা যায়।[379] ডেভিড পাওয়ার্সের মতে, প্রারম্ভিক মুসলিম ঐতিহাসিক যেমন আল-ওয়াকিদি এই যুদ্ধে মুসলমানদের পরাজয় (*হাযিমা*) হিসেবে উল্লেখ করেছেন।[380] পাওয়ার্স ধারণা করেন, পরবর্তীকালে মুসলিম ইতিহাসবিদরা এই সূত্রগুলো ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে পুনর্লিখন করেন, যেন তা আল্লাহর

369 Gil, Moshe (১৯৯৭-০২-২৭)। A History of Palestine, 634-1099। Cambridge University Press। পৃষ্ঠা 23.

370 Ibn Ishaq (২০০৮)। The Life of Muhammad। A. Guillaume (trans.)। Oxford University Press, USA। পৃষ্ঠা 532, 536। They went on their way as far as Ma‘ān in Syria where they heard that Heraclius had come down to Ma’āb in the Balqā’ with 100,000 Greeks joined by 100,000 men from Lakhm and Judhām and al-Qayn and Bahrā’ and Balī commanded by a man of Balī of Irāsha called Mālik b. Zāfila. (p. 232) Quṭba b. Qatāda al-‘Udhrī who was over the right wing had attacked Mālik b. Zāfila (Ṭ. leader of the mixed Arabs) and killed him, (p. 236).

371 Gil, Moshe (১৯৯৭-০২-২৭)। A History of Palestine, 634-1099। Cambridge University Press। পৃষ্ঠা 23.

372 Haykal 1976, পৃ. 419.

373 Haldon 2010, পৃ. 188.

374 Peters 1994, পৃ. 231.

375 Buhl 1993, পৃ. 756-757.

376 Kaegi 2010, পৃ. 99.

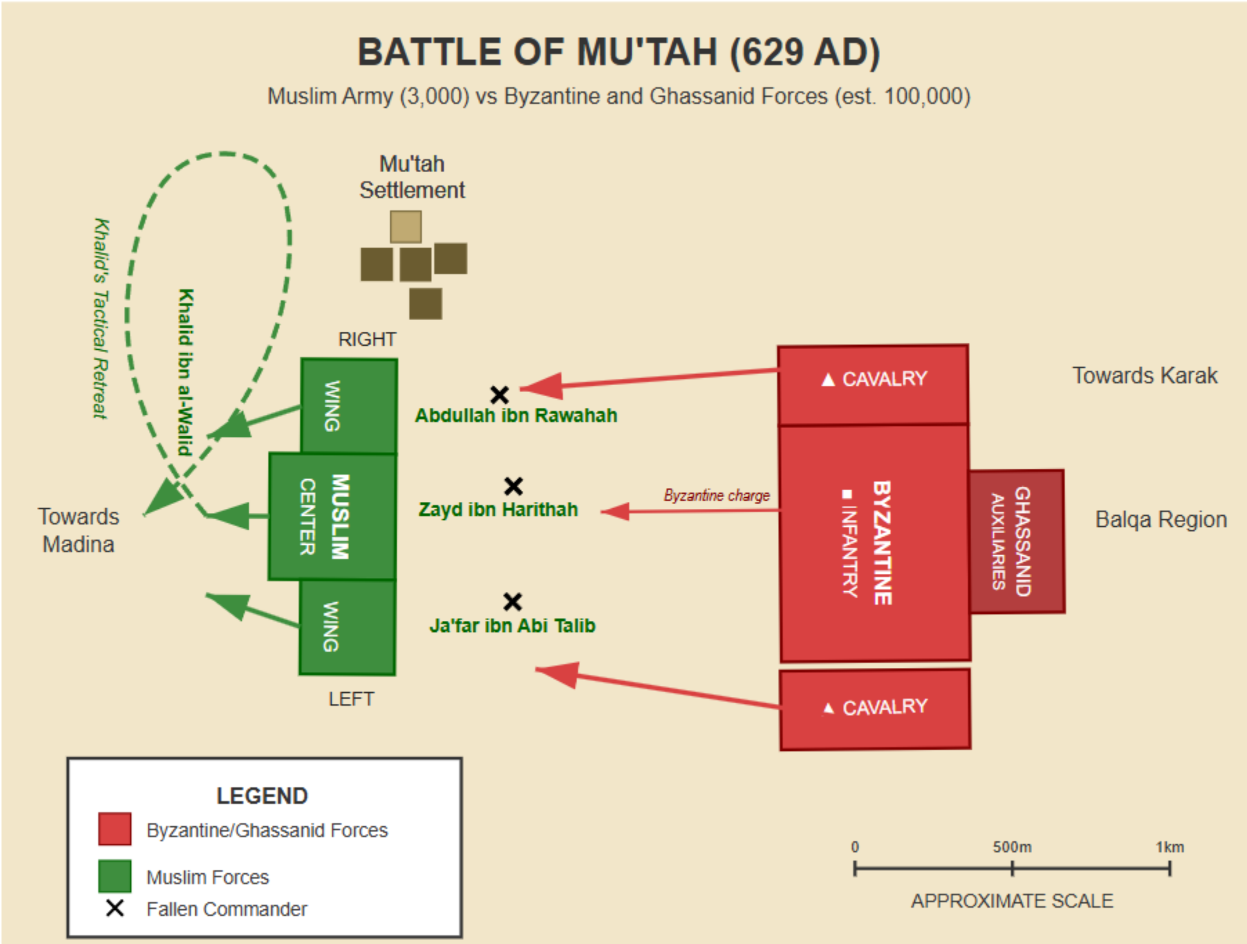
377 Kaegi 1992, পৃ. 79.

378 Watt 1956, পৃ. 54.

379 Powers 2009, পৃ. 80.

380 Powers 2009, পৃ. 80.

পরিকল্পনার অংশ হিসেবে উপস্থাপিত হয়।[381] পরবর্তী সূত্রগুলো যুদ্ধকে মুসলমানদের বিজয় হিসেবে তুলে ধরে, যেহেতু অধিকাংশ সৈন্য নিরাপদে ফিরে আসে।[382]



[383]

চিত্রঃ ৬২৯ খ্রিস্টাব্দে মু'তা যুদ্ধের কৌশলগত মানচিত্র, বর্তমান জর্ডানের নিকট সংঘটিত।

381 Powers 2009, পৃ. 80.

382 Powers 2009, পৃ. 80.

383 https://en.wikipedia.org/wiki/Battle_of_Mu%27tah



[384]

চিত্রঃ মুসলিম সেনানায়ক জায়দ ইবন হারিসা(রাঃ), জাফর ইবন আবি তালিব(রাঃ) ও আবদুল্লাহ ইবন রাওয়াহা(রাঃ)-এর কবর, যা মু'তা, জর্ডান সংলগ্ন আল-মাজার এলাকায় অবস্থিত।

[384] https://en.wikipedia.org/wiki/Battle_of_Mu%27tah


[385]

চিত্রঃ মু'তার যুদ্ধের স্থানের নিকটবর্তী প্রত্নতাত্ত্বিক অবশিষ্টাংশ।

385 https://en.wikipedia.org/wiki/Battle_of_Mu%27tah

এক নজরে মু'তার যুদ্ধ

বিবাদমান পক্ষ	
মুসলিম আরবরা	বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্য ঘাসানিদগণ
সেনাধিপতি ও নেতৃত্ব প্রদানকারী	
জায়দ ইবন হারিসা (রাঃ) জাফর ইবন আবি তালিব(রাঃ) আবদুল্লাহ ইবন রাওয়াহা (রাঃ) খালিদ ইবন আল-ওয়ালিদ(রাঃ)	থিওডোর মালিক ইবন জাফিলা
শক্তি	
আনু. 3,000	আনু. 10,000
হতাহত ও ক্ষয়ক্ষতি	
১২ জন (বিতর্কিত) অথবা গুরুতর ক্ষতি	অজানা

[386]

386 https://en.wikipedia.org/wiki/Battle_of_Mu%27tah

তাবুক অভিযানে (বা **উসরার অভিযান**) ইসলামি নবী মুহাম্মদ (সা.) ৯ হিজরি, অর্থাৎ অক্টোবর ৬৩০ খ্রিষ্টাব্দে নেতৃত্ব দেন। এই সামরিক অভিযানে প্রায় ৩০,০০০ যোদ্ধা অংশগ্রহণ করে।[387][388] তাঁরা উত্তর দিকে বর্তমান উত্তর-পশ্চিম সৌদি আরবের তাবুক পর্যন্ত অগ্রসর হন, যা আকাবা উপসাগরের কাছে অবস্থিত।[389]

প্রস্তুতি

বাইজেন্টাইনদের সম্ভাব্য আগ্রাসনের গুজব ছড়িয়ে পড়লে,[390] মুহাম্মদ (সা.) তাঁর অনুসারী ও মিত্রদের দ্রুত অভিযানে যোগ দেওয়ার আহ্বান জানান। তবে মরু অঞ্চলের অনেক আরব এতে আগ্রহ দেখাননি এবং নানা অজুহাত দেন। তখন নবী তাঁদের উৎসাহিত করতে বিভিন্ন উপহার ও প্রণোদনা প্রদান করেন।[391]

অভিযান

৬৩০ খ্রিষ্টাব্দে (৯ হিজরির রজব মাসে) মুহাম্মদ (সা.) তাঁর বাহিনী নিয়ে উত্তর দিকে তাবুকের দিকে রওনা দেন।[392][393] এটি ছিল তাঁর সর্ববৃহৎ এবং শেষ সামরিক অভিযান।[394] আলি ইবনে আবু তালিব অন্যান্য বহু অভিযানে অংশগ্রহণ করলেও, নবী মুহাম্মদের সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নির্দেশে এই অভিযানে অংশ নেননি, কারণ তাঁকে মদিনায় দায়িত্বে রাখা হয়েছিল।[395] নবী তাবুকে প্রায় বিশ দিন অবস্থান করেন এবং ওই সময়ে আশপাশের নেতাদের সঙ্গে জোট গড়ে তোলেন।[396] বাইজেন্টাইন

---

387 George F. Nafziger; Mark W. Walton (২০০৩), Islam at War: A History, Praeger Publishers, পৃষ্ঠা 13.

388 Welch, Alford T.; Moussalli, Ahmad S. (২০০৯)। "Muḥammad"। Esposito, John L.। The Oxford Encyclopedia of the Islamic World। Oxford University Press.

389 Welch, Alford T.; Moussalli, Ahmad S. (২০০৯)। "Muḥammad"। Esposito, John L.। The Oxford Encyclopedia of the Islamic World। Oxford University Press.

390 George F. Nafziger; Mark W. Walton (২০০৩), Islam at War: A History, Praeger Publishers, পৃষ্ঠা 13.

391 Muir, William (১০ আগস্ট ২০০৩)। Life of Mahomet। Kessinger Publishing Co। পৃষ্ঠা 454.

392 Welch, Alford T.; Moussalli, Ahmad S. (২০০৯)। "Muḥammad"। Esposito, John L.। The Oxford Encyclopedia of the Islamic World। Oxford University Press।.

393 Richard A. Gabriel (২০০৭), Muhammad: Islam's First Great General, University of Oklahoma Press, পৃষ্ঠা 197.

394 Welch, Alford T.; Moussalli, Ahmad S. (২০০৯)। "Muḥammad"। Esposito, John L.। The Oxford Encyclopedia of the Islamic World। Oxford University Press.

395 Sachedina, Abdulaziz (২০০৯)। "ʿAlī ibn Abī Ṭālib"। Esposito, John L.। The Oxford Encyclopedia of the Islamic World। Oxford University Press.

396 Richard A. Gabriel (২০০৭), Muhammad: Islam's First Great General, University of Oklahoma Press, পৃষ্ঠা 197.

বাহিনীর কোনো উপস্থিতি দেখা না যাওয়ায়,[397] তিনি মদিনায় ফিরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন।[398] যদিও তাবুকে কোনো যুদ্ধ সংঘটিত হয়নি, *অক্সফোর্ড এনসাইক্লোপিডিয়া অব দ্য ইসলামিক ওয়ার্ল্ড*অনুসারে, এই অভিযানের মাধ্যমে মুহাম্মদ (সা.) বাইজেন্টাইনদের উদ্দেশ্যে শক্তির প্রদর্শন করেন এবং মক্কা থেকে সিরিয়া অভিমুখী বাণিজ্যপথের উত্তরাংশের নিয়ন্ত্রণের ইঙ্গিত দেন।[399]



[400]

চিত্রঃ মুসলিম বিজয়ের মানচিত্র (তাবুক অন্তর্ভুক্ত)

397 Welch, Alford T.; Moussalli, Ahmad S. (২০০৯)। "Muḥammad"। Esposito, John L.। The Oxford Encyclopedia of the Islamic World। Oxford University Press.

398 George F. Nafziger; Mark W. Walton (২০০৩), Islam at War: A History, Praeger Publishers, পৃষ্ঠা 13.

399 Welch, Alford T.; Moussalli, Ahmad S. (২০০৯)। "Muḥammad"। Esposito, John L.। The Oxford Encyclopedia of the Islamic World। Oxford University Press.

400 https://en.wikipedia.org/wiki/Expedition_of_Tabuk

বিদায় হজ্জ ও জীবনের শেষ সময়

দাওয়াতের কাজ শেষ হলো। দুনিয়াবাসীর কাছে রিসালত পৌঁছানোর দায়িত্ব সুসম্পন্ন হলো। আল্লাহর একত্ববাদ ও মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর রিসালতের ওপর ভিত্তি করে একটি নতুন সমাজ প্রতিষ্ঠা পর্ব সমাপ্ত হলো। ঠিক সেই মুহূর্তে কোত্থেকে যেন এক অজানা আর অজ্ঞাত গুঞ্জন ধ্বনি ভেসে আসতে লাগল। সে ধ্বনি নিঃশব্দে যেন রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কানে কানে বলে দিচ্ছিল- পৃথিবীতে আপনার মুবারক অবস্থানের মুদ্দত প্রায় শেষ হয়ে এলো; এবার বিদায় যাত্রার আয়োজন করুন! এমনকি দশম হিজরীতে তিনি যখন মুয়ায রা. কে ইয়েমেনে প্রেরণ করছিলেন তখন তিনি তাকে প্রদত্ত ওসীয়তের মধ্যে এমন একটি কথা বলেছিলেন- মুয়ায! এ বছরের পর সম্ভবত তুমি আমাকে আর দেখবে না। বরং সম্ভবত আমার এই মসজিদ আর আমার এই কবরের পাশ দিয়ে গমন করবে!! রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর এ কথা শুনে বিরহ বেদনায় মুয়ায রা. তখন ডুকরে কেঁদে উঠেছিলেন ।এ সময় আল্লাহ তাআলার ইরাদা হলো আপন নবীকে তাঁর দাওয়াতের ফল দেখিয়ে নয়ন জুড়িয়ে দিবেন। দীর্ঘ কুড়ি বছরেরও বেশি সময় যে পথে শত প্রকারের কষ্ট ও মুসিবত সহ্য করেছেন সে পথের ব্যাপ্তি বুঝিয়ে দিবেন । তখন আরবের প্রত্যেকটি কবীলা থেকে মক্কার চারপাশে লোক জড়ো হবে। তারা রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছ থেকে শরীয়ত ও দীনের আহকাম শিখবে। আর রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের থেকে সাক্ষ্য নিবেন যে, তিনি নিজের আমানত পৌঁছে দিয়েছেন। রিসালতের যিম্মাদারি পালন করেছেন।রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মানুষের মাঝে তাঁর এই ঐতিহাসিক হজ্জে মাবরূর আদায় করার ইচ্ছার কথা ঘোষণা করেন। ঘোষণা শুনতে পেয়ে দূর-দূরান্ত থেকে অগণিত অসংখ্য মানুষ রাসূলের নকশে কদম অনুসরণের তামান্না নিয়ে দলে দলে এসে সমবেত হতে শুরু করে।[401] যুল কাদ মাসের পঁচিশ তারিখ শনিবার রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেই ঐতিহাসিক যাত্রার জন্য প্রস্তুত হন।[402] তিনি মাথা চিরুনি করেন, তেল ব্যবহার করেন। নিজের লুঙ্গি ও চাদর পরিধান করেন। অতঃপর কুরবানীর জন্তু সাঁজিয়ে যোহরের নামাযের পরে যাত্রা শুরু করেন। আসরের আগেই যুল হুলাইফা নামক স্থানে আসরের আগে পৌঁছে যান।

---

401 জাবের রা. সূত্রে মুসলিম র. এটা রেওয়ায়েত করেন: হজ্জে রাসূল সা অধ্যায় ১/৩৯৪।

402 তাহকীকের জন্য দেখুন ফাতহুল বারী ৮/১০৪।

সেখানে তিনি আসরের নামায দুই রাকাআত আদায় করেন। অবশিষ্ট দিন এবং রাত সেখানেই অবস্থান করেন। ভোর হলে সাহাবায়ে কেরাম রা. কে লক্ষ্য করে বললেন, আজ রাতে আমার কাছে আমার প্রভুর পক্ষ থেকে একজন বার্তা বাহক এসে বলেছেন, এই মুবারক উপত্যকায় নামায আদায় করুন এবং বলুন হজ্জের সাথে উমরা।[403] অতঃপর যোহরের নামায আদায় করার আগে ইহরামের জন্য গোসল করেন । গোসলের পরে উম্মুল মুমিনীন আয়েশা রা. তাঁর শরীর ও মাথা মুবারকে নিজ হাতে যারীরা ও মেশকের খুশবু লাগিয়ে দেন। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দাড়ি মুবারক এবং মাথার সিঁথায় খুশবুর চমক দেখা যেতে লাগল। কিন্তু রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তা না ধুয়ে রেখে দেন। অতঃপর তিনি লুঙ্গি ও চাদর পরিধান করেন। তারপর যোহরের দুই রাকাআত নামায আদায় করেন। নামাযের পরে জায়নামাযে বসেই হজ্জ ও উমরার জন্য ইহরাম বাঁধেন। অতঃপর তিনি বের হয়ে কসওয়া উষ্ট্রীর পিঠে আরোহণ করলেন এবং আবারও উচ্চনাদে লাব্বাইক পাঠ করলেন। উষ্ট্রীর পিঠে আরোহণ করে মরুভূমিতে পৌঁছে আবারও লাব্বাইক আওয়াজ বুলন্দ করেন।অতঃপর সফর একটানা জারী রেখে মক্কার কাছাকাছি গিয়ে পৌঁছে যু তুয়া নামক স্থানে রাত যাপন করেন। এরপর সেখানে ফজরের নামায ও গোসল সেরে দশম হিজরীর ছাব্বিশে যুলকা'দ মক্কায় প্রবেশ করেন। রাস্তায় তিনি সর্বমোট আট দিন ব্যয় করেন। স্বাভাবিক গতিতে পথ চললে এটাই হলো এ পথের দূরত্ব। মক্কায় পৌঁছে মসজিদে হারামে প্রবেশ করেন এবং কাবা ঘর তওয়াফ করেন। অতঃপর সাফা ও মারওয়ার মাঝে সাঈ করেন। কিন্তু ইহরাম থেকে হালাল হলেন না। কেননা, তিনি হজ্জে কিরানের নিয়ত করেছিলেন। আর সে উদ্দেশ্যে কুরবানীর জানোয়ার সঙ্গে করে নিয়ে এসেছিলেন। অতঃপর মক্কার উচ্চভূমি হাজনে গিয়ে অবস্থান করেন। হজ্জের তওয়াফ ব্যতীত অন্য কোনো তওয়াফ থেকে বিরত থাকেন।অপরদিকে যে সকল সাহাবায়ে কেরামের কাছে হাদী ছিল না তাদেরকে তিনি তাদের ইহরাম উমরার মধ্যে বদল করে, কাবাঘর তওয়াফ এবং সাফা- মারওয়া সাঈ করে পুরোপুরি হালাল হয়ে যাওয়ার নির্দেশ দেন। যেহেতু রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখনো হালাল হচ্ছিলেন না এ জন্য সাহাবায়ে কেরাম ইতস্তত করতে লাগলেন। তিনি তখন তাদেরকে বললেন, পরে যা হয়েছে যদি আমি আগেই জানতে পারতাম তবে কুরবানীর জন্তু সঙ্গে নিয়ে আসতাম না। আর যদি এ কুরবানীর জন্তু আমার সঙ্গে না থাকত তবে

---

403 উমর রা. সূত্রে ইমাম বুখারী র. এর রেওয়ায়েত ১/২০৭।

আমিও হালাল হয়ে যেতাম। তখন যাদের কাছে হাদী (কুরবানীর জন্তু) ছিল না তারা হালাল হয়ে গেলেন। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কথা শুনলেন এবং তাঁর নির্দেশের সামনে মাথা নত করে দিলেন।,যুলহজ্জের অষ্টম তারিখে- ইয়াওমে তারবিয়া- রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মিনা অভিমুখে গেলেন। সেখানে তিনি যোহর, আসর, মাগরিব, ইশা ও ফজর এই পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করেন। অতঃপর সামান্য অবস্থান করার পর যখন সূর্যোদয় হলো তখন তিনি আরাফার ময়দানে চলে গেলেন। সেখানে গিয়ে দেখলেন তাঁর তাঁবু নামিরাতে স্থাপন করা হয়েছে। তখন তিনি তাতে অবরতণ করলেন। অতঃপর দুপুরের সূর্য যখন ঢলে পড়ল তিনি কসওয়াকে প্রস্তুত করতে নির্দেশ দিলেন এবং বাতনে ওয়াদীতে এসে উপস্থিত হলেন। সেখানে তখন এক লাখ চব্বিশ হাজার কিংবা এক লাখ চুয়াল্লিশ হাজার মানুষের এক বিশাল তরঙ্গভঙ্গের মহা সমাবেশ কায়েম হয়েছিল। সেখানে তিনি তাদের মাঝে দাঁড়িয়ে বক্তৃতা করলেন। দুনিয়ার ইতিহাসে সেই দিন তিনি সেই ঐতিহাসিক বক্তৃতায় বিশ্ব সভ্যতাকে দান করে গিয়েছিলেন কতগুলি শাশ্বত সনদ । সুদীর্ঘ দেড় হাজার বছরের পরে আজও যা অম্লান; অক্ষয়:হে লোকসকল! তোমরা আমার কথা শুনে রাখো! কারণ আমি জানি না এরপর আমি তোমাদের সঙ্গে এখানে সম্ভবত কখনো মিলিত হতে পারব না।[404] নিশ্চয়ই তোমাদের জান ও মাল তোমাদের ওপর হারাম; যেমন হারাম তোমাদের আজকের এই দিন, আজকের এই মাস, আজকের এই শহর। মনে রেখো! জাহেলিয়াতের সবকিছু আমার পায়ের নীচে কবর দেওয়া হয়েছে । জাহেলিয়াতের রক্ত বাতিল হয়ে গেছে। আর আমি সর্বপ্রথম রবীআ ইবনে হ্যারিসের- সে বনু সাদে দুধ পান করত আর তখনই বনু হুযাইল তাকে হত্যা করেছিল- রক্ত বাতিল ঘোষণা করছি। জাহেলিয়াতের সমস্ত সুদ বাতিল। আমি সর্বপ্রথম আব্দুল মুত্তালিবের ছেলে আব্বাসের সুদ বাতিল ঘোষণা করছি। এখন এ সকল সুদ বাতিল ।তোমরা নারীদের ব্যাপারে আল্লাহ তাআলাকে ভয় করো। কেননা, তোমরা আল্লাহর আমানতের মাধ্যমে তাদেরকে গ্রহণ করেছ। আর আল্লাহর কালিমা দ্বারা তোমরা তাদের লজ্জাস্থানকে হালাল করে নিয়েছ। তাদের ওপর তোমাদের যে হক্ব রয়েছে তা হলো, তারা যেন তোমাদের বিছানায় এমন কাউকে আসতে না দেয় যাদেরকে তোমরা সহ্য করতে পারো না। যদি তারা এমন করে তবে তাদেরকে শাস্তি দিতে পারো। তবে তা লঘু শাস্তি। আর তোমাদের ওপর তাদের রয়েছে ন্যায়ভাবে খাদ্য ও বস্ত্র পাওয়ার অধিকার।আর আমি তোমাদের

---

404 ইবনে হিশাম ১/৬০৩।

মাঝে এমন একটি জিনিস রেখে যাচ্ছি- যদি তোমরা তাকে আমার পরে শক্ত করে ধরে রাখো, তবে কখনো গোমরাহ হবে না। সেটা হলো আল্লাহর কিতাব।[405] হে লোকসকল। জেনে রেখো- নিশ্চয়ই আমার পরে আর কোনো নবী নেই । তোমাদের পরে আর কোনো উম্মত নেই। সুতরাং, তোমরা তোমাদের রবের ইবাদত করবে। তোমাদের নামাযগুলো আদায় করবে। রমযান মাসে রোযা রাখবে। সন্তুষ্টচিত্তে তোমাদের ধন-সম্পদের যাকাত আদায় করবে। আর তোমাদের রবের ঘরের হজ্জ পালন করবে। তোমরা তোমাদের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গকে মান্য করবে। আর তোমাদের রবের জান্নাতে প্রবেশ করবে।[406] আর তোমাদেরকে আমার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে। তখন তোমরা কী জবাব দিবে? সাহাবায়ে কেরাম রা. বললেন, আমরা সাক্ষ্য দিব- আপনি আপনার রিসালত পৌঁছে দিয়েছেন। আপনার যিম্মাদারি পালন করেছেন। আপনি আমাদেরকে নসীহত করেছেন।তখন তিনি আপন শাহাদাত আঙ্গুল সুনীল দিগন্ত অভিমুখী করে তুলে জনতরঙ্গের দিকে খানিকটা ঝুঁকিয়ে তিন বার বললেন, হে আল্লাহ তুমি সাক্ষী থেকো ![407] রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ঐতিহাসিক ভাষণের অমূল্য এই ইরশাদগুলি যিনি সুউচ্চ কণ্ঠে গোটা ময়দানের মানুষের কাছে পৌঁছে দিচ্ছিলেন তিনি ছিলেন রবীআ ইবনে উমাইয়্যা ইবনে খলফ রা.।[408] রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ভাষণ থেকে ফারেগ হতেই আসমান থেকে ওহী নেমে এলো- "আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দীনকে পরিপূর্ণ করে দিলাম। তোমাদের ওপর আমার নেয়ামতকে পূর্ণ করলাম আর তোমাদের জীবনবিধানরূপে ইসলামকে মনোনীত করলাম।" [সূরা মায়িদাহ:৩]

এ আয়াত নাযিল হলে উমর রা. অঝোর কান্নায় ভেঙে পড়লেন। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কাঁদছ কেন? তিনি বললেন, পূর্ণ হওয়ার পরে এখন অপূর্ণতা ব্যতীত আর তো কিছুই বাকি নেই। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বললেন, তুমি সত্য বলেছ।[409] খুতবা

---

405 সহীহ মুসলিম: হচ্ছে রাসূল সা. ১/৩৯৭।

406 ইবনে জারীর ও ইবনে আসাকির র. এর রেওয়ায়েত। দেখুন মাদানুল আ'মাল হাদীস নং ১১০৮

407 মুসলিম ১/৩৯৭।

408 ইবনে হিশাম ২/৬০৫।

409 ইবনে আবী শাইবা ও ইবনে জারীর তাবারীর রেওয়ায়েত। দেখুন তাফসীরে ইবনে কাসীর ২/১৫। দুররুল মানসুর ২/856।

শেষ হলে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নির্দেশে বেলাল রা. আযান ও ইক্বামাত দিলেন। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উপস্থিত সাহাবায়ে কেরাম রা. কে নিয়ে যোহরের নামায আদায় করলেন। অতঃপর বেলাল রা. আবার ইকামাত দিলেন আর তিনি মানুষকে নিয়ে আসরের নামায আদায় করলেন। আর উভয়ের মাঝে অন্য কোনো নামায আদায় করলেন না। অতঃপর তিনি সওয়ারীতে আরোহণ করে মাওকিফে চলে এলেন এবং কসওয়া উষ্ট্রীর পেট পাথরের ওপর রেখে মুশাত পাহাড়কে (পদাতিক লোকদের চলার পথে উঁচু উঁচু বালিয়াড়ি) সামনে রেখে ক্বিবলার দিকে ফিরে অবস্থান গ্রহণ করলেন। এক পর্যায়ে দিবারাজ অস্তপটে ঢলে পড়ল। বিদায়ের হাতছানি দিয়ে ধীরে ধীরে তার হলদে আভা লুপ্ত হলো। এক সময় তার টিকিটিও সাঁঝের অন্ধকারে তলিয়ে গেল ।অতঃপর তিনি উসামা রা. কে পেছনে বসিয়ে মুযদালিফায় এলেন। সেখানে তিনি এক আযান ও দুই ইক্বামাতে মাগরিব ও ইশার নামায আদায় করলেন। উভয় নামাযের মাঝে আর কোনো নফল নামায আদায় করলেন না। অতঃপর তিনি ঘুমিয়ে গেলেন। সুবহে সাদিক উদিত হওয়ার আগ পর্যন্ত ঘুমালেন। সুবহে সাদিক উদিত হলে তিনি আযান ও ইক্বামাত দিয়ে ফজরের নামায আদায় করলেন। অতঃপর কসওয়ায় আরোহণ করে মাশআরুল হারামে এলেন। সেখানে এসে ক্বিবলামুখী হয়ে দুআ করলেন। তাকবীর দিলেন। তাহলীল পড়লেন। তাওহীদের ঘোষণা দিলেন। চারদিকে খুব ফর্সা হওয়ার আগ পর্যন্ত সেখানেই অবস্থান করলেন।অতঃপর সূর্যোদয়ের আগেই মুযদালিফা থেকে মিনার দিকে রওয়ানা হলেন। ফযল ইবনে আব্বাসকে পেছনে বসিয়ে বাতনে মুহাসসির পর্যন্ত এসে সওয়ারীকে খানিকটা দ্রুত ছুটালেন। অতঃপর মাঝের রাস্তাটি বেছে নিয়ে জামরায়ে কুবরাতে চলে এলেন। তখনকার সময়ে সেখানে একটি গাছ ছিল। আর এ জামরার নাম ছিল জামরায়ে আকাবা বা জামরায়ে উলা। সেখানে তিনি সাতটি কঙ্কর নিক্ষেপ করলেন। প্রত্যেক কঙ্কর নিক্ষেপের সময় তিনি তাকবীর দিতেন। কঙ্করগুলি ছিল ছোট নুড়ি পাথরের মতো। আঙ্গুলের মধ্যে ঢুকিয়ে তা নিক্ষেপ করা যেত। কঙ্করগুলি তিনি বাতনে ওয়াদী থেকে নিক্ষেপ করেছিলেন। অতঃপর তিনি পশু কুরবানীর জায়গায় এলেন এবং নিজের হাতে তেষট্টিটি জন্তু কুরবানী করলেন। অতঃপর যা কিছু বাকি ছিল সেগুলি যবাই করার জন্য আলী রা. কে নির্দেশ দিলেন। বাকি ছিল সাইত্রিশটি। এই ছিল মোট একশ' জন্তু। আলী রা. কে তিনি হাদীর (কুরবানীর জন্তু) মধ্যে শরীক করেছিলেন।

অতঃপর রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নির্দেশে প্রত্যেক উট থেকে এক টুকরা করে গোশত কেটে পাকানো হলো। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও আলী রা. কিছু গোশত ও ঝোল খেলেন।|অতঃপর সওয়ারীতে চড়ে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মক্কায় চলে এলেন। কাবা ঘর তওয়াফ করলেন। এটা 'তওয়াফে ইফাযা' নামে পরিচিত। মক্কাতেই যোহরের নামায আদায় করলেন। অতঃপর তিনি যমযম কূপের পাড়ে বনু আব্দুল মুত্তালিবের লোকদের কাছে গেলেন। তারা তখন হাজীদেরকে পানি পান করাচ্ছিল। তিনি তাদের উদ্দেশে বললেন, তোমরা পানি উঠাতে থাকো ! যদি আমার এ আশঙ্কা না হতো যে, লোকেরা পানি ওঠানোর ক্ষেত্রে তোমাদেরকে পেছনে ঠেলে দিবে তবে আমিও তোমাদের সঙ্গে পানি উঠাতাম। (অর্থাৎ রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যদি পানি ওঠানো শুরু করেন তবে সাহাবায়ে কেরামও ছুটে এসে তাঁর সঙ্গে পানি উঠাতে থাকবেন। আর তখন বনু আব্দুল মুত্তালিবের যে এ ক্ষেত্রে একটি বিশেষ ফযীলত ছিল এত লোকদের মাঝে তাকে আর তারা ধরে রাখতে পারবে না। এ কারণে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজের হাতে পানি ওঠানো থেকে নিবৃত্ত থাকলেন) বনু আব্দুল মুত্তালিব তখন রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে এক বালতি পানি দিলো তিনি তা থেকে প্রয়োজনমতো পান করলেন।[410] আজ ছিল যুল হজ্জের দশ তারিখ তথা কুরবানীর দিন। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আজও চাশতের সময় সাহাবায়ে কেরামের উদ্দেশে একটি ভাষণ দিলেন। এ সময় তিনি একটি খচ্চরের ওপর সওয়ার ছিলেন। আলী রা. তাঁর কথা সাহাবায়ে কেরামের কাছ পৌছিয়ে দিচ্ছিলেন। তাদের অনেকে দাঁড়িয়ে ছিলেন আবার অনেকে ছিলেন বসা।[411] গত কাল তিনি আরাফার ময়দানে যা বলেছিলেন আজকের ভাষণেও সেই কথাগুলিরই পুনরুক্তি করলেন। ইমাম বুখারী ও মুসলিম রহ. আবু বুকরা রা. থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, তিনি বলেন, কুরবানীর দিন রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের উদ্দেশে প্রদত্ত খুতবায় বলেছিলেন: আল্লাহ তাআলা যেদিন আসমান আর যমিন সৃষ্টি করেছিলেন সেদিন থেকেই আপন স্বভাব অনুযায়ী কালের . বিবর্তন চলছে। এক বছরে রয়েছে বারোটি মাস। তার মধ্যে চারটি হলো হারাম। তিনটি ধারাবাহিক তথা যুল

---

410 জাবের রা. সূত্রে মুসলিমের রেওয়ায়েত। হচ্ছে রাসূল অধ্যায় ১/৩৯৭-৪০০।

411 আবু দাউদ: কুরবানীর দিন কোন্ সময় খুতবা দিবে অধ্যায় ১/২৭০।

কা'দ, যুল হজ্জ ও মুহাররম। আর জুমাদাল উখরা ও শা'বানের মাঝে রজবে মুযার ।তিনি আরও বললেন, এটা কোন্ মাস? আমরা বললাম, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই ভালো জানেন। তখন তিনি কিছুক্ষণ চুপ রইলেন। আমরা ভাবলাম, তিনি হয়তো এ মাসের অন্য কোনো নাম বলবেন। অতঃপর তিনি বললেন, এটা কি যুল হজ্জ মাস নয়? আমরা বললাম হাঁ। তিনি বললেন, এটা কোন্ শহর? আমরা বললাম, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই ভালো জানেন। তখন তিনি কিছুক্ষণ চুপ থাকলেন। আমরা ধারণা করলাম তিনি হয়তো এ শহরের অন্য কোনো নাম রাখবেন। অতঃপর তিনি বললেন, এটা কী (মক্কা) নগরী নয়? আমরা বললাম, হাঁ। অতঃপর তিনি বললেন, এটা কোন দিন? আমরা বললাম, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই ভালো জানেন। অতঃপর তিনি কিছুক্ষণ নীরব থাকলেন। আমাদের ধারণা হলো তিনি এর অন্য কোনো নাম দিবেন। অতঃপর তিনি বললেন, এটা কি কুরবানীর দিন নয়? আমরা বললাম, হাঁ। তিনি বললেন, তোমাদের রক্ত, তোমাদের মাল, তোমাদের ধন-সম্পদ পরস্পরের ওপর ঠিক তেমন হারাম, যেমন হারাম তোমাদের আজকের এই দিন, তোমাদের এই শহর, তোমাদের এই মাস!'আর অতি শীঘ্রই তোমরা তোমাদের রবের সামনে হাযির হবে। আর তখন তিনি তোমাদের সমস্ত আমল সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করবেন। তাই সাবধান! আমার পরে তোমরা গোমরাহীতে ডুবে যেও না! এমন যেন না হয় তোমাদের একজন আরেকজনের মাথা কাটতে শুরু করে দিয়েছ।আমি কি তোমাদের কাছে পৌঁছে দিয়েছি? সাহাবায়ে কেরাম বললেন, হাঁ । তিনি বললেন, আল্লাহ তুমি সাক্ষী থেকো! উপস্থিতরা যেন অনুপস্থিতদের নিকট (আমার এ বাণী) পৌছিয়ে দেয়। কারণ, অনেক সময় যার কাছে পৌঁছানো হয় সে (উপস্থিত) শ্রোতার চেয়ে আরও সুন্দর করে বুঝতে পারে।[412] অপর এক বর্ণনায় এসেছে, তিনি সেই খুতবায় আরও বলেন, প্রত্যেক অপরাধী তার নিজের বিরুদ্ধেই অপরাধ করে (অর্থাৎ অপরাধের দায়ভার স্বরূপ এর খেসারত তার নিজেকেই দিতে হয়) আর জেনে রেখো। কেউ তার পুত্রের বিরুদ্ধে কিংবা কোনো পুত্র তার বাপের বিরুদ্ধে অপরাধ করে না (অর্থাৎ পিতার অপরাধের জন্য পুত্রকে কিংবা পুত্রের অপরাধের জন্য পিতাকে অপরাধী সাব্যস্ত করা যাবে না)। মনে রেখো। শয়তান নিরাশ হয়ে গেছে যে, তোমাদের এ ভূখণ্ডে আর কোনোদিনও তার পূজা করা হবে না। কিন্তু (তার একটি আশা রয়ে গেছে যে,) তোমরা তুচ্ছ মনে করে এমন কিছু কাজ করবে,

412 সহীহ বুখারী: মীনা দিবসের খুতবা অধ্যায় ১/২৩৪।

যাতে তার আনুগত্য হয়ে যাবে। আর তখন সে পরিতৃপ্তি লাভ করবে।[413] আইয়্যামে তাশরীকের দিনগুলি তিনি মিনায় কাটালেন। এ সময় তিনি হজ্জের আহকাম পালন করেন, লোকেরদেরকে শরীয়তের শিক্ষাদীক্ষা দান করেন'। আল্লাহর কথা মনে করিয়ে দেন। মিল্লাতে ইবরাহীমীর সুন্নাতগুলো আদায় করেন। শিরকের ধ্বংসাবশেষ আর রয়ে যাওয়া চিহ্নগুলি মিটিয়ে দেন । ইমাম আবু দাউদ র. হাসান সনদে সাররা বিনতে নাবহান রা. থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে রুউসের দিন তথা ১২ই যিলহজ্জ একটি খুতবা দেন। সেই খুতবায় তিনি বলেন, এটা কি আইয়ামে তাশরীকের মধ্যবর্তী দিন নয়?[414] এদিন তিনি কুরবানীর দিনের খুতবার কথাগুলোই আবার বলেছিলেন। এই খুতবার আগেই সূরা নসর অবতীর্ণ হয়েছিল।দ্বিতীয় ইয়াওমুন নফর তথা যুল হজ্জের তেরো তারিখ রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মিনা থেকে যাত্রা করেন। সেখান থেকে তিনি আবতাহ উপত্যকায় খাইফে বনু কেনানায় অবতরণ করেন। সেদিনের বাকি সময়টুকু ও রাত তিনি সেখানেই কাটান। সেখানে তিনি যোহর, আসর, মাগরিব ও ইশার নামায আদায় করেন। এরপর খানিকটা নিদ্রা গ্রহণ করেন। অতঃপর উঠে বাইতুল্লাহর দিকে গমন করেন। সেখানে গিয়ে তিনি বিদায়ী তওয়াফ করেন। মানুষদেরকেও তিনি বিদায়ী তওয়াফের নির্দেশ দেন।একে একে হজ্জের সকল হুকুম-আহকাম পালন করা হয়ে গেল। সাহেবে রিসালতকে নিয়ে সওয়ারী এবার মদীনা মুনাওয়ারার পথে পা বাড়ালো। উদ্দেশ্য নিজের ঘরে গিয়ে খানিকটা বিশ্রাম গ্রহণ কিংবা একটুখানি শান্তির পরশ খোঁজা ছিল না; বরং উদ্দেশ্য ছিল আল্লাহর জন্য সংগ্রামের এক নতুন পথে ধাবিত হওয়া। ফী সাবীলিল্লাহর এক নয়া দিগন্তে অশ্ব নিয়ে ছোটা।[415]

সর্বশেষ সামরিক অভিযান

অসম অহঙ্কারের প্রচণ্ড ধোঁয়ায় রোমান সাম্রাজ্যের চোখ পুরোপুরি অন্ধ হয়ে গিয়েছিল। তার আদালতের রায় ছিল- যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান নিয়ে আসবে তাদের এ পৃথিবীতে বেঁচে থাকার কোনো অধিকার নেই। যে ব্যক্তিই ইসলাম গ্রহণ

---

413 তিরমিযী ২/৩৮, ১৩৫। ইবনে মাজাহ হজ্জের অধ্যায়ে। দেখুন মিশকাতুল মাসাবীহ ১/২৩৪।

414 আবু দাউদ। মীনায় কোন্ খুতবা দিবে অধ্যায় ১/২৬৯।

415 হচ্ছে রাসুলের বিস্তারিত বিবরণ দেখুন সহীহ বুখারী: কিতাবুল মানাসিক ১ম খণ্ড ও ২/৬৩১। সহীহ মুসলিম হচ্ছে রাসুল অধ্যায়। ফাতহুল বারী ৩য় খণ্ড, কিতাবুল মানাসিকের ব্যাখ্যা ও ৮/১০৩-১১০। ইবনে হিশাম ২/৬০১-৬০৫। যাদুল মাআদ ১/১৯৬, ২১৮-২৪০।

করবে তার পুরষ্কার হবে মৃত্যুদণ্ড। যেমন সে মাআনের গভর্নর ফারওয়া ইবনে আমর জুযামীর ব্যাপারে এই রায় কার্যকর করেছিল।তার এই অহঙ্কারের সমুচিত শাস্তি দেওয়ার নিমিত্ত একাদশ হিজরীর সফর মাসে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একটি বিশাল বাহিনী প্রস্তুত করেন। এ বাহিনীর আমীর বানিয়ে দেন উসামা বিন যায়েদ বিন হারেসা রা. কে তাকে তিনি নির্দেশ দেন বলকা আর ফিলিস্তীনের দারূমের মাটিতে অশ্বক্ষুরের প্রচণ্ড ধূলিঝড় আকাশে বাতাসে ছড়িয়ে দিয়ে আসতে। যাতে রোমানদের অন্তরে মুসলিম ভীতির সৃষ্টি হয়। রোমান সীমান্তবর্তী আরবকবীলাগুলির আস্থা ফিরে আসে। যাতে করে কেউ এ ধারণা করে না বসে যে, গির্জার হুমকি-ধমকি আর অন্যায় জারির সম্মুখে দুনিয়ার কারও দাঁড়িয়ে কথা বলার সাহস নেই। আর ইসলাম গ্রহণের অর্থ কেবল নিজের মৃত্যুর পথ সুগম করা নয় ।সাহাবায়ে কেরামের অনেকে মুসলিম বাহিনীর সিপাহসালার উসামা বিন যায়দের তারুণ্য ও বয়সের অপরিপক্কতা নিয়ে বিভিন্ন কথাকথি করলেন এবং এ অভিযানে অংশগ্রহণ থেকে বিলম্ব করলেন। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন বললেন, যদি তোমরা তার আমীর হওয়ার ব্যাপারে আমার কাছে প্রশ্ন তুলে থাকো তবে তোমরা তো তার বাপ যায়দের আমীর হওয়া নিয়েও প্রশ্ন তুলেছিলে। আল্লাহর কসম! নিশ্চিতভাবেই সে আমীর হওয়ার যোগ্য ছিল। সে ছিল আমার সবচেয়ে প্রিয় ও কাছের মানুষের একজন। আর তার পরে (তার ছেলে) সেও আমার প্রিয় মানুষদের একজন।[416] রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর এ বক্তব্য শুনে সাহাবায়ে কেরাম উসামা রা. এর চারপাশে দৌড়ে আসতে লাগলেন। দ্রুত তারা প্রস্তুত হয়ে রওয়ানা করেন এবং মদীনা থেকে তিন মাইল দূরে জুফ নামক স্থানে তাঁবু ফেললেন। কিন্তু রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর চরম অসুস্থতার সংবাদ তাদেরকে সামনে অগ্রসর হতে দিলো না। তাই তারা সেখানেই আল্লাহর ফয়সালার অপেক্ষায় বসে থাকলেন। আর আল্লাহর ফয়সালা ছিল এই যে, এটা হবে আবু বকর সিদ্দীক রা. এর খেলাফত কালের সর্বপ্রথম সামরিক অভিযান।[417]

416 সহীহ বুখারী: রাসূলে কারীম সা. কর্তৃক উসামাকে প্রেরণ অধ্যায় ২/৬১২।

417 প্রাগুক্ত এবং ইবনে হিশাম ২/৬০৬, ৬৫০।

বিদায়ের পূর্বাভাস

যখন আল্লাহর যমিনে আল্লাহর দাওয়াতের গুরুত্বপূর্ণ মিশন সফলভাবে সম্পন্ন হলো। গোটা পরিবেশ-পরিস্থিতির ওপর ইসলামের একচ্ছত্র আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হলো। ঠিক তখনই দুনিয়ার সর্বশ্রেষ্ঠ এ মিশনের কেন্দ্রবিন্দু এ মহা নায়কের পবিত্র জীবনে ধীরে ধীরে বিদায়ের লক্ষণ ভেসে উঠতে শুরু করল। তাঁর অনুভূতি, তাঁর চলা-ফেরা, তাঁর কথা-বার্তা সবকিছু থেকে চির বিরহের একটা অস্ফুট আর্ত হাহাকার বেরিয়ে আসতে লাগল। যেন তিনি এখন সবকিছুতে তার সারা জীবনের সঙ্গীদেরকে চির বিয়োগের এক দুঃখময় বার্তা হাতে গুজে দিচ্ছিলেন।দশম হিজরীর রমযান মাসে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিশ দিন ইতেকাফ করলেন। অথচ সচরাচর ও সাধারণত প্রতি বছর রমযানে তিনি দশ দিন ইতেকাফ করতেন। এ রমযানে জিবরাঈল আ. তাঁর সঙ্গে দুই বার কুরআন শরীফ দাওর করলেন। অথচ এর আগে প্রতিবছর এক বার করতেন। তা ছাড়া রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিদায় হজ্জের সেই ঐতিহাসিক ভাষণে বলেছিলেন, আমি জানি না, সম্ভবত এ বছরের পর এ জায়গায় আমি আর তোমাদের সঙ্গে কখনো মিলিত হবো না। জামারায়ে আক্বাবায় তিনি বলেছিলেন, আমার কাছ থেকে তোমরা হজ্জের বিধানাবলী শিখে নাও! সম্ভবত এ বছরের পরে আমার আর হজ্জ করা হবে না। হজ্জের সময়ই আইয়্যামে তাশরীকে মাঝের দিনে তাঁর ওপর অবতীর্ণ হয়েছিল সূরা নসর। তখন এর দ্বারা তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে, এখন তাঁর দুনিয়া থেকে চলে যাওয়ার সময় হয়ে গেছে। আর এটা তাঁর ওফাতের আগাম বার্তা ।একাদশ হিজরীর সফর মাসের গোড়ার দিকে একদিন রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উহুদ প্রান্তরে গেলেন। সেখানে তাদের জন্য তিনি এমনভাবে দুআ করলেন, যেন তিনি জীবিত ও মৃতদের কাছ থেকে বিদায় গ্রহণ করছিলেন। অতঃপর তিনি ফিরে এসে মিম্বরে তাশরীফ নিয়ে বললেন, আমি তোমাদের অর্থের প্রেরণ; আর আমি তোমাদের জন্য সাক্ষী। আল্লাহর কসম! এখন আমি আমার হাউয (হাউযে কাওসার) দুচোখে দেখতে পাচ্ছি। ভূপৃষ্ঠের সকল ধনভাণ্ডারের (অপর এক বর্ণনায় ভূপৃষ্ঠের) চাবিসমূহ আমার হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। আল্লাহর কসম! আমার ভয় হয় না যে, তোমরা আমার পরে শিরকে লিপ্ত হয়ে পড়বে। কিন্তু আমার ভয় হয় যে, দুনিয়ার পেছনে তোমরা একে অন্যের সঙ্গে প্রতিযোগিতায়

লিপ্ত হয়ে পড়বে।[418] এই মুহাররম মাসের মাঝের দিকে এক রাতে তিনি ঘর ছেড়ে জান্নাতুল বাকী' গোরস্তানে চলে গেলেন। সেখানে গিয়ে তিনি কবরবাসীদের জন্য মাগফিরাতের দুআ করলেন। অতঃপর তাদেরকে লক্ষ্য করে বললেন, হে কবরবাসী। তোমাদের ওপর শান্তি বর্ষিত হোক!! মানুষ যে অবস্থায় আছে তার চেয়ে তোমাদের ঐ অবস্থা মুবারক হোক যে অবস্থায় তোমরা আছো। ঘনঘোর নিশার মতো একটার পর একটা ফিতনা পৃথিবীতে ধেয়ে আসছে। আর তার আগেরটির চেয়ে পরেরটি হচ্ছে আরও মারাত্মক ও ভয়াবহ। অতঃপর তাদেরকে তিনি সুসংবাদ জানালেন : অতি শীঘ্রই আমি তোমাদের সঙ্গে এসে মিলিত হচ্ছি।অন্তিম যাত্রার সূচনাএকাদশ হিজরীর সফর মাসের আটাশ কিংবা ঊনত্রিশ তারিখ সোম বার রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জান্নাতুল বাকীতে একটি জানাযায় উপস্থিত হন। জানাযা শেষে যখন তিনি বাড়ি ফিরছিলেন তখন পথিমধ্যেই তাঁর মাথা ব্যথা শুরু হয়। ধীরে ধীরে তাঁর শরীরের উত্তাপ সহ্যসীমা অতিক্রম করে যেতে থাকে। এমনকি মাথার ওপর রাখা ভেজা পটির ওপর দিয়েও প্রবল উত্তাপ অনুভূত হতে থাকে। মূলত এখান থেকেই শুরু হয়েছিল তাঁর অন্তিম যাত্রা ।অসুস্থ অবস্থাতেই রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এগারো দিন সাহাবায়ে কেরামকে নিয়ে জামাআতের সঙ্গে নামায আদায় করেন। অসুস্থতার সর্বমোট মুদ্দত ছিল তেরো কিংবা চৌদ্দ দিন।আখেরী সাত দিনধীরে ধীরে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর অসুস্থতা প্রকোপ আরও বৃদ্ধি পেল। তখন তিনি নিজ স্ত্রীদেরকে বার বার জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন, আগামী কাল আমি কোথায় থাকব? আগামী কাল আমি কোথায় থাকব ? তখন স্ত্রীগণ পরম বিচক্ষণতার প্রমাণ দিয়ে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর তামান্না বুঝতে পারলেন। সবাই তাকে যেখানে ইচ্ছা থাকার অনুমতি দিলেন। তখন রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফযল ইবনে আব্বাস এবং আলী ইবনে আবী তালিব রা. এর কাঁধে ভর করে মাথা মুবারকে পটি বাঁধা অবস্থায় পা মাটিতে টেনে টেনে আয়েশা রা. ঘরে গেলেন। অতঃপর আয়েশা রা. এর ঘরেই জীবনের আখেরী সপ্তাহটি কাটালেন রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ।আয়েশা রা. এ দিনগুলিতে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছ থেকে আগে যে সকল দুআ আর তাসবীহ মুখস্থ করেছিলেন সেগুলি পড়ে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া

418 বুখারী ও মুসলিম। সহীহ বুখারী ২/৫৮৫। ফাতহুল বারী ৩/২৪৮, হাদীস নং ১৩৪৪, ৩৫৯৬, ৪০৪২, ৪০৮৫, ৬৪২৬, ৬৫৯০। মুসলিম: ফাযাইল, নবীজীর হাউযে কাওসার ও তাঁর গুণাবলী - সাবেতকরণ অধ্যায়- ৪ / ১৭৯৫, হাদীস নং ২২৯৬।

সাল্লাম এর দেহ মুবারকে ফুঁক দিতেন এবং বরকতের উদ্দেশ্যে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর হাতই তাঁর দেহ মুবারকে বুলাতেন ।ওফাতের পাঁচ দিন আগেওফাতের পাঁচ দিন আগে বুধবার রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর শরীরে জ্বরের তাপ-উত্তাপ পূর্বের চেয়ে আরও বেড়ে গেল। মারাত্মক ব্যথা আর বেদনায় তিনি অবচেতন হয়ে পড়ার উপক্রম করলেন। তখন তিনি ইরশাদ করলেন, বিভিন্ন কূপ থেকে সাত মশক পানি এনে আমার ওপর ঢালো। আমি লোকদের কাছে গিয়ে কয়েকটি অসীয়ত করব!! তখন রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে একটি তশতরিতে বসানো হলো। অতঃপর তাঁর ওপর পানি ঢালা শুরু হলো। এক পর্যায়ে তিনি বললেন, যথেষ্ট হয়েছে! যথেষ্ট হয়েছে!!এ সময় রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কিছুটা সুস্থতা বোধ করতে লাগলেন। তখন তিন মসজিদের দিকে এগিয়ে গেলেন। মাথায় তখনো পটি বাঁধা ছিল। মসজিদে গিয়ে তিনি মিম্বরে বসে পড়লেন। এটাই ছিল নবী জীবনের সর্বশেষ মজলিস। প্রথমে আল্লাহর প্রশংসা ও গুণকীর্তনের পর তিনি বললেন, হে লোকসকল! তোমরা আমার আরও কাছে চলে এসো! সাহাবায়ে কেরাম দ্রুত তাঁর কাছে এগিয়ে গেলেন। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন যা ইরশাদ করেছিলেন তন্মধ্যে কিছু বাণী ছিল এই: ইহুদি ও নাসারাদের ওপর আল্লাহর অভিসম্পাত; কেননা তারা তাদের আম্বিয়ায়ে কেরামের কবরকে সেজদার স্থানে পরিণত করেছে! অপর এক বর্ণনায় রয়েছে, ইহুদি ও নাসারাদেরকে আল্লাহ তাআলা ধ্বংস করে দিন। তারা তাদের নবীদের কবরকে সেজদার স্থান বানিয়ে নিয়েছে।[419] অতঃপর তিনি আরও বললেন, তোমরা আমার কবরকে মূর্তি বানাবে না- যার পূজা করা হবে।[420] যদিঅতঃপর তিনি নিজেই নিজেকে কিসাসের জন্য পেশ করে বললেন, যদি আমি কারও পিঠে চাবুক মেরে থাকি, তবে এই আমার পিঠ উপস্থিত; সে তার প্রতিশোধ নিয়ে নেয় যেন! যদি আমি কারও ইয্যত-আবরু নষ্ট করে থাকি তবে এই তো আমার ইয্যত-আবরু; সে যেন তার প্রতিশোধ নিয়ে নেয়।।অতঃপর তিনি মিম্বর থেকে অবতরণ করে যোহরের নামায আদায় করলেন। অতঃপর ফিরে গিয়ে আবার মিম্বরে তাশরীফ নিলেন। দুশমনি ইত্যাদি সম্পর্কে ব্যক্ত কথাগুলিরই আবার পুণরোক্তি করলেন। তখন এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বলল, আপনার কাছে আমার তিন দিরহাম পাওনা আছে। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি

---

419 সহীহ বুখারী ১/৬২। মুয়াত্তা ইমাম মালিক পৃষ্ঠা ৩৬০।

420 মুয়াত্তা ইমাম মালিক পৃষ্ঠা ৬৫।

ওয়া সাল্লাম বললেন, ফযল! তার পাওনা মিটিয়ে দাও !! অতঃপর তিনি বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে আনসারদের সম্পর্কে ওসীয়ত করলেন:আমি তোমাদেরকে আনসারদের সম্পর্কে ওসীয়ত করছি। কেননা, তারা আমার কলব ও কলিজা। তারা তাদের যিম্মাদারি যথাযথভাবে পালন করেছে। কিন্তু তাদের পাওনা এখনো দেওয়া বাকি রয়ে গেছে। সুতরাং তাদের সৎকর্মশীলদেরকে গ্রহণ করবে আর তাদের অসৎকর্মশীলদেরকে ক্ষমা করে দিবে। অপর এক বর্ণনায় রয়েছে তিনি বলেন, মানুষ বাড়তে থাকবে। আর আনসারদের সংখ্যা কমতে থাকবে। এক পর্যায়ে তারা খাবারের ভেতরে লবণের মতো হয়ে পড়বে। সুতরাং, তোমাদের যে কেউ কোনো কল্যাণ কিংবা অকল্যাণের কাজের দায়িত্বে নিযুক্ত হও তখন তাদের সৎকর্মশীলদেরকে কবুল করে নিবে আর অসৎকর্মীদেরকে ক্ষমা করে দিবে।[421] অতঃপর রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, আল্লাহ তাআলা তাঁর এক বান্দাকে ইখতিয়ার দিয়েছেন, সে চাইলে দুনিয়ার চাকচিক্য ও শোভা-সৌন্দর্য গ্রহণ করতে পারে কিংবা তাঁর কাছে যা আছে তা বেছে নিতে পারে, তখন আল্লাহর সেই বান্দা তাঁর প্রভুর কাছে যা আছে তাকেই বেছে নিয়েছে। আবু সাঈদ খুদরী রা. বলেন, রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর এ কথা শুনে আবু বকর রা. কাঁদতে লাগলেন এবং বললেন, আমার পিতামাতা আপনার ওপর কুরবান হোক। আমরা তখন দারুণ বিস্ময়বোধ করলাম। লোক জন বলতে লাগল, এই বৃদ্ধের অবস্থা দেখো- রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তো এক বান্দা সম্পর্কে বলছেন যে, আল্লাহ তাআলা তাকে দুনিয়ার জাঁকজমক আর তাঁর কাছে যা কিছু রয়েছে এ দু'টির কোনো একটি বেছে নিতে বলেছেন। অথচ, সে বলছে, আমার পিতা-মাতা আপনার ওপর কুরবান হোক। (কিন্তু কয়েক দিন পরে স্পষ্ট হয়ে গেল যে,) সেই বান্দা ছিলেন স্বয়ং রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। আর তখন আমরা বুঝতে পারলাম যে, আবু বকর রা. ছিলেন আমাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বেশি জ্ঞানী।[422] অতঃপর রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, বন্ধুত্ব আর ধন-সম্পদের ক্ষেত্রে আবু বকর আমার ওপর সকল মানুষের চেয়ে বড় অনুগ্রহশীল। আমার রব ব্যতীত আর যদি কাউকে আমি পরম বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করতাম তবে আবু বকরকে সেই পরম বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করতাম। কিন্তু (তার সঙ্গে) আমার ইসলামের ভ্রাতৃত্ব আর মহব্বত রয়েছে। মসজিদে যতগুলি দরজা রয়েছে

---

421 সহীহ বুখারী ১/৫৩৬।

422 বুখারী ও মুসলিম। মিশকাতুল মাসাবীহ ২/৫৪৬।

সবগুলি দরজা যেন অবশ্যই বন্ধ করে দেওয়া হয়। কেবল আবু বকরের দরজাটিই যেন খোলা থাকে।[423] ওফাতের চার দিন আগেওফাতের চার দিন আগে বৃহস্পতিবার রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর অসুস্থতা আবার বেড়ে গেল। তিনি বললেন, এসো! আমি তোমাদেরকে কিছু লিখে দিই- যার পরে তোমরা কখনো গোমরা হবে না। ঘরে তখন অনেক সাহাবায়ে কেরামের সঙ্গে উমরও রা. ছিলেন। উমর রা. তখন লোকদেরকে লক্ষ্য করে বললেন, রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বেদনা আরও বৃদ্ধি পেয়েছে। তোমাদের কাছে তো আল্লাহর কিতাব কুরআন আছে। আল্লাহর কিতাবই তোমাদের জন্য যথেষ্ট। তখন ঘরে যারা ছিল তাদের মধ্যে চরম মতবিরোধ ও বাকবিতণ্ডা শুরু হয়ে গেল। তাদের কেউ কেউ বলতে লাগল, তোমরা রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছে যাও ! তিনি তোমাদেরকে লিখে দিবেন। আবার কেউ কেউ উমর রা. এর কথা বলতে লাগল। এভাবে যখন তাদের বাকবিতণ্ডা আরও বেড়ে গেল তখন রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, আমার কাছ থেকে সবাই চলে যাও ![424] ঐ দিন আরও তিনটি ওসীয়ত করলেন: প্রথমে তিনি ইহুদি, নাসারা ও মুশরিকদেরকে জাযীরাতুল আরব থেকে বের করে দেওয়ার নির্দেশ দিলেন। দ্বিতীয়তঃ তিনি মদীনায় আগত প্রতিনিধিদলকে সেভাবে উপঢৌকন দিতে বললেন যেভাবে তিনি দিতেন। আর তৃতীয়টির কথা বর্ণনাকারী ভুলে গেছেন। সম্ভবত তা ছিল আল্লাহর কিতাব ও সুন্নাতকে মজবুতির সঙ্গে আকড়ে ধরার নির্দেশ অথবা উসামা বাহিনী প্রেরণ কিংবা তা ছিল নামায ও তোমাদের দাস-দাসী। অর্থাৎ নামায ও দাস-দাসীর প্রতি লক্ষ্য রেখো!

আরও কয়েকদিন আগ থেকেই মারাত্মক অসুস্থতা সত্ত্বেও রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিয়মিত মসজিদে গিয়ে সাহাবায়ে কেরাম রা. কে নিয়ে জামাতে নামায আদায় করতেন। এ ধারাবাহিকতা চলল আজকের দিন তথা ওফাতের চার দিন আগে বৃহস্পতিবার পর্যন্ত। এ দিন তিনি মসজিদে মাগরিবের নামায পড়ান এবং তাতে সূরা মুরসালাত তেলাওয়াত করেন।[425] উঠে মসজিদে ইশার সময় অসুস্থতা আরও বেড়ে যায়। অবস্থা এমন হয়, যাওয়ার শক্তি হারিয়ে ফেলেন। আয়েশা রা. বলেন, রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন জিজ্ঞাসা করেন, লোকজন কি

423 সহীহ বুখারী ১/৫১৬।

424 সহীহ বুখারী ১/২২, ৪২৯, ৪৪৯, ২/৬৩৮।

425 উম্মে ফযল থেকে বুখারী র. রেওয়ায়েত করেছেন এ হাদীসটি রাসূলে কারীম সা. এর পীড়া অধ্যায়- ২/৬৩৭।

নামায পড়ে ফেলেছে? আমরা বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! না। তারা আপনার অপেক্ষা করছে। তিনি বললেন, তশতরিতে আমার জন্য পানি দাও! তখন আমরা তাতে পানি দিলাম। তিনি তখন গোসল করলেন। অতঃপর তিনি উঠে যাওয়ার ইচ্ছা করলেন কিন্তু অবচেতন হয়ে পড়ে গেলেন। খানিক পরে হুঁশ ফিরে এলে তিনি বললেন,লোকজন কি নামায পড়ে ফেলেছে? তখন আমরা একই জবাব দিলাম। তিনি গোসল করে উঠতে গিয়ে দ্বিতীয় বার পড়ে গেলেন। তৃতীয়বারও একই অবস্থা হলো। তখন তিনি আবু বকর রা. এর কাছে সংবাদ পাঠালেন তিনি যেন লোকদেরকে নিয়ে নামায পড়ান। তখন আবু বকর রা. নামায পড়ালেন। এরপর থেকে আবু বকর রা. রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জীবদ্দশায় মোট সতেরো ওয়াক্ত[426] নামাযের ইমামতি করেন। বৃহস্পতিবারের ইশার নামায। সোমবারের ফজরের নামায। মাঝখানে শুক্র, শনি ও রবি এই তিন দিনের পাঁচ ওয়াক্ত করে পনেরো ওয়াক্ত নামায।[427] এদিকে আয়েশা রা. আবু বকর রা. কে ইমামতি থেকে বিরত রাখতে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছে তিন থেকে চার বার আবেদন করলেন। যাতে মানুষ তাঁর সম্পর্কে বদগুমানী না করে।[428] কিন্তু রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার আবেদন নাকচ করে দিয়ে বলেন, তোমরা তো সবাই ইউসুফের সেই মহিলাগুলো! আবু বকরকে লোকদের নিয়ে নামায পড়ার নির্দেশ দাও!![429]

ওফাতের তিন দিন আগে

জাবের রা. বলেন, আমি রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে ওফাতের তিন দিন আগে বলতে শুনেছি, সাবধান! তোমাদের কেউ যেন আল্লাহর প্রতি সুধারণা পোষণ ব্যতীত মৃত্যুবরণ না করে।[430]

ওফাতের এক দিন বা দুই দিন আগে

---

426 বুখারী ও মুসলিম। মিশকাতুল মাসাবীহ ১/১০২।

427 বুখারী, ফাতহুল বারী ২/১৯৩, হাদীস নং ৬৮১। মুসলিম: নামায পর্ব ১/৩১৫, হাদীস নং ১০০। মুসনাদে আহমদ ৬/২২৯।

428 দেখুন বুখারী, ফাতহুল বারী ৭/৭৪৭, হাদীস নং ৪৪৪৫। মুসলিম নামায পর্ব ১/৩১৩, হাদীস নং৯৩, ৯৪।

429 সহীহ বুখারী ১/৯৯।

430 তাবাকাতে ইবনে সা'দ ২/২৫৫। মুসনাদে আবু দাউদ ত্বয়ালেসী পৃষ্ঠা ২৪৬, হাদীস নং ১৭৭৯। মুসনাদে আবু ইয়া'লা ৪/১৯৩, হাদীস নং ২২৯০।

শনি বা রবিবার রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কিছুটা শারীরিক সুস্থতা ও আরামবোধ করেন। তখন দুই ব্যক্তির কাঁধে ভর করে মসজিদের দিকে তাশরীফ নিয়ে যান। আবু বকর রা. তখন লোকদেরকে নিয়ে নামায পড়ছিলেন। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে দেখামাত্রই আবু বকর রা. পেছনে সরে যেতে উদ্যত হলেন। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে ইঙ্গিতে পিছু হটতে বারণ করে দিলেন। তিনি বললেন, তোমরা আমাকে তাঁর পাশে বসিয়ে দাও! তখন তারা রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে আবু বকর রা. এর বাম পাশে বসিয়ে দিলেন। অতঃপর আবু বকর রা. রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নামাযের ইক্তেদা করলেন এবং পেছনের মুসল্লীদেরকে জোরে জোরে তাকবীর শুনিয়ে দিতে লাগলেন।[431]

ওফাতের এক দিন আগে

ওফাতের এক দিন আগে তথা রবিবার রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সকল গোলাম বাঁদীকে আযাদ করে দেন। তাঁর কাছে তখন ছয় কিংবা সাতটি দিনার ছিল সেগুলিও তিনি সদক্বা করে দেন।[432] তাঁর সকল হাতিয়ার মুসলমানদেরকে দান করে দেন। রাতে আয়েশা রা. কূপি জ্বালানোর জন্য এক প্রতিবেশী মহিলার কাছে একটুখানি তেল চেয়ে পাঠান।[433] ত্রিশ সা' (প্রায় পঁচাত্তর কিলো) যবের বিনিময়ে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর লৌহবর্ম তখন এক ইহুদির কাছে বন্ধক ছিল।[434]

নবী জীবনের আখেরী দিনটি

আনাস বিন মালিক রা. বর্ণনা করেন, সোমবার দিন মুসলমানগণ যখন আবু বকর রা. এর ইমামতিতে ফজরের নামায পড়ছিলেন ঠিক সেই মুহূর্তে আয়েশা রা. এর হুজরার পর্দা সরিয়ে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের প্রতি দৃষ্টিপাত

---

431 সহীহ বুখারী, ফাতহুল বারী ২/১৯৫, ২৩৮, ২৩৯, হাদীস নং ৬৮৩, ৭১২, ৭১৩।

432 তাবাকাতে ইবনে সা'দ ২/২৩৭। কোনো কোনো বর্ণনায় পাওয়া যায় এগুলি তিনি সদকা করেছিলেন সোম বার রাতে বা দিনে অর্থাৎ জীবনের সর্বশেষ দিনে।

433 তাবাকাতে ইবনে সা'দ ২/২৩৯।

434 দেখুন সহীহ বুখারী হাদীস নং ২০৬৮, ২০৯৬, ২২০০, ২২৫১, ২২৫২, ২২৮৬, ২৫০৯, ২৫১৩,২৯১৬, ৪১৬৭। কিতাবুল মাগাযীর সর্বশেষে রয়েছে, রাসুলে কারীম সা. লৌহবর্মটি বন্ধক রাখা অবস্থাতেই ইন্তেকাল করেন। আর মুসনাদে আহমদে, সেটা ছাড়িয়ে নিয়ে আসার মতো কোনো কিছু তখন তাঁর কাছে ছিলো না।(ফাতহুল বারী ৫/২৮২)।

করলেন। তারা তখন নামাযের কাতারে ছিলেন। বিমল হাসির খানিকটা ঝলকানি তাঁর চন্দ্রবদনে পুষ্পিত ছিল। তখন আবু বকর রা. পেছনের কাতারে চলে যাওয়ার জন্য সরে যেতে লাগলেন। কারণ তিনি ধারণা করছিলেন, হয়তো রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নামাযে আসতে চাচ্ছেন। আনাস রা. বলেন, রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জোৎস্নাস্নিগ্ধ আলোকিত বদনখানি দেখে খুশি আর আনন্দে মুসলমানগণ নামাযের মধ্যেই গণ্ডগোল বাঁধানোর উপক্রম করলেন (অর্থাৎ রাসূলের অবস্থা জানার জন্য নামায ভেঙে দেওয়ার উপক্রম করলেন। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন হাতের ইশারায় বললেন, তোমরা তোমাদের নামাযকে পূর্ণ করে নাও! অতঃপর তিনি হুজরায় প্রবেশ করে পর্দা নামিয়ে দেন।[435]
এরপর নবী জীবনে আর কোনো নামাযের ওয়াক্ত আসেনি।চাশতের সময় রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রাণপ্রতিম দুহিতা ফাতেমা রা. কে ডেকে পাঠালেন। ফাতেমা রা. এলে তিনি তাঁর সঙ্গে কানেকানে বিভিন্ন কথাবার্তা বলতে লাগলেন। তখন ফাতেমা রা. কাঁদতে লাগলেন। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার জন্য দুআ করলেন। এরপর কানেকানে আরও কিছু কথা বললেন তখন ফাতেমা রা. হেসে ফেললেন। আয়েশা রা. বলেন, আমরা পরবর্তী সময়ে ফাতিমা রা. কে এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন, প্রথমবার কানাকানির সময় তিনি আমাকে জানালেন যে, অসুস্থতাতেই তাঁর ওফাত হবে। তখন আমি কেঁদে উঠলাম। অতঃপর দ্বিতীয় কানাকানিতে তিনি আমাকে বললেন, পৃথিবী থেকে আমিই সর্বপ্রথম তাঁর সঙ্গে গিয়ে মিলিত হবো।[436] রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফাতেমা রা. কে ওফাতের আগে সুসংবাদ দিয়ে গেলেন যে, তিনি গোটা বিশ্ব জগতের নারীদের নেত্রী।[437]
রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর প্রচণ্ড বেদনা দেখে ফাতিমা রা. আচমকা বলে উঠলেন, হায়! আব্বাজানের কত কষ্ট হচ্ছে। । রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বললেন, আজকের দিনের পর তোমার আব্বাজানের আর কোনো কষ্ট থাকবে না।[438] অতঃপর তিনি হাসান, হুসাইন রা. কে কাছে টেনে নিয়ে

---

435 দেখুন সহীহ বুখারী ও ফাতহুল বারী ২/১৯৩, হাদীস নং ৬৮০, ৬৮১, ৭৫৪, ১২০৫, ৪৪৪৮।

436 সহীহ বুখারী ২/৬৩৮।

437 কোনো কোনো রেওয়ায়েত অনুযায়ী তাদের মধ্যকার এ আলোচনা নবী জীবনের শেষ দিনে অনুষ্ঠিত হয়নি; বরং এটা ছিল সর্বশেষ সপ্তাহের ঘটনা। রহমাতুল্লিল আলামীন ১/২৮২।

438 সহীহ বুখারী ২/৬৪১।

চুমু খেলেন । তাদেরকে কল্যাণের ওসীয়ত করলেন। অতঃপর নিজের স্ত্রীদেরকে ডেকে তাদেরকে নসীহত করলেন এবং আল্লাহর কথা মনে করিয়ে দিলেন।ধীরে ধীরে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর অসুস্থতা ও বেদনা আরও বেড়ে যেতে লাগল। ক্রমে ক্রমে তা অসহনীয় মাত্রায় উপনীত হতে লাগল। এক পর্যায়ে তাঁর শরীরে সেই বিষের আলামত ফুটে উঠতে লাগল যা তিনি খাইবরে খেয়েছিলেন। এমনকি তিনি আয়েশা রা. কে বলতেন, খাইবরে আমি যে খাবার খেয়েছিলাম, বরাবরই তার যন্ত্রণা আমি অনুভব করে এসেছি। কিন্তু এতক্ষণে আমার মনে হচ্ছে, সেই বিষ আমার শরীরের সব কিছু কেটে টুকরো টুকরো করে দিচ্ছে।[439] এদিকে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম চেহারা মুবারকের ওপর একটি চাদর টেনে রেখেছিলেন। যখন শ্বাস-প্রশ্বাস ঘন হয়ে আসত তখন তিনি সেটা সরিয়ে ফেলতেন। আর ঠিক সে অবস্থাতেই বিশ্ববাসীর জন্য তাদের সর্বশেষ নবীর মুখ থেকে সর্বশেষ কথাটি বেরিয়ে এলো। শেষ নবীর সর্বশেষ ইরশাদে তিনি মানুষদেরকে এক চরম অভিশাপ থেকে সতর্ক ও সচেতন করে দিয়ে গেলেন- ইহুদি ও নাসারাদের ওপর আল্লাহর অভিসম্পাত বর্ষিত হোক। তারা তাদের নবীদের কবরগুলিকে সেজদার স্থানে পরিণত করেছে। আরবের মাটিতে দুই ধর্ম কখনো একসঙ্গে থাকতে পারে না।[440] সাহাবায়ে কেরামকে কয়েকবার তিনি বললেন, নামায .... নামায । ......আর তোমাদের দাস-দাসী .. !!![441] অন্তিম যাত্রাআর ঠিক সেই মুহূর্তে অন্তিম যাত্রার পরম ক্ষণটি ঘনিয়ে এলো। আয়েশা রা. তাঁকে নিজের শরীরের সঙ্গে হেলান দিয়ে রাখলেন। তাঁর বর্ণনা, আমার প্রতি এটা ছিল আল্লাহ তাআলার একটি বিশাল অনুগ্রহ যে, রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমার ঘরে, আমার দিনে এবং আমারই বুক ও চিবুকের মধ্যে ইন্তেকাল করেছেন। মৃত্যুর সময় তিনি আমার ও তাঁর (রাসূলের) লালা একত্র করে দিয়েছিলেন। তখন আবু বকর রা. এর ছেলে আব্দুর রহমান রা. একটি মিসওয়াক নিয়ে ঘরে প্রবেশ করলেন। আমি তখন রাসুলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে হেলান দিয়ে রেখেছিলাম। আমি লক্ষ করলাম রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার দিকে তাকালেন। আমি বুঝতে পারলাম তিনি মিসওয়াকটি চাচ্ছেন।

---

439 প্রাগুক্ত ২/৬৩৭।

440 সহীহ বুখারী ও ফাতহুল বারী ১/৬৩৪, হাদীস নং ৪৩৫, ১৩৩০, ১৩৯০, ৩৪৫৩, ৩৪৫৪, ৪৪৪১, ৪৪৪৩, ৪৪৪৪, ৫৮১৫, ৫৮১৬। তাবাকাতে ইবনে সা'দ ২/২৫৪।

441 সহীহ বুখারী ২/৬৩৭।

আমি তাকে বললাম, আপনার জন্য কি ওটা নিব? তিনি মাথা নেড়ে ইশারা করলেন, হাঁ। তখন আমি সেটা তাকে দিলাম। কিন্তু তাঁর কাছে শক্ত মনে হলো। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, আপনার জন্য ওটা নরম করে দিব? তিনি মাথা নেড়ে ইশারা করলেন, হাঁ। তখন আমি সেটা নরম করে দিলাম। তখন তিনি খুব ভালো করে মিসওয়াক করলেন। তাঁর সামনে একটি পাত্রে পানি ছিল। তিনি তখন সে পানিতে দু'হাত দিয়ে দিয়ে চেহারা মুবারক মুছতে ছিলেন আর বলে যাচ্ছিলেন, 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' মৃত্যু বড়ই কষ্টদায়ক।[442] মিসওয়াক শেষ করেই তিনি তাঁর হাত কিংবা আঙ্গুল ওপরে উঠালেন। তাঁর দৃষ্টি তখন ছাদের ওপর গিয়ে পড়ছিল। হঠাৎ তাঁর ঠোঁট কেঁপে উঠল। আয়েশা রা. কান লাগিয়ে শুনতে পেলেন: সে সকল নবী, সিদ্দীক, শহীদ ও সৎকর্মীর সঙ্গে যাদেরকে আপনি নেয়ামত দান করেছেন। হে আল্লাহ! আপনি আমাকে ক্ষমা করে দিন।। আমার ওপর রহমত নাযিল করুন।। আর সর্বোত্তম বন্ধুর সঙ্গে আমায় মিলিত করুন!!! হে আল্লাহ! সুমহান বন্ধু।[443] শেষোক্ত বাক্যটি তিনি তিন বার বললেন। অতঃপর তাঁর হাত এক দিকে ঝুঁকে গেল। তিনি সর্বোত্তম বন্ধুর সঙ্গে গিয়ে মিলিত হলেন। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন............।সূর্য ততক্ষণে মাথার ওপর উঠে গিয়েছিল। দিনটি ছিল একাদশ হিজরীর রবীউল আউয়াল মাসের বারো তারিখ সোমবার। এ সময় রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বয়স হয়েছিল তেষট্টি বছর চার দিন।

বে-ক্বারার দিলের অস্ফুট আর্তনাদ

মুহূর্তে পৃথিবীর ইতিহাসের সবচেয়ে বেদনাদায়ক ও বিয়োগান্তক এ দুঃসংবাদ আকাশে বাতাসে ছড়িয়ে পড়ল। নির্মল, নির্মেঘ সুনীল আসমান আর আলোকোজ্জ্বল দিগ-দিগন্ত মদীনাবাসীদের ওপর ভয়াল অন্ধকারঘন কালো হয়ে গেল। সাহাবায়ে কেরামের হৃদয়গুলো দুমড়ে মুচড়ে শেষ হয়ে গেল। আনাস রা. বলেন, যেদিন রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের কাছে এসেছিলেন সেদিনের চেয়ে সুন্দর ও আলোকিত দিন আমি জীবনেও দেখিনি।

---

442 সহীহ বুখারী: রাসূলে কারীম সা. এর পীড়া অধ্যায় ২/৬৪০।

443 সহীহ বুখারী। রাসূলে কারীম সা. এর পীড়া অধ্যায়, রাসূলে কারীম সা. এর সর্বশেষ ইরশাদ অধ্যায় ২/৬৩৮-৬৪১।

আর সেদিনের চেয়েও কোনো অসুন্দর ও ঘোর তমসাচ্ছন্ন দিন আমি জনমেও দেখিনি, যেদিন তিনি আমাদের কাছ থেকে চিরদিনের জন্য চলে গিয়েছিলেন।[444]

ওফাতের পরে ফাতিমা রা. বললেন, আব্বাজান! যিনি তাঁর রবের ডাকে সাড়া দিয়েছেন। আব্বাজান! জান্নাতুল ফিরদাউস যার ঠিকানা। আব্বাজান! জিবারাঈল আ. কে আপনার ওফাতের খবর দিচ্ছি।[445]

অবচেতন উমরের অস্থিরতা

রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ওফাতের খবর চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়লে উমর রা. দাঁড়িয়ে বললেন, কিছু মুনাফিকের ধারণা আল্লাহর রাসূলের ওফাত হয়ে গেছে। নিশ্চয়ই রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ওফাত লাভ করেননি; বরং মূসা ইবনে ইমরান আ. যেভাবে তাঁর রবের কাছে গিয়েছিলেন একইভাবে তিনিও তাঁর রবের কাছে গেছেন। তখন মূসা আ. তাঁর কওম থেকে চল্লিশ দিন অনুপস্থিত ছিলেন। অতঃপর তাদের কাছে ফিরে এসেছিলেন। অথচ, তারা বলেছিল, তিনি ইন্তেকাল করেছেন।আল্লাহর কসম! রাসূলে কারীমও সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অবশ্যই ফিরে আসবেন!! তাই যারা বলবে রাসুলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইন্তেকাল করেছেন আমি তাদের হাত-পা কেটে ফেলব।[446]

আবু বকর: সহনশীলতার মূর্ত প্রতীক

আবু বকর রা. সেদিন সুনাহ নামক স্থানে অবস্থিত তাঁর বাড়িতে গিয়েছিলেন। তিনি ঘোড়ার পিঠে করে ফিরে এসে অবতরণ করলেন। অতঃপর মসজিদে নববীতে ঢুকে কারও সঙ্গে কোনো কথা না বলে সোজা গিয়ে আয়েশা রা. এর হুজরায় হাযির হলেন। তাঁর ইচ্ছা ছিল রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দেহ মুবারক তখন ডোরাকাটা ইয়েমেনী চাদরে ঢাকা ছিল। তিনি ধীরে ধীরে চন্দ্রবদনখানি থেকে চাদরখানা সরিয়ে চুমু খেলেন এবং কাঁদলেন। অতঃপর বললেন, আমার পিতা মাতা আপনার ওপর কুরবান হোক! আল্লাহ আপনাকে

---

444 দারেমী। মিশকাতুল মাসাবীহ ২/৫৪৭। আনাস রা থেকে আরও বর্ণিত আছে তিনি বলেন, যেদিন রাসূলে কারীম সা. হিজরত করে মদীনায় প্রবেশ করেছিলেন সেদিন গোটা মদীনা আলোকিত হয়ে উঠেছিল। আবার যেদিন তিনি ইন্তেকাল করেছিলেন সেদিন তাঁর বিদায়ে গোটা মদীনা আবার আগের মতো অন্ধকার হয়ে গিয়েছিল। আর যখন আমরা তাকে দাফন করে আমাদের হাত ঝাড়ছিলাম তখন আমাদের নিজেদেরকে নিয়োগের কাছে অপরিচিত মনে হচ্ছিল। (তিরমিযী ৫ / ৫৮৮৫৮৯)।

445 সহীহ বুখারী, রাসূলে কারীম সা. এর পীড়া অধ্যায় ২/৬৪১।

446 ইবনে হিশাম ২/৬৫৫।

দু'বার মৃত্যু দিবেন না !! যে মৃত্যু তিনি আপনার জন্য লিখে রেখেছিলেন আপনি সে মৃত্যুকে বরণ করে নিয়েছেন!!!
অতঃপর আবু বকর রা.আয়েশা রা. এর হুজরা থেকে বের হলেন। উমর রা. তখন মানুষের সঙ্গে কথা বলছিলেন। তিনি বললেন, উমর! বসে যাও! উমর রা. বসতে অস্বীকৃতি জানালেন। আবু বকর রা. কালিমায়ে শাহাদাত পাঠ করলেন । ইতোমধ্যে সাহাবায়ে কেরাম উমর রা. কে ছেড়ে দিয়ে আবু বকর রা. এর কাছে জড়ো হয়ে গেলেন। আবু বকর রা. তাদের উদ্দেশে বললেন
হামদ ও সালাতের পরে! তোমাদের মধ্য থেকে যারা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর পূজা করত (তারা যেন জেনে নেয়) মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মৃত্যুবরণ করেছেন। আর তোমাদের যারা আল্লাহর ইবাদত করত (তারা যেন জেনে নেয়,) নিশ্চয়ই আল্লাহ চিরঞ্জীব; তিনি কখনো মৃত্যু বরণ করবেন না!! আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ.

আর মুহাম্মাদ একজন রসূল বৈ তো নয়। তাঁর পূর্বেও বহু রাসূল অতিবাহিত হয়ে গেছেন। তাহলে কি তিনি যদি মৃত্যুবরণ করেন অথবা নিহত হন, তবে তোমরা পশ্চাদপসরণ করবে? বস্তুত কেউ যদি পশ্চাদপসরণ করে, তবে সে আল্লাহর কিছুই ক্ষতি করতে পারবে না। আর যারা কৃতজ্ঞ, আল্লাহ তাদের সওয়াব দান করবেন। [সূরা আলে ইমরান:১৪৪]
ইবনে আব্বাস রা. বলেন, আল্লাহর কসম! আবু বকর রা. এর তেলাওয়াতের আগ পর্যন্ত মানুষ যেন এই আয়াতটি নাযিল হওয়ার কথা জানতই না!! তখন সবাই তাঁর থেকে আয়াতটি শিখে নিলো। অতঃপর আমি প্রত্যেককেই এই একটি আয়াত তেলাওয়াত করতে দেখলাম ।
ইবনুল মুসাইয়্যাব থেকে বর্ণিত, উমর রা. বলেন, আল্লাহর কসম! যখন আমি আবু বকর রা. মুখে সেই আয়াতটি শুনতে পেলাম তখন আমি বুঝতে পারলাম রাসুলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সত্যি সত্যিই ইন্তেকাল করেছেন। তখন আমার পা ভেঙে পড়ল। সে আমার শরীরের ভার নিতে পারল না। আবু বকরের মুখে এ আয়াত

শুনে আমি মাটিতে বসে পড়লাম। কারণ ততক্ষণে আমি বুঝে ফেললাম, বাস্তবিকই রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ওফাত লাভ করেছেন।[447]

দেহ মুবারকের বিদায় ঘনঘটা

রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাফন-দাফনের আগেই খেলাফতের বিষয় নিয়ে সাহাবায়ে কেরামের মাঝে মতানৈক্য সৃষ্টি হলো। সাকীফায়ে বনু সাআদায় মুহাজির ও আনসারদের মাঝে এ নিয়ে চরম বিরোধ, বিশৃঙ্খলা, দ্বন্দ্ব আর মতপার্থক্য চলতে লাগল দীর্ঘ সময়। পরিশেষে সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আবু বকর রা.খেলাফতের প্রধান নিযুক্ত হলেন। এতে করে সোমবার দিন কেটে রাত নেমে এলো। অতঃপর লোকজন রাতভর একটানা সুবহে সাদিক পর্যন্ত রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাফনের কাজে রইল। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দেহ মুবারক তখনো ইয়েমেনী চাদরে ঢাকা আয়েশা রা. এর হুজরায় ছিল। পরিবারের সদস্যরা বাইরে থেকে দরজা বন্ধ করে দিয়েছিল।

মঙ্গলবার রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে গোসল করানো হলো। গোসলের সময় তাঁর শরীর থেকে জামা-কাপড় খোলা হলো না। তাকে গোসল করিয়েছিলেন আব্বাস, আলী, আব্বাস রা. এর দুই ছেলে ফযল ও কুসাম, রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর গোলাম শুক্কুরান, উসামা বিন যায়দ এবং আউস ইবন খাওলা রা. প্রমুখ। আব্বাস রা. ও তার দুই পুত্র ফযল ও কুসাম রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর পাশ বদলে দিচ্ছিলেন আর উসামা ও শুকুরান তাঁর দেহ মুবারকের ওপর পানি ঢেলে দিচ্ছিলেন। আলী রা. তাকে গোসল দিচ্ছিলেন আর আউস রা. তাকে বুকের সঙ্গে হেলান দিয়ে রেখেছিলেন।[448]

পানি ও বরই পাতা দিয়ে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে মোট তিন বার গোসল দেওয়া হয়। কুবাতে অবস্থিত সা'দ বিন খাইসামা রা. এর 'গার্স' নামক কূপ থেকে পানি আনা হয়। জীবদ্দশায় রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ কূপের পানি পান করতেন।[449]

---

447 সহীহ বুখারী ২/৬৪০, ৬৪।

448 দেখুন ইবনে মাজাহ ১/৫২১।

449 বিস্তারিত দেখুন তাবাকাতে ইবনে সা'দ ২/২৭৭-২৮১।

অতঃপর রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে তিনটি সাদা ইয়েমেনী চাদর দ্বারা কাফন দেওয়া হয়। তাতে কোনো জামা কিংবা পাগড়ি ছিল না।[450] সেই চাদরই রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর শরীরে জড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল।

অতঃপর রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দাফনের জায়গা নিয়ে খানিকটা মতানৈক্যের সৃষ্টি হলো। আবু বকর রা. বললেন, আমি রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে বলতে শুনেছি, যে নবীরই ওফাত হয়েছে তাকে সেই ওফাতের স্থানে দাফন করা হয়েছে। এরপর আবু তালহা রা. রাসূলে কারীম যে বিছানায় ওফাত লাভ করেছিলেন তা একপাশে সরিয়ে ফেলেন। বিছানার নীচের মাটি খনন করেন এবং বগলী কবর বানান। এরপর মানুষ দলে দলে দশজন দশজন করে হুজরায় প্রবেশ করতে লাগল। এভাবে নিজে নিজে সকলে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জানাযার নামায আদায় করেন। রাসূলের সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জানাযায় কেউ ইমাম হননি। প্রথমে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর পরিবার ও আত্মীয় স্বজন নামায আদায় করেন। অতঃপর মুহাজিরগণ জানাযা পড়েন। এরপর পড়েন আনসারগণ। অতঃপর যথাক্রমে শিশু ও নারীরা কিংবা নারী ও শিশুরা জানাযার নামায আদায় করেন।[451]

এভাবে কাফন ও জানাযার কাজে মঙ্গলবার পুরো দিন এবং বুধবার রাতেরও অধিকাংশ সময় কেটে যায়। আয়েশা রা. বলেন, রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দাফন সম্পর্কে আমরা প্রথমে কিছুই জানতাম না । অতঃপর যখন বুধবার রাতের[452] মাঝপ্রহরে- অপর এক বর্ণনায় শেষ প্রহরে মাটিতে কোদাল মারার আওয়াজ

---

450 দেখুন সহীহ বুখারী: জানাযা পর্ব: কাফনের জন্য সাদা কাপড় অধ্যায়, ফাতহুল বারী ৩/১৬২, ১৬৭, হাদীস নং ১২৬৪, ১২৭১, ১২৭২, ১২৭৩, ১৩৮৭। সহীহ মুসলিম: জানাযা পর্ব ৪৬৩, মৃতের কাফন অধ্যায় হাদীস নং ৪৫।

451 দেখুন মুয়াত্তা ইমাম মালিক: জানাযা পর্ব, মৃতের দাফন সম্পর্কে যা এসেছে অধ্যায় ১/২৩১। তাবাকাতে ইবনে সা'দ ২ / ২৮৮-২৯২।

452 মুসনাদে আহমদ ৬/৬২, ২৭৪, সর্বোত্তম বস্তুর সঙ্গে তাঁর সর্বশেষ মিলন সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে দেখুন সহীহ বুখারী: রাসূলের পীড়া অধ্যায় এবং ফাতহুল বারীতে এর পরবর্তী আরও কিছু অধ্যায়। সহীহ মুসলিম, মিশকাতুল মাসাবীহ নবীজীর ওফাত অধ্যায়। ইবনে হিশাম ২/৬৪৯-৬৬৫। ভালকীহে ফুভূমি আহলিল আসারি পৃষ্ঠা ৩৮,৩৯। রহমাতুল্লিল আলামীন ১/২৭৭-২৮৬। এ অধ্যায়ে উল্লিখিত বিভিন্ন সময়ের অধিকাংশই শেষোক্ত গ্রন্থ থেকে সংগৃহীত।

শুনতে পেলাম তখন আমরা বুঝতে পারলাম, রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে দাফন করা হচ্ছে।

উপসংহার

এক কথায়, মুস্তফা চরিত ছিল পৃথিবীর সব নিরুপম গুণ আর সৌন্দর্য বিভায় প্রস্ফুটিত মানবতার এক মহা আশ্চর্য। তাঁর সুমহান রব তাকে বেনযীর ভূষণে বিভূষিত করেছিলেন। এমনকি তিনি নিজে তাঁর প্রশংসায় বলেছেন, তথা নিশ্চয়ই আপনি মহান চরিত্রের অধিকারী। [সূরা কলম:৪]

এগুলো ছিল এমন অসাধারণ ভূষণ, যা মানুষকে তাঁর নিকট টেনে নিয়ে এসেছিল। মানুষের অন্তরে তাঁর প্রতি প্রবল অনুরাগ, আকর্ষণ, ভক্তি আর

ভালোবাসার জন্ম দিয়েছিল। তাঁকে মানবতার এমন এক মহাধিনায়ক বানিয়ে দিয়েছিল, যার জন্য হাজারো জীবন মুহূর্তে উৎসর্গীত হওয়ার প্রতিযোগিতা লেগে যেত। এগুলো তাঁর কওমের রুক্ষ ও পাষাণ হৃদয়গুলোকে মোমের মতো গলিয়ে ফেলেছিল। আর তখন উত্তরঙ্গ সমুদ্রের উচ্ছ্বসিত জোয়ার বানের মতো সবাইকে ভাসিয়ে নিয়ে এসেছিল ইসলামের ঘাটে। এ সৌন্দর্য বিভায় অভিভূত হয়ে মানুষ দলে দলে ইসলাম গ্রহণ করেছিল।

এ ছিল সেই অপূর্ব রূপ-লাবণ্য আর স্নিগ্ধ সুষমাভরা পূর্ণ চাঁদের একটুখানি ঝিলিক মাত্র। নতুবা তাঁর সম্মান ও মর্যাদা, তাঁর সৃষ্টি-সৌন্দর্যের প্রকৃত দৃশ্য আর তাঁর চরিত্র মধুরিমার বাস্তব কারিশমার সমুন্নতি ছিল ঠিক এতটা যার পূর্ণ চিত্রায়ণ কোনোদিনও সম্ভব হবে না। যার গভীরতার কখনো অনুমানও করা যাবে না ।

সত্যি কথা কি- গোটা পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ এ মহান মানুষটির শ্রেষ্ঠত্বের বিচার কে করতে যাবে, যিনি সকল সৌন্দর্য আর পরিপূর্ণতার সর্বোচ্চ শিখরে অধিষ্ঠিত ছিলেন। যিনি আপন রবের দীপ্তিতে এতটা প্রদীপ্ত হয়ে উঠেছিলেন যে, স্বয়ং আল্লাহর কিতাবকে তাঁর চরিত্র হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছিল।

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ، وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ

اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ، وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ

গ্রন্থপঞ্জি

১. সীরাত ইবনে হিশাম।

২. আর রাহিকুল মাখতুম।

৩. নবীয়ে রহমত।

৪. যেমন ছিলেন তিনি।

৫. সীরাহ ১ম ও ২য় খন্ড